প্রথম অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিজয় অভিযানসমূহ

ভূমিকা

উসমানিগণ হলেন একটি তুর্কি গোত্রীয় লোক। হিজরি সপ্তম শতাব্দী তথা খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুর্দিস্তানে তাদের বসবাস ছিল। তারা রাখালী পেশায় নিয়োজিত ছিল। তাদের সময়কাল ছিল ইরাক এবং পূর্ব-এশিয়ায় চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলীয় আক্রমণের পরবর্তী যুগ। কেননা, উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমানের দাদা সুলাইমান ৬১৭ হিজরি মোতাবেক ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় গোত্রের সাথে কুর্দিস্তান থেকে আনাতোলিয়া নামক এলাকায় হিজরত করেন। এরপর সেখানকার 'আখলাত' নামক শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১] ৬২৮ হিজরি তথা ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে তার মেজ ছেলে 'আরতুগ্রুল' তার উত্তরসূরি হন। তিনি আনাতোলিয়া থেকে আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে আসেন। তখন তার সাথে একশ' পরিবার এবং চারশ'র অধিক অশ্বারোহী ছিল।[২] যখন উসমানের পিতা আরতুগ্রুল মোঙ্গলীয়দের হামলা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন তার সাথে পরিবারের সংখ্যা চারশ'র অধিক ছিল না। সেখানে তারা বিকট আওয়াজ শুনতে পান। আওয়াজের কাছাকাছি যেতেই তারা মুসলিম এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে ব্যাপক লড়াই দেখতে পান। তখন কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের পাল্লা ভারি ছিল। এ অবস্থা দেখে আরতুগ্রুল পুরো শক্তি নিয়ে তার দ্বীনি ভাইদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি ও সাহস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সঞ্চার হয়।[৩] যুদ্ধের পর তৎকালীন ইসলামি 'সালজুক সাম্রাজ্য'-এর সেনাপতি 'আরতুগ্রুল' এবং তার সাথিদের এ অবদান স্বীকার করেন এবং এই অবদানের প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাদের জন্য আনাজুলের পশ্চিম সীমান্তে রোমের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা বরাদ্দ করে দেন।[৪] পাশাপাশি রোমের দিকে তাদের অঞ্চলকে

[১] আখলাত বর্তমান তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় একটি শহর; যা আর্মেনিয়ার নিকটবর্তী।
[২] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৬।
[৩] *জাওয়ানিবু মুজিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন,* জিয়াদ আবু গুনাইমাহ, পৃষ্ঠা : ৩৬।
[৪] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* ড. আবদুল আজিজ আল-উমরি, পৃষ্ঠা : ৩৫৩।

সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেন। তাদের মাধ্যমে সালজুকিরা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শক্তিশালী এক মিত্রবাহিনী এবং সহযোগী পেয়ে যায়। সালজুকদের এবং এই উঠতি সাম্রাজ্যের মাঝে গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। কারণ, ধর্ম এবং বিশ্বাসে তাদের উভয়ের শত্রু ছিল একই। আরতুগ্রুলের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। ৬৯৯ হিজরি তথা ১২৯৯[৫] খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে উসমান তার উত্তরসূরি নির্বাচিত হন, যিনি রোম অঞ্চলে রাজত্ব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার পিতার নীতি অনুসরণ করেন।[৬]

[৫] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান,* সাম আল-জাবি আল-কিরমানির তাহকিক, পৃষ্ঠা : ১০।
[৬] *তারিখু দাওলাতিল উলইয়া,* মুহাম্মদ ফরিদ, পৃষ্ঠা : ১১৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান

৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আরতুগ্রুলের ছেলে উসমানের জন্ম হয়।[৭] তার দিকেই উসমানি সাম্রাজ্যকে সম্বন্ধিত করা হয়।[৮] তিনি যে-বছর জন্মগ্রহণ করেন, সে বছরই মোঙ্গলীয়রা হালাকু খাঁর নেতৃত্বে আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে আক্রমণ করে। এটি ছিল বেশ বড় এবং মর্মান্তিক একটি দুর্যোগ। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন—

> তারা শহরে আক্রমণ করে সেখানকার সকল পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক যাদেরকেই নাগালে পেয়েছে হত্যা করেছে। অনেক মানুষ কূপ, বন্য জন্তুদের আবাস এবং ময়লার ভাগাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এভাবে তারা অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে বের হতো না। একদল লোক সেখানকার সরাইখানাগুলোতে দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করে; কিন্তু তাতারিরা সেগুলো ভেঙে আগুন লাগিয়ে তাদের বের করে নিয়ে আসে। এরপর লোকেরা দূরদূরান্তে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা মোঙ্গলীয়দের হাতে ধরা পড়ে। মোঙ্গলীয়রা তাদেরকে খোলা ময়দানে পেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। রক্তে শহরের অলিগলির নালাসমূহ ভরে ওঠে। মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। ইহুদি, খ্রিষ্টান আর তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারী কতিপয় মুসলিম ছাড়া আর কেউই রেহাই পায়নি।[৯]

---

[৭] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* আবদুস সালাম আবদুল আজিজ, পৃষ্ঠা : ১২।

[৮] উসমানি খিলাফতকে অনেকেই তৃতীয় খলিফা সাইয়িদিনা উসমান বিন আফফান রা.-এর দিকে সম্বন্ধিত বলে ধারণা করে থাকেন। এটি সঠিক নয়; বরং যার নামের দিকে সম্বন্ধিত করে এই খিলাফতের নামকরণ করা হয়েছে ইতিহাসে, তিনি ৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেওয়া আরতুগ্রুলের ছেলে উসমান। তার কথাই লেখক এখানে আলোচনা করছেন।—সম্পাদক

[৯] *বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৯২-১৯৩।

এটি ছিল খুবই মর্মান্তিক একটি ঘটনা। পাপ আর গোনাহের ভারে উম্মাহর মনোবল তখন ছিল দুর্বল। এ জন্যই আল্লাহ তাদের ওপর মোঙ্গলীয়দের চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তারা এসে সম্ভ্রম লুটেছে। রক্তনদী প্রবাহিত করেছে। লোকদের হত্যা করেছে। সম্পদ লুটতরাজ করেছে। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করেছে। উম্মাহর সেই কঠিন, দুর্যোগময় এবং দুর্বলতার সময়টাতে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমানের জন্ম হয়। দুর্বলতা এবং পতনের কিনারা হতে তিনি উম্মাহর ক্ষমতার সূচনা করেন। এখান থেকেই সম্মান, সাহায্য এবং ক্ষমতায়নের দিকে মুসলিম জাতির ঊর্ধ্বগমন শুরু হয়। সবকিছুই ছিল আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং তাঁর ইচ্ছায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ. اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ-
>
> *{ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল ফিতনা সৃষ্টিকারী।} [সুরা কাসাস, আয়াত : ৪]*

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

> وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ -
>
> *{জমিনে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার।} [সুরা কাসাস, আয়াত : ৫,৬]*

আল্লাহ তাআলা চাইলে তার দুর্বল বান্দাদেরকে সকাল অথবা সন্ধ্যায় এমনকি চোখের পলকের মাঝেই ক্ষমতাশালী বানাতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -
>
> *{আমি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করি তখন বলি হও, আর তা হয়ে যায়।} [সুরা নাহল, আয়াত : ৪০]*

আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আহলে হকরা তা তরান্বিত হওয়ার কামনা করে না; বরং তারা বিশ্বাস করে তা সঠিক সময়েই আসবে। তাই শরিয়তের রীতিনীতি এবং বৈশ্বিক রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ওপর ধৈর্যধারণের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ـ

{আল্লাহ তাআলা চাইলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরস্পরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান।}
[সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ৪]

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার উপকরণসমূহ প্রস্তুত করেন এবং অল্প অল্প করে তা বাস্তবায়িত করেন। একবারেই তা সম্পূর্ণ করেন না।

তদ্রূপ উসমানি সালতানাতের ক্ষমতালাভের গল্পটা শুরু হয় অল্প অল্প করেই। সেনাপতি উসমানের উত্থানের মধ্য দিয়ে। যিনি জন্মগ্রহণ করেন আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের বছর।

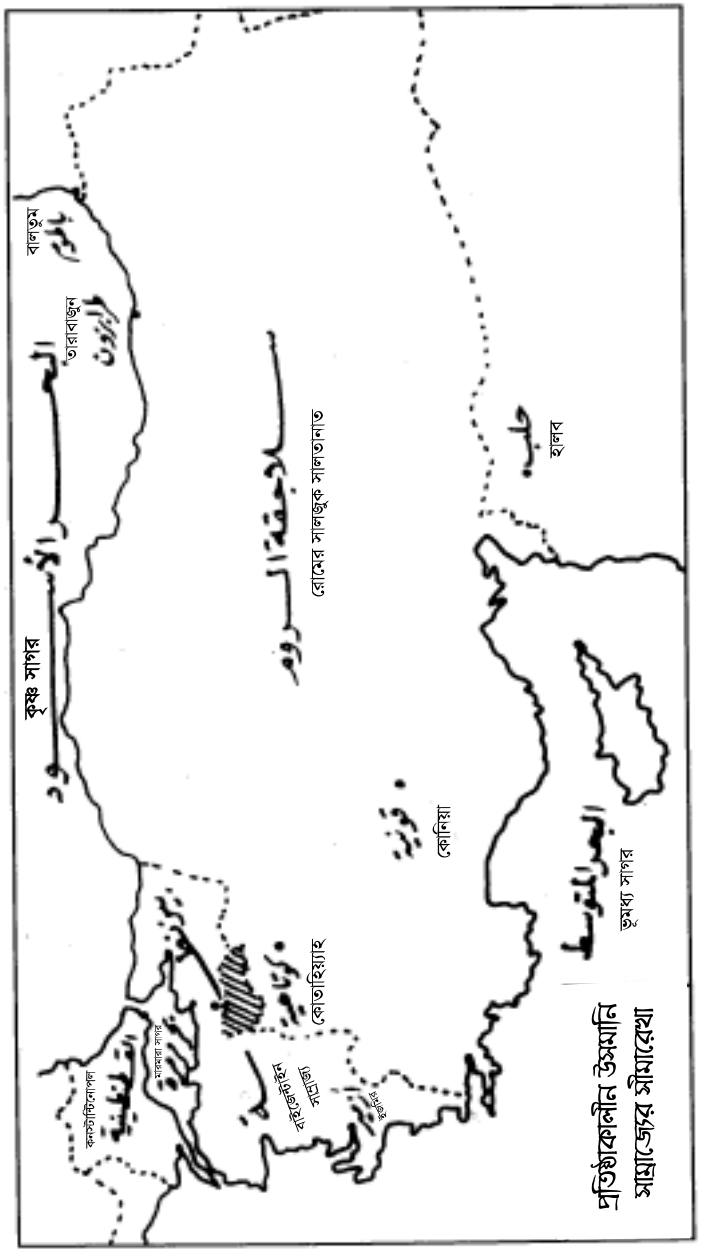

প্রতিষ্ঠাকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের সীমারেখা

এক. প্রথম উসমানের নেতৃত্বসুলভ উল্লেখযোগ্য গুণাবলি

প্রথম উসমানের জীবন নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের সামনে তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি গুণ ভেসে ওঠে। যেমন—তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার সবচেয়ে গুরুত্ববহ এবং উল্লেখযোগ্য গুণাবলি হচ্ছে—

[১] বীরত্ব : ৭০০ হিজরি মোতাবেক ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের বুরুসা, মাদানুস, আদ্রানুস, কাত্তাহ, কাস্তালাহ প্রভৃতি অঞ্চলের খ্রিষ্টান রাজারা উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন আরতুগ্রুলের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দেয়। খ্রিষ্টানরা এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় এবং এই উঠতি সালতানাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করে। উসমান তার সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি ক্রুসেড-যোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন। তার বীরত্ব উসমানিদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে যায়।[১০]

[২] হিকমত বা প্রজ্ঞা : স্বীয় গোত্রের নেতৃত্ব হাতে নেওয়ার পর তিনি ভেবে দেখলেন, খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সুলতান আলাউদ্দিনের সাথে মিলিত হয়ে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অবস্থান করা বুদ্ধির কাজ হবে। তাই তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং দুর্গ-জয়ে সুলতানকে সাহায্য করেন। এর ফলে তিনি রোমের সালজুক সুলতান আলাউদ্দিনের দরবারে আমির হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি তার অধীন অঞ্চলে সুলতানের নামে মুদ্রা চালু করেন এবং জুআর খুতবায় তার নামে দোয়া চালু করেন।[১১]

[৩] ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা : উসমানের নেতৃত্বাধীন অঞ্চলের আশপাশের লোকেরা দ্বীনের জন্য তার ইখলাস এবং একনিষ্ঠতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তারা ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে তার সমর্থন এবং তার সাথে অবস্থান করে ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে মজবুত প্রাচীররূপে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।[১২]

[৪] সবর তথা ধৈর্য : যখন তিনি বিভিন্ন দুর্গ এবং শহর জয় করা শুরু করেন, তখন তার এই গুণটি প্রকাশ পেতে শুরু করে। ৭০৭ হিজরিতে তিনি কাত্তাহ, লাফকাহ, আক্কে হিসার এবং কওজে হিসার দুর্গ জয় করেন। আর ৭১২ হিজরিতে কাবওয়াহ, ইয়াকিজাহ তোরাক্লু এবং তাকাররুর বিকারি দুর্গ জয় করেন। ৭১৭ হিজরি মোতাবেক ১৩১৭ খ্রিষ্টাব্দে বুরুসা জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি বিজয়যাত্রার শীর্ষচূড়ায় উঠেছিলেন। কয়েক বছরব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর এই জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন তিনি। বুরুসা জয় করা কোনো সহজসাধ্য কাজ ছিল না। বলা যায়, উসমানের অভিযানসমূহের মধ্যে

[১০] *জাওয়ানিবুল মুজিয়্যাহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিনাল আতরাক,* পৃষ্ঠা : ১৯৭।
[১১] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৫।
[১২] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৬।

সবচেয়ে কঠিন ছিল এটি। এ সময় উসমান এবং বুরুসার অধিপতি ইকরিনুসের মাঝে কয়েক বছরব্যাপী কঠিন যুদ্ধ হয়। অবশেষে বুরুসার অধিপতি আত্মসমর্পণ করে উসমানের হাতে শহরকে তুলে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

{হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তার ওপর অটল থাক এবং পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করো। আর আল্লাহকে ভয় করো—যাতে তোমরা সফলকাম হও।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ২০০]

[৫] ইমানি জজবা : বুরুসার অধিপতি ইকরিনুসের সাথে যুদ্ধের সময় তার এই গুণের কথা জানা যায়। যুদ্ধ-শেষে ইকরিনুস ইসলাম গ্রহণ করে। সুলতান উসমান তাকে বেক উপাধি প্রদান করেন। এরপর সে উসমানি সালতানাতের প্রথম সারির সেনাপতিদের কাতারে পৌঁছে যায়। অনেক কন্সটান্টিনোপলিয়ান সেনাপতি উসমানের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত ছিলেন। তারা উসমানের দেখিয়ে যাওয়া পথ অনুকরণ করে উসমানি সালতানাতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তখন অনেক মুসলিম সৈন্যদল উসমানি সালতানাতের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে ছিল গাজিয়ারোম অর্থাৎ রোমের একদল যোদ্ধাদের দল। তারা হলো এমন একটি মুসলিম সৈন্যদল, যারা আব্বাসীয় খিলাফতের সময় থেকে রোম সীমান্তে একতাবদ্ধভাবে অবস্থান করত এবং মুসলিমদের ওপর রোমীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করত। তাদের এই পারস্পরিক সম্প্রীতি রোমের যুদ্ধে তাদেরকে আলাদা মর্যাদা দান করে। এতে করে ইসলামের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে এবং ইসলামি নিয়মকানুনের প্রসার ঘটে।

আরেকদল ছিল ইখওয়ান অর্থাৎ ভাইদের দল। তারা ছিল অত্যন্ত ভালো একটি দল—যারা মুসলিমদেরকে সাহায্য করত, তাদের মেহমানদারি করত এবং যোদ্ধাদের সেবা করার জন্য সৈন্যদলের সাথে অবস্থান করত। এই দলের সিংহভাগ লোক ছিলেন ব্যবসায়ী। তারা ইসলামের খেদমতের জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। যেমন—মসজিদ, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করা। উসমানি সালতানাতে তারা বেশ মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন। এই দলগুলোর মধ্যে একদল বিজ্ঞ আলেম ছিলেন; যারা ইসলামি সভ্যতার বিস্তৃতি এবং প্রচার-প্রসারে কাজ করেছেন। লোকদেরকে ধর্মীয় জীবনযাপনে আগ্রহী করেছিলেন।

আরেকদল ছিল হাজিয়াতে রোম অর্থাৎ রোমের হাজিদের কাফেলা। ইসলামি ফিকহ নিয়ে কাজ করত আরেকটি দল। তারা শরিয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা

করতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল, সাধারণ মুসলিমদেরকে সাহায্য করা। বিশেষত মুজাহিদদের সাহায্য করা। এ ছাড়া আরও অন্যান্য দলের লোকেরাও ছিল।[১৩]

[৬] **ন্যায়পরায়ণতা :** অধিকাংশ তুর্কি ইতিহাসগ্রন্থ হতে জানা যায়, ৬৮৩ হিজরি মোতাবেক ১২৮৫ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কুরুহজাহ দুর্গ জয় করার পর আরতুগ্রুল তার ছেলে উসমানের হাতে সে অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন। তখন উসমান তুর্কি মুসলিমদের বিপরীতে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের শাসন করেছিলেন। এতে অভিভূত হয়ে এক খ্রিষ্টান উসমানকে জিজ্ঞেস করেছিল, কীভাবে আপনি আমাদের কল্যাণ সাধন করেন? অথচ আমরা আপনার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

উসমান জবাব দিয়েছিলেন, আমি কেনইবা তোমাদের কল্যাণ কামনা করব না! আমরা তো আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করি। তিনি আমাদেরকে বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ـ

{নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতকে তার হকদারের কাছে পৌঁছে দাও এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করো।} [সুরা নিসা : আয়াত : ৫৮]

তার এই ন্যায়পরায়ণতার কারণে লোকটি তার গোত্রসহ ইসলাম গ্রহণ করে।[১৪]

প্রথম উসমান তার বিজিত এলাকায় প্রজাদের সাথে ইনসাফের সাথে শাসন করেছেন। পরাজিত লোকদের ওপর তিনি কখনো জুলুম-অত্যাচার করেননি। তাদের ওপর জোরজবরদস্তি, সীমালঙ্ঘন এবং কঠোরতা করেননি। তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার এই কথা অনুযায়ী আচরণ করেছেন—

اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُه ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّه فَيُعَذِبَه عَذَابًا نُّكْرًا' وَأَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُ جَزَآءً الْحُسْنٰى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ـ

{যারা অত্যাচার করে আমি অচিরেই তাদের শাস্তি দেব। অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। তিনি তাদের কঠিন শাস্তি দান করবেন। আর যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আমি তাদেরকে সহজ কাজের আদেশ দেব।} [সুরা কাহফ, আয়াত : ৮৭-৮৮]

[১৩] *আততারাজুয়ুল হাজারি ফিল আলামিল ইসলামি,* ড. আলি আবদুল হালিম, পৃষ্ঠা : ৩৩১-৩৩২।
[১৪] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৩।

আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত এই পন্থা অনুযায়ী আমল করাই তার ইমান, আল্লাহভীরুতা, বুদ্ধি এবং মেধার কথা জানান দেয়। সেইসাথে আরও স্মরণ করিয়ে দেয় তার সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়ার গুণাবলিকে।

[৭] বিশ্বস্ততা : অঙ্গীকার রক্ষা করাকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কনস্টান্টিনোপলের উলুবাদ দুর্গের অধিপতি উসমানি সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার সময় শর্ত দিয়েছিল, পুলের ওপর দাঁড়ানো কোনো মুসলিম-সৈন্য যেন দুর্গে প্রবেশ না করে। তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। আর এভাবে তার পরবর্তীরাও তা মেনে নিয়েছে।[১৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ـ

{তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।} [সুরা আল-ইসরা : আয়াত : ৩৪]

[৮] **আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা :** তার বিজয় অভিযানগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতো। তার শাসন এবং বিজয় অভিযানসমূহ কোনো অর্থনৈতিক অথবা সামরিক ফায়েদার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং তা ছিল আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং তার দ্বীনকে প্রচার করা। এ জন্যই ইতিহাসবিদ আহমদ রফিক তার গ্রন্থ *আত-তারিখুল আম্মিল কাবির*-এ তাঁর সম্পর্কে বলেন—

উসমান ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের ধর্মভীরু। তিনি জানতেন ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং তাকে সর্বজনীন করা একটি পবিত্র আবশ্যকীয় কাজ। তিনি ছিলেন দূরদর্শী এবং দৃঢ় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি সুলতান হওয়ার লোভে তার সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং ইসলামের প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১৬]

মিসর উগুলো বলেন—

উসমান বিন আরতুগ্রুল ছিলেন পোক্তো ইমানের অধিকারী। আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি তার সকল শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তৎপর ছিলেন।[১৭]

এগুলো ছিল প্রথম উসমানের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস, আখেরাত দিবসের জন্য তার প্রস্তুতি, আহলে ইমানের প্রতি তার

[১৫] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৩।
[১৬] প্রাগুক্ত।
[১৭] প্রাগুক্ত।

ভালোবাসা, কাফের এবং পাপীদের প্রতি তার ঘৃণা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি তার গভীর মহব্বত এবং সেদিকে আহ্বান করার মতো আরও এমন মহৎ সব গুণে তিনি ছিলেন গুণান্বিত। এ জন্যই উসমান এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বিজয় অভিযানের সময় রোমের আমিরদেরকে তিনটির যেকোনো একটি শর্ত গ্রহণ করতে বলেছিলেন। **এক.** হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। **দুই.** অথবা জিজিয়া প্রদান করবে। **তিন.** অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। তাই তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ দ্বিতীয় শর্ত গ্রহণ করে জিজিয়া দিতে রাজি হয়েছে। আর বাকিদের বিরুদ্ধে কোনো আপোষ না করে তিনি জিহাদে নেমেছেন এবং বিজয় ছিনিয়ে এনে তার রাজত্বের সাথে বিশাল একটি এলাকা সংযুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এবং আখেরাতের প্রতি অটুট ইমান থাকার ফলে উসমানের ব্যক্তিত্ব ছিল মুগ্ধকর এবং সুষমামণ্ডিত। এ জন্যই তার শক্তি কখনো তার ইনসাফকে, তার রাজত্ব তার দয়াকে এবং তার ধনাঢ্যতা তার বিনয়কে পরাভূত করতে পারেনি। তাই তিনি আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমতার উপকরণ এবং বিজয়ের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার বান্দা উসমানের প্রতি অনুগ্রহ। আল্লাহ এশিয়া মাইনর অঞ্চলে তাকে ক্ষমতা এবং শক্তি প্রয়োগের সুযোগ দিয়েছেন। রাজত্ব পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, অধিক সৈন্যসংখ্যা এবং গাম্ভীর্য দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণ ছিল তার জন্য বিরাট অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা তার জন্য তাওফিকের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করেছিলেন। আল্লাহর পথে আহ্বান করাকে তিনি ভালোবাসতেন। তাই তার সকল কাজ ছিল মহান। তিনি তরবারির মাধ্যমে যেমন দেশ বিজয় করেছেন, তেমনই ইমান ও ইহসানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়রাজ্যও দখল করেছেন। যখনই কোনো জাতির ওপর তিনি বিজয়লাভ করতেন, তখনই তাদেরকে সত্যের প্রতি এবং আল্লাহ তাআলার ওপর ইমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন। বিজিত সকল প্রদেশ এবং শহরে আত্মশুদ্ধিমূলক কাজের ব্যাপারে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। আহলে ইমানদারদেরকে তিনি যেমন ভালোবাসতেন, ঠিক তেমনই সম্মানও করতেন। বিপরীতে কাফেরদের প্রতি ছিলেন কঠোর।

দুই. উসমানি শাসকগণ যে নীতি মেনে চলেছিলেন

উসমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা উসমানের পুরো জীবনই ছিল আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং জিহাদের জন্য নিবেদিত। ধর্মীয় আলেমগণ আমিরকে ঘিরে রাখতেন এবং তাকে তার প্রশাসনিক রূপরেখা এবং শরয়ি হুকুম অনুযায়ী রাজত্ব চালানোর জন্য সম্মান করতেন। মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে উসমান তার ছেলে উরখানকে যে অসিয়ত করেছিলেন তা ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। তার এই অসিয়তই ছিল একটি

সভ্যতামূলক নির্দেশনা এবং শরয়ি মানহাজস্বরূপ। পরবর্তী উসমানি শাসকগণও তা মেনে চলেছেন। তিনি তার অসিয়তে বলেছিলেন—

- প্রিয় সন্তান আমার, আল্লাহ তোমাকে যে কাজের আদেশ করেননি তা করা থেকে তুমি বিরত থাকবে। শাসনকার্যের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে উলামায়ে দ্বীনের পরামর্শকে আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করবে।
- প্রিয় সন্তান, তোমার অধীনদের যথাবিহীত সম্মান করবে। সৈন্যদলের প্রতি অনুগ্রহ করবে। তোমার সৈন্য এবং সম্পদের মাধ্যমে যেন শয়তান তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে। আহলে শরিয়ত থেকে দূরে থাকা হতে বেঁচে থাকবে।
- হে পুত্র, নিশ্চয় তুমি জানো, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খুশি করা। তাই যা বলবে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বলবে।
- প্রিয় পুত্র, যারা শাসনের লোভে এবং একক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে আমরা তাদের দলভুক্ত নই। আমরা ইসলামের জন্যই বাঁচব, ইসলামের জন্যই মরব। হে সন্তান, এটার জন্যই তুমি যোগ্য।[১৮]

আত-তারিখুস সিয়াসি লিদ্দাওলাতিল উলিয়াতিল উসমানিয়্যাহ গ্রন্থে তার অসিয়তের আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তা হলো—

- হে বৎস, নিশ্চয় ইসলাম প্রচার করা, তার দিকে লোকদেরকে আহ্বান করা এবং মুসলিমদের সম্মান ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কাঁধে আমানত। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।[১৯]

মাআসাতে বনি উসমান নামক গ্রন্থে অসিয়তের আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহলো—

- প্রিয় পুত্র, আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে নিয়ে গর্ব করি। নিশ্চয় তুমি তোমার প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবে। ইসলাম প্রচারের জন্য সব ধরনের চেষ্টা অব্যহত রাখবে।
- হে পুত্র, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি সর্বদা উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে থাকবে। অধিক পরিমাণে তাদেরকে সম্মান করবে। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কেননা, তারা সবসময় কল্যাণের কথাই বলেন।
- হে পুত্র, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ কখনো করবে না। যখন কোনো বিষয় তোমার কাছে কঠিন মনে হবে, তখন শরিয়তের আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করবে। কেননা, তারা তোমাকে অবশ্যই কল্যাণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

---

[১৮] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিততারিখি ওয়াল হাজারাহ,* ড. মুহাম্মদ হারব, পৃষ্ঠা : ১৬।
[১৯] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২১।

- আর জেনে রাখো হে পুত্র, এই দুনিয়াতে আমাদের সকলের পথই এক। আর সেটি হলো আল্লাহ তাআলার পথ। আর আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা কোনো সুখ্যাতি অর্জন বা দুনিয়া অন্বেষণকারী নই)।[২০]

তারিখে উসমানি তে উসমানের অসিয়তের আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায়—

আমার পুত্র এবং বন্ধুদের প্রতি আমার অসিয়ত হচ্ছে, তোমরা সর্বদা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে ইসলামকে উন্নীত রাখবে। সবচেয়ে পরিপূর্ণ জিহাদের মাধ্যমে তোমরা সম্মানিত ইসলাম ধর্মের পতাকাকে উড্ডীন করে রাখবে। সর্বদা ইসলামের খেদমত করবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমার মতো দুর্বল বান্দাকে দেশ বিজয়ের জন্য নিয়োজিত করেছেন। তাই তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে দূরদূরান্তের দেশে নিয়ে যাবে। আর আমার বংশধরদের থেকে যারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, তারা হাশরের দিনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

হে আমার পুত্র, দুনিয়াতে এমন কেউ নেই, যে মৃত্যুর সামনে তার গর্দান অবনত করে না। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি তোমার হাতে এই সাম্রাজ্য তুলে দিচ্ছি আর তোমাকে মাওলার কাছে গচ্ছিত রাখছি। তোমার সকল কাজে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে।[২১]

এই অসিয়তই ছিল একটি আদর্শ রূপরেখা। উসমানি শাসকেরা এই আদর্শের ওপরেই চলেছেন। তাই তারা ইলম, ইলমি প্রতিষ্ঠান, সৈন্যদল এবং সেনা প্রতিষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। উলামায়ে কেরাম এবং তাদের সম্মানের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন। আরও গুরুত্বারোপ করেছেন জিহাদের প্রতি—যা মুসলিম সেনাবাহিনীর পতাকাকে দূরদূরান্তে নিয়ে গেছে। এ ছাড়া তারা সভ্য শাসনব্যবস্থার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।[২২]

সেই অসিয়তের মধ্য হতে যে মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তা আমরা পৃথকভাবে বের করে আলোচনা করতে পারি।

[২০] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩।
[২১] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুন,* পৃষ্ঠা : ৩৩।
[২২] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিততারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ২৬।

[১] হে পুত্র, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে কাজের আদেশ করেননি তা করা থেকে বিরত থাকো।

এটি ছিল প্রত্যেক বড় এবং ছোট কাজে আল্লাহ তাআলার শরিয়তকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান, যেন আল্লাহ তাআলার আদেশ এবং হুকুম সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ

{হুকুম একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করো। এটাই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই তা জানে না।} [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০]

অর্থাৎ, প্রতিপালন, আকিদা-বিশ্বাস এবং লেনদেন-মোয়ামালায় সঠিক এবং সত্য হুকুম একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। তিনি তার রাসুলগণ হতে যাকে নির্বাচিত করেন, তার কাছে এই হুকুম অহিরূপে প্রেরণ করেন। কোনো মানুষ তাতে তার সিদ্ধান্ত এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী হুকুম করতে সক্ষম হবে না। এমনকি তাতে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, সাধারণ চিন্তা এবং সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োগ ঘটাতেও সক্ষম হবে না। সুতরাং এই নিয়মটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ধর্মের মূল খুঁটি, যা সকল রাসুলগণের মুখনিঃসৃত হয়েছে। যুগ ও স্থানের পরিবর্তনে তা কখনোই পরিবর্তিত হবে না।[২৩] পবিত্র কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়েছে উবুদিয়্যত অর্থাৎ গোলামি আর হাকিমিয়্যাত অর্থাৎ হুকুম প্রদানের ক্ষমতা সাব্যস্ত করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ـ

{নিশ্চয় আমি তোমার কাছে সত্য কিতাব প্রেরণ করেছি; যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন তার মাধ্যমে—লোকদের মাঝে ফায়সালা করতে পার।} [সুরা নিসা, আয়াত : ১০৫]

সুতরাং উবুদিয়্যত সাব্যস্ত করা যেমন কুরআন অবতীর্ণ করার মূল উদ্দেশ্য, হাকিমিয়্যত প্রয়োগ করাও তেমন-ই তা অবতীর্ণ করার চূড়ান্ত লক্ষ্য।[২৪]

নিশ্চয় উসমান তাঁর ছেলেকে একজন হাকিম তথা শাসকের মতো অসিয়ত করে গেছেন, যেন তার পরবর্তী সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্যের সকল কাজে তিনি আল্লাহর

[২৩] *তাফসিরুল মানার,* ১২/৩০৯।
[২৪] *আল-হাকিমু ওয়াততাহাকুমু ফি খিতাবিল আহি,* ১/৪৩৩।

হুকুমকে আঁকড়ে ধরেন। কেননা, তিনি জানেন, একজন মুসলিম শাসক আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকার এবং চুক্তিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করেছেন—

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ـ

{তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ওই অঙ্গীকারকেও—যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭]

এখানে আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাগণকে ওই সকল নিয়ামত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা তিনি শরিয়তে তাদের জন্য প্রণীত করেছেন। রাসুলগণকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর তাদের কাছে সেই দ্বীন তথা শরিয়তের অনুসরণের, দ্বীনের সাহায্যের, দ্বীনের তাবলিগের, দ্বীন প্রতিষ্ঠার এবং তার ওপর অটল থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছায় তার কথা শ্রবণ এবং তার আনুগত্যের যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন এটাই সেই বাইয়াতের সারাংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ' وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ـ

{তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফায়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফায়সালাকারী কে?} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৫০]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কারও হুকুম তালাশ করে, তাদেরকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। এ আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, আহলে কিতাব এবং আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তারা জাহিলিয়াতের হুকুম তালাশ করত, যা ছিল তাদের কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং মূর্খতা, যা কোনো কিতাব থেকে প্রকাশ পায়নি এবং যার উৎস অহি নয়।[২৫]

নিশ্চয় হাকিমিয়্যাতের বাস্তবায়ন ঘটলে উবুদিয়্যাত এর বিকাশ সম্ভব। এতেই প্রতিষ্ঠিত হবে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে সৃষ্ট হয়েছে জীন ও মানবজাতি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[২৫] *তাফসিরে আবুসসউদ,* ২/৭১।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

{আমি জিন এবং মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।} [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬]

অর্থাৎ, যেন এক আল্লাহ তাআলারই অনুসরণ করে—যার কোনো অংশীদার নেই।[২৬]

আর ইবাদতের অর্থ অনেক ব্যাপক ও প্রশস্ত। তা অনেক সম্পর্ক এবং আমলকে সমন্বয় করে। তন্মধ্যে কিছু এককভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আবার কিছু আমল ইসলামি সাম্রাজ্যের ছায়া ব্যতীত কখনোই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আর এই উচ্চাঙ্গের অর্থটা উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমান তার মাথায় বেশ ভালোভাবেই গেঁথে নিয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি উরখানকে এই শক্তিশালী রূপরেখা সম্বলিত বাক্যের মাধ্যমে অসিয়ত করেছিলেন। উসমানের পক্ষ থেকে তার ছেলের জন্য এই বাক্যটি ছিল একজন সাধারণ লোক হিসেবেও আবার একজন সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবেও। কথার দৃষ্টে বলতে হয়, ইবাদতের দুটি মৌলিক অর্থ রয়েছে। **এক.** আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করা। **দুই.** তিনি যা আদেশ করেছেন এবং যা প্রণয়ন করেছেন তদানুযায়ী ইবাদত করা।[২৭] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উসমানি সাম্রাজ্য এ দুটি অর্থের তত্ত্বাবধানে ছিল বেশ তৎপর। তাই তারা অভ্যন্তরে শিরকের সাথে লড়াই করেছে আর বাহিরে তা প্রয়োগ করার জন্য কাজ করেছে। এমনিভাবে তারা শরিয়তের সংরক্ষণেও ছিলেন সজাগ। তাই যারা শরিয়তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদআতি কর্মকাণ্ড, অপব্যাখ্যা, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের শক্ত-হাতে প্রতিহত করেছেন। এসবই হয়েছিল তাদের আমির আর তার আশপাশের উলামায়ে কেরামের আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টচিত্তে উবুদিয়্যাতের বাস্তবায়নের আগ্রহের ফলে। তারা পথভ্রষ্টদের আক্রমণ এবং দখলদারিত্ব থেকে দ্বীনকে হেফাজত করতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমেই বনি উসমানের সাম্রাজ্য হয়েছিল আল্লাহর রঙধারী সাম্রাজ্য। (এ সাম্রাজ্যের উত্থান এবং বিস্তৃতি ছিল ইসলামি পন্থায়, খাঁটিভাবে, মজবুত ইমানে ভরপুর হয়ে এবং ধর্মীয় লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে)।[২৮]

[২] শাসন করতে গিয়ে যখন তুমি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি উলামায়ে দ্বীনের পরামর্শকে আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করবে।

পরামর্শের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ হিকমাহ, মহৎ উদ্দেশ্য, বড় বড় উপকার এবং ফায়েদা আছে বিধায় আল্লাহ তাআলা পরামর্শের প্রথা প্রণয়ন করেছেন, যা জাতি এবং রাষ্ট্রকে

[২৬] *তাফসিরে ইবনে কাসির,* ৪/২৩৯।
[২৭] *মাজমুউল ফাতওয়া,* ১০/১৬৩।
[২৮] *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ,* মাহমুদ সাবেত আশশাযিলি, পৃষ্ঠা : ৫৪।

কল্যাণ এবং সমৃদ্ধির পথ দেখায়। এ জন্যই প্রথম উসমান তার ছেলেকে বিভিন্ন সমস্যায় উলামায়ে কেরামকে মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা বানাতে আদেশ দিয়েছিলেন। তার এই আদেশ ছিল আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ' إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ـ

{আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন, কাজে-কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন, আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯]

সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'তোমরা নানা বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো।'

এই অকাট্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম এ বিষয়টিকে শাসনের নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। এমনকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই পরামর্শ করেছেন। এটি একটি অকাট্য বিষয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরামর্শ হচ্ছে একটি প্রাথমিক মৌলিক ভিত্তি—যা ব্যতীত ইসলামের নিজাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।[২৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ـ

{যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ আদায় করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।} [সুরা শুরা, আয়াত : ৩৮]

[২৯] *ফি যিলালি কুরআনিল কারিম*, ৪/৫০১।

উস্তাদ আবদুল কাদির আওদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'পরামর্শ করা হচ্ছে ইমানের একটি স্তম্ভ আর মুসলিমদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনের এই আয়াতে পরামর্শ, নামাজ আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাকে একই কাতারে রেখেছেন।'

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ـ

{যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।} [সুরা শুরা, আয়াত : ৩৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইস্তেজাবা অর্থাৎ তার ডাকে সাড়া দেওয়ার কয়েকটি মাধ্যম নির্ধারণ করে তন্মধ্য হতে সুস্পষ্ট মাধ্যমগুলো বলে দিয়েছেন, সেগুলো হলো, নামাজ আদায় করা, পরামর্শ করা এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। সুতরাং পরামর্শ হচ্ছে ইমানের অন্তর্ভুক্ত। তাই যারা পরামর্শ ছেড়ে দেয় তাদের ইমান পরিপূর্ণ হবে না। তারা যদি সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পরামর্শ না করে, তাহলে তাদের ইসলাম সুন্দর হবে না। পরামর্শ করা মুসলিমদের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ, তা ছাড়া তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না। শাসক এবং জনগণ সকলের জন্যই পরামর্শ একটি আবশ্যকীয় ইসলামি আহ্বান। তাই শাসকের জন্য আবশ্যক হলো, বিচারকার্য, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সকল কাজে পরামর্শ করে নেওয়া। এভাবে ব্যক্তিগত কল্যাণকর কাজে অথবা সকলের মঙ্গলজনক কাজে পরামর্শ করে নেওয়া। আর জনগণের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন এ সকল ব্যাপারে তাদের শাসককে পরামর্শ প্রদান করে। চাই শাসক তাদের কাছে পরামর্শ কামনা করুক বা না করুক।[৩০]

আর পরামর্শের ব্যাপারে অনেক কওলি এবং ফেলি হাদিস পাওয়া যায়। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় যা উল্লেখ করেছি তাতেই থামছি।

আরেক বর্ণনায় উসমান তার ছেলেকে আলেমদের সিদ্ধান্তে নেমে যেতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তুমি তাদের পরামর্শে নেমে যাবে। কেননা, তারা তোমাকে অকল্যাণের নির্দেশ দেবে না।'[৩১]

উসমান রাহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, একজন শাসকের জন্য পরামর্শ করা অত্যাবশ্যক। সমসাময়িক অনেক উলামায়ে কেরাম এতে সহমত পোষণ করেছেন। তার মধ্যে একজন হলেন আবুল আলা মওদুদি রহ.। তিনি বলেন, 'আর ইসলামি সাম্রাজ্যের পঞ্চম

[৩০] *আল-ইসলামু ওয়া আওয়াউনাস সিয়াসিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৯৩।
[৩১] *জাওয়ানিবুল মুদিয়্যাতু*, পৃষ্ঠা : 21।

আবশ্যকীয় নীতি হচ্ছে, সাম্রাজ্যের শাসকগণ এবং নেতৃবৃন্দের মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের সিদ্ধান্ত ও সন্তুষ্টিতে রাজ্য পরিচালনা করা। আর পরামর্শের মাধ্যমেই শাসননীতি প্রণয়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ـ

{আর তারা তাদের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ করে নেয়।} [সুরা শুরা, আয়াত : ৩৮]

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ـ

{আর তোমরা তাদের সাথে সকল বিষয়ে পরামর্শ করো।} [আল-ইমরান, আয়াত : ১৫৯][৩২]

وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ـ

{আর তারা তাদের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ করে।}

এই আয়াতে বর্ণিত নীতিটি পাঁচটি বিষয়ের দাবি জানায়। তার মধ্যে পঞ্চমটি হলো—পরামর্শসভার সবাই অথবা তাদের অধিকাংশ যে বিষয়ে একমত হয় তা মেনে নেওয়া। এমন নয় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরামর্শসভার সকলের মন্তব্য শুনে তারপর নিজস্ব স্বাধীন মত প্রকাশ করবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, 'তাদের কাজসমূহে তাদের সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ গ্রহণ করা হবে' বরং তিনি বলেছেন, 'তারা তাদের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ করে নেয়।' অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে পরামর্শ হবে তার ওপরেই চলতে হবে। আর শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই আল্লাহর এ কথার প্রয়োগ হবে না। এ ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, তা বাস্তবে করে দেখানো এবং তাদের পরামর্শমতেই কার্যাবলি পরিচালনা করা)।[৩৩]

এভাবেই আমরা দেখতে পেলাম—সমসাময়িক অনেক উলামায়ে কেরাম এবং চিন্তাবিদদের পেছনে ফেলে তিনি পরামর্শকে অত্যাবশ্যক মনে করেছেন এবং তার ছেলেকে আলেমদের সিদ্ধান্তে শাসনক্ষমতা থেকে নেমেও যেতে বলেছেন। কেননা, তারা কখনো অকল্যাণের কথা বলেন না।

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ সভার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ফলে জনগণ সর্বদা উসমানি সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থেকেছে এবং সুলতানকে রাজনৈতিক, জিহাদি এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিকে আহ্বানের মনোবল যুগিয়েছে। উসমানি শাসকগণ চাইতেন তাদের সিদ্ধান্তসমূহ যেন চলমান হয় এবং তাদের সাম্রাজ্য যেন স্থায়ী

[৩২] *আল-খিলাফাতু ওয়াল মুলক,* পৃষ্ঠা : ৪১, ৪২।
[৩৩] *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৯৪।

হয়। এ জন্য তারা তাদের রাষ্ট্রের পরিস্থিতির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা পরামর্শ সভাকেই সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম বানিয়েছেন।

উসমানি সাম্রাজ্যে পরামর্শসভা আরও বিস্তৃত হয়েছিল। প্রতিটি প্রদেশে একজন করে প্রশাসক ছিলেন—যার উপাধি ছিল 'পাশা'। তার ছিল মন্ত্রীসভা। তিনি তাদের সাথে শাসনতন্ত্র এবং জনগণের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতেন। প্রতিটি মজলিসের জন্য একজন নায়েব এবং তার অনুসারী নিযুক্ত ছিল। তাদেরকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এমনকি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়ে সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য পরামর্শসভা গঠন করা হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যের সময়কালে পরামর্শসভা গঠন এবং তা আয়োজন ও বাস্তবায়নের তরিকা ও পদ্ধতিসমূহ তাদের ইজতিহাদ, আলোচনা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যম ছিল। সাম্রাজ্যের মৌলিক বিষয়ের জন্য যে মূল পরামর্শ সভা গঠন করা হয়েছিল তাদের সিদ্ধান্ত ছিল অকাট্য। তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা এবং তাকে তুচ্ছ মনে করা ছিল অবৈধ। তবুও উসমানি সাম্রাজ্য কতক স্বেচ্ছাচারী সুলতানের আত্মপ্রকাশ থেকে মুক্ত ছিল না।

[৩] হে পুত্র, তোমাকে সর্বদা উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধান করার এবং তাদের প্রতি অধিক নিষ্ঠাবান হওয়ার অসিয়ত করছি।

উসমান তার যুগের বড় বড় আলেম, ফকিহ এবং দরবেশগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছিলেন। তাদের সাথেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন, তাদের নসিহত নিজের জন্য পাথেয় হিসেবে নিয়েছিলেন, তাদের ইলমের মাধ্যমে উপকার লাভ করতেন এবং রাজত্বের নানা ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি 'শায়খ ইদাহ বালি আল-কিরমানি'র কাছে বারবার যেতেন। শায়খ এক স্বপ্নের ফলে তার মেয়েকে উসমানের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনা হলো—

একদিন সুলতান উসমান শায়খের কাছে রাত্রিযাপন করেন। সে সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, শায়খের কোল থেকে একটি চাঁদ বের হয়ে তার কোলে প্রবেশ করছে। এমন সময় একটি বিরাট বৃক্ষের জন্ম হয়, যার ডালপালা দিগন্ত ঢেকে নিয়েছিল। তার নিচে একটি বিরাট পর্বতমালা, যার থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। আর লোকেরা সেই বৃক্ষ থেকে নিজেরা উপকৃত হচ্ছে, তাদের গৃহপালিত পশু এবং বাগানের জন্যও তা থেকে উপকার লাভ করছে। তিনি শায়খের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করলে শায়খ তাকে বলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ। তুমি রাজত্ব লাভ করেছ। তোমার মাধ্যমে এবং তোমার বংশধরদের মাধ্যমে মুসলিমগণ উপকৃত হবেন। আমি তোমার কাছে আমার এই মেয়েকে বিয়ে দিলাম।[৩৪]

[৩৪] *আশশাকায়িকুন নোমানিয়্যাহ ফি উলামায়িদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* তাশ কুবরা যাদাহ (৭ পৃষ্ঠা) তারিখে দাওলাতে উসমানিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করে।

অবশ্য কোনো কোনো গ্রন্থে এই স্বপ্নটিকে রূপকথা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইতিহাসে এর কোনো বাস্তবতা নেই। যদিও এটি *আশশাকায়িকুন নোমানিয়্যাহ ফি উলামায়িদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*-এর মতো গ্রহণযোগ্য একটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর এই গ্রন্থটি অনেক উৎকৃষ্ট এবং উপকারী। এর মধ্যে উসমানি সাম্রাজ্যের সময়কালীন আলেম এবং ফকিহদের সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

নিশ্চয় এই স্বপ্নটি যুক্তি এবং বর্ণনাবিরুদ্ধ নয়। কেননা, প্রথম উসমান ছিলেন একজন খোদাভীরু, পরহেযগার ব্যক্তি। আর খোদাভীরুতার ফল হচ্ছে, ভালো স্বপ্ন দেখা এবং সৃষ্টিজীবের প্রশংসা ও মহব্বত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْأَخِرَةِ ـ

{নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার ওলি ও বন্ধুগণ কখনো ভয় পাবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।} [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৬২-৬৪]

আর দুনিয়ার সুসংবাদ হলো, ভালো স্বপ্ন। যা কুরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও বর্ণিত হয়েছে—'ভালো স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে।[৩৫]

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত আছে—'নবুওয়াত থেকে এখন মুবাশশারাত অর্থাৎ সুসংবাদসমূহ বাকি আছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, 'সুসংবাদসমূহ কী?' তিনি বললেন, 'ভালো স্বপ্ন।'[৩৬]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, 'একলোক আল্লাহ তাআলার জন্য আমল করে এবং লোকেরা তাকে ভালোবাসে।' তিনি বললেন, 'এটা হলো মুমিনের দুনিয়ার সুসংবাদ।'[৩৭]

আল্লাহ তাআলা মানুষের মনে প্রথম উসমানের জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি করেছিলেন। তার জিহাদ, তাকওয়া এবং ভালো কাজের কারণে।

উসমান তার ছেলেকে উলামায়ে কেরামের সম্মানের ব্যাপারে যে অসিয়ত করেছিলেন তা একটি নীতিতে পরিণত হয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের শাসকগণ এই নীতি মেনেই

[৩৫] *বুখারি শরিফ,* কিতাবুর রুইয়া, বাবু রুইয়াস সালিহিন, ৮/৮৮, হাদিস নং, ৬৯৮৬।
[৩৬] *বুখারি শরিফ,* কিতাবুর রুইয়া, বাবুল মোবাশশারাত, ৮/৮৯, হাদিস নং, ৬৯৯০।
[৩৭] *মুসলিম শরিফ,* কিতাবুর রুইয়া, বাব ৪/২০৩৪।

চলেছেন। একথা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, উসমানি শাসকেরা আল্লাহর শরিয়তকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কেননা, শরিয়ত উলামায়ে কেরামকে মর্যাদা দিয়েছে এবং তা দুইভাবে ব্যক্ত করেছে।

[১] তাদের আনুগত্য করাই হলো আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করা। সুতরাং তাদের আদেশ মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

[২] তাদের আনুগত্য আসল উদ্দেশ্য নয়। তাদের আনুগত্যেই আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুসরণ হয়।

উলামায়ে কেরামের এই উচ্চ স্থান এবং মর্যাদার ব্যাপারে শরিয়তে অনেক দলিল রয়েছে। যেমন, প্রথম দলিল—

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ـ

{হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুল এবং তোমাদের মধ্য হতে উলুল আমর অর্থাৎ বিজ্ঞদের অনুসরণ করো।} [সুরা নিসা, আয়াত : ৫৯]

উলুল আমর এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কয়েকটি মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, তারা হলেন সুলতান এবং ক্ষমতাশীলগণ। কেউ বলেছেন, তারা হলেন আহলে ইলম তথা আলেমগণ।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করেছেন, যারা আল্লাহর অনুসরণ করে এবং অন্যদের দ্বীন শিক্ষা দেয় এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য তাদের আনুগত্য আবশ্যক করেছেন।'[৩৮]

তবে মূল কথা হলো, আমির তথা শাসকদের তখনই আনুগত্য করা হবে, যখন তারা ইলম তথা জ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী আদেশ দেবেন। তখনই তাদের আনুগত্য আলেমদের আনুগত্য হবে। কেননা, আনুগত্য কেবল ভালো কাজ এবং জ্ঞান যা আবশ্যক করে তার মধ্যে হবে। সুতরাং যেভাবে আলেমদের আনুগত্য করলে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য হবে, সেভাবে শাসকদের আনুগত্য করলেও আলেমদের আনুগত্য হবে। যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুটি দলের মাধ্যমে। আলেম এবং শাসকদের মাধ্যমে। তাই লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে। এই দুদলের কল্যাণের

[৩৮] *তাফসিরে তবারি,* ৫/১৪৯।

মাধ্যমেই জগতের কল্যাণ হবে এবং তাদের অবনতির মাধ্যমেই জগতের অবনতি হবে।[৩৯]

দ্বিতীয় দলিল—

জনসাধরনের মাঝে কোনো প্রশ্নের উদয় হলে আল্লাহ তাআলা লোকদের ওপরে আলেমদের কাছে যাওয়া এবং তাদের কাছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে আবশ্যক করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

{যদি তোমরা না জানো তাহলে আহলে জিকিরদের কাছে জিজ্ঞেস করো।} [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭]

এই আয়াতের ব্যাপকতা হলো, এর মধ্যে আহলে ইলমদের প্রশংসা করা হয়েছে। আর সবচেয়ে উচ্চ প্রশংসা হলো, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের জ্ঞান। কেননা, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় সমস্যায় তাদেরকে আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যেই আলেমদের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাদের আত্মশুদ্ধি অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, আল্লাহ তাদের কাছেই প্রশ্ন করার আদেশ দিয়েছেন। আর এই আয়াতের মাধ্যমেই জাহেলরা আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে।[৪০]

আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদিসের সংখ্যা অনেক। যেগুলো উল্লেখ করেছি তাতেই যথেষ্ট হবে মনে করছি।

উসমানি সাম্রাজ্যের সময়কালে বিভিন্ন বিপদ, দুর্যোগ এবং যুদ্ধের সময়ে আলেমগণ ছিলেন সুলতানদের নির্ভরতার স্থল। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পতাকাতলে সমবেত মানুষের হৃদয়ে তাদের মর্যাদার আসন ছিল সুউচ্চ। তাদের তত্ত্বাবধানেই শরিয়ত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে আলেমগণ সুলতানকে ছাড় দিতেন না। এ রকম হলে তারা মানুষকে তার ব্যাপারে সতর্ক করতেন এবং তাকে অব্যাহতি দিতেন। আলেম এবং ফকিহগণের হুকুম-আহকাম নির্গত হয় নিম্নবর্ণিত উৎস হতে।

১. আল-কুরআনুল কারিম

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللَّهُ ـ

[৩৯] *আলামুল মুওকিয়িন,* আবদুর রউফ সাদ কর্তৃক তাহকিককৃত, ১/১০।
[৪০] *তাফসিরে সাদি,* ৪/২০৬।

{নিশ্চয় আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা দেখিয়েছেন তার মাধ্যমে লোকদের মাঝে ফায়সালা করতে পারেন।} [সুরা নিসা, আয়াত : ১০৫]

এটিই হচ্ছে প্রথম উৎস—যাতে আছে মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিধিবিধান। আরও আছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কল্যাণের মৌলিক ভিত্তি এবং অকাট্য বিধান। কুরআন মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক ওই প্রয়োজনীয় বস্তুর কথা বলে দিয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত

এটি হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস, যা থেকে শরিয়তের আলেমগণ সাহায্য নিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমেই কুরআনি বিধানসমূহের প্রায়োগিক উপায় ও পন্থা সম্পর্কে জানা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দিয়ে উম্মাহর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর সুন্নাতের মাধ্যমেই জানা যায় সেই উত্তম সমাজব্যবস্থার দৃষ্টান্ত, যে সমাজব্যবস্থার জয়গান ইসলাম গায়।

৩. উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য

বিশেষত সাহাবিগণের ঐকমত্য। যাদের অগ্রে রয়েছেন খুলাফায়ে রাশেদিন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ـ

{হিদায়াতের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও যে রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ তালাশ করে, আমি তার ওপরে যা সে বহন করতে চায় তাই চাপিয়ে দেব, আর তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে। কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল জাহান্নাম!} [সুরা নিসা, আয়াত : ১১৫]

৪. আলেম এবং মুজতাহিদগণের মাজহাব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلٰٓى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ـ

{তাদের নিকট যখন কোনো ভয় অথবা নিরাপত্তার বিষয় আসে, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। যদি তারা তা তাদের রাসুলের কাছে এবং তাদের মধ্য হতে বিজ্ঞদের কাছে নিয়ে যেত, তাহলে তারা তাতে অনুসন্ধান করে জানতে পারত।} [সুরা নিসা, আয়াত : ৮৩]

যখন কোনো নস তথা আয়াত ও হাদিস পাওয়া না যাবে, তখন ইজতিহাদ এবং ইজমাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে দলিল হলো উক্ত আয়াতটি।[৪১]

আর উম্মতে মুহাম্মদির আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবিগণের মতো।[৪২]কেননা, ইলম তথা জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্য। আর শরিয়তের বিস্তৃত অঙ্গন হতে নিত্যনতুন হুকুম-আহকাম বের করার দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত। এই দায়িত্ব তাদের নিষ্পাপ হওয়ার মতো কোনো বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে নয়; কেননা, ইসলামে কোনো যাজকগিরি নেই; বরং যে যোগ্যতার দিকে তাকিয়ে তাদেরকে কুরআনে 'আহলে জিকির' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সেই কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

{যদি তোমরা না জান তাহলে আহলে জিকিরগণের কাছে জিজ্ঞাসা করো।} [সুরা নাহল, আয়াত : ৪৩]

উসমানি সালতানাতের আলেমগণ শরিয়তের রুহ এবং রীতিনীতি সম্পর্কে গভীর বোধসম্পন্ন ছিলেন। আর এই বোধের আলোকে বিভিন্ন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে তারা ছিলেন সুদক্ষ। তারা হুকুমের মূল এবং শাখাপ্রশাখার আয়ত্বকরণেও ছিলেন দক্ষ।

এই সালতানাতের আলেমদের কাছে সবচেয়ে ওপরে ছিল হানাফি মাজহাবের অবস্থান। তবে অন্যান্য মাজহাব থেকেও উসমানি সালতানাতের শাসকগণ বিমুখতা প্রদর্শন করেন নি।

উসমানি সালতানাতের আলেমগণ তাওহিদের বিশ্বাস, আল্লাহর শরিয়তের প্রয়োগ এবং শুরা বা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্থাপন করেছেন। তারা তাদের অর্থনীতির ভিত রচনা করেছেন সোনা-রুপার লেনদেনের ওপর। সুদি কারবার, জিনিসপত্র গুদামজাতকরণ এবং হারাম বস্তুর মাধ্যমে ব্যবসার উন্নতি সাধনের পথে তারা হাঁটেননি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছেন শরিয়তের মূলনীতি অনুসারে।

[৪১] *তাফসিরে কুরতুবি*, ৫/২৯২।

[৪২] এই কথাটিকে অনেকে হাদিস হিসেবে প্রচার করে থাকে যা সঠিক নয়। হাদিস হিসেবে একে আখ্যায়িত না করে সধারণ কথা হিসেবে বিবেচনা করলে তা কোনো কোনো দিক দিয়ে ঠিক আছে। যেমন একটা দিক লেখক তুলে ধরেছেন।—সম্পাদক

চারিত্রিক এবং ব্যবহারিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামি আকিদার মূল ভিত্তি অনুযায়ী। এমনকি তাদের রাজত্বের সম্পর্কগত ভিত রচনা করেছেন আল্লাহ তাআলার প্রনয়ণকৃত ইসলামি আকিদার আলোকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ا يَنْهٰىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قٰتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيٰرِكُمْ وَظٰهَرُوا۟ عَلٰٓى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ـ

{দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি সদাচারণ করতে এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অত্যাচারী।} [সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮,৯]

উসমানি সালতানাতের আমলে আলেমগণ আল্লাহর শরিয়তের প্রয়োগ, আল্লাহ তাআলার বর্ণিত বিচার প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হারাম হিসেবেই ঘোষণা করা এবং তা হালাল মনে না করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

অধিকাংশ উসমানি শাসকগণ আলেমদের সম্মান করেছেন এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন।

[৪] জেনে রাখো হে পুত্র, নিশ্চয় ইসলামের প্রচার করা, তার দিকে লোকদের আহ্বান করা এবং মুসলিমদের সম্মান ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কাঁধে আমানত। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

প্রথম উসমান বুঝতে পেরেছিলেন ইসলাম হচ্ছে একটি চলমান দাওয়াতের ধর্ম। জমিন থেকে যত দিন মানবজাতি বিলুপ্ত না হবে, তত দিন এই ধর্ম বিলুপ্ত হবে না। আর ইসলামি সাম্রাজ্যের লক্ষ্য হচ্ছে দাওয়াতের স্রোতকে সম্মুখপানে প্রবাহিত করা, যাতে ইসলামের আলো সকলের কাছে পৌঁছে যায়। উসমানি সালতানাত জমিনের আনাচে-কানাচে এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের কাছে আকিদার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের প্রচার-

প্রসার করাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করত। উপকার এবং মুনাফার ভিত্তিতে নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এভাবে পৃথিবীর দিকে দিকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ـ

{হে রাসুল, আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এমনটি না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা পৌঁছানো থেকে বিরত থাকলেন। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।} [সুরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদেশ পুরোপুরি মান্য করেছেন এবং জমিনের বিভিন্ন রাজার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি রোমের বাদশাহের কাছে চিঠি লিখেছেন। তাকে বলা হলো, তারা মোহরাঙ্কিত চিঠি ব্যতীত অন্য কোনো চিঠি পড়েন না। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রূপার মোহর নিয়েছিলেন এবং তা দ্বারা বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠিগুলোতে মোহর মেরেছিলেন। একই দিনে পারস্য, রোম, হাবশা, মিসর, বাহ্কা এবং ইয়ামামায় দূত ও চিঠি প্রেরণ করেছেন। এরপর আম্মান, বাহরাইন এবং ইয়ামেনের রাজাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।[৪৩]

তাই উসমান রাহিমাহুল্লাহ তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তার বংশধরগণ একই নীতিতে চলেছেন। তাদের রাজত্বকালে একটি দল দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ছিল। সুলতান এবং শাসকরা তাদের সাথে অবস্থান করতেন এবং তাদের যথাবিহীত খাতিরদারি করতেন। উসমানি শাসকগণ খ্রিষ্টানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বেশ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যথা—

- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, তার দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া, তার জীবনব্যাপী প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তুর মাধ্যমে তাকে সাহায্য করা এবং মসজিদসমূহে তার মাধ্যমে দোয়ার ব্যবস্থা করা।
- উসমানি শাসকগণ দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আর ইসলামের নানা নিদর্শনমূলক কাজের ক্ষেত্রে বিনয় অবলম্বন করেছিলেন, যা বহু খ্রিষ্টানের ইসলাম ধর্মে প্রবেশের কারণ হয়েছে।

[৪৩] *যাদুল মাআদ*, ১/১১৯-১২৪।

- খ্রিষ্টান গোলামদের সাথে কোমল আচরণ করা। একপর্যায়ে তাদের একনিষ্ঠতা প্রমাণিত হলেও অনেক সময় তাদেরকে আজাদ করে দিতেন এবং তাদের দেখভাল করতেন। এমনকি যদি তাদের মধ্য হতে কেউ স্বীয় ধর্মে বহাল থাকত তবুও। বিশেষকরে যারা বয়সে প্রবীণ তাদের সাথেও আজাদ করার পর একই আচরণ করতেন। তাদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করত তাদের প্রতিও অনুগ্রহ করতেন। এই বিষয়গুলো তাদের অনেককেই ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৪৪]
- অনেক উসমানি ব্যক্তি খ্রিষ্টান নারীদের বিয়ে করেছেন, যাদেরকে গির্জায় প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। পরে তারা নিজেদের স্বামীর (ধর্মের) অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।
- অনেক খ্রিষ্টান তাদের আত্মীয়-স্বজনদের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যখন তারা ইসলামের অনুগ্রহ এবং তার উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলি, বিবেকের প্রতি তার সম্বোধন এবং অন্তরসমূহকে সতেজকরণ পরিলক্ষিত করেছে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে।
- উসমানি রাজাগণ অনেক ইসলামি গোত্রকে খ্রিষ্টানদের এলাকায় স্থানান্তর করে দিয়েছেন এবং অনেক খ্রিষ্টানকে মুসলিমসমাজে স্থানান্তর করে দিয়েছেন; যার ফলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে।
- বন্দীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার নীতি সুলতান মুরাদ মেনে চলতেন। তাদের এই নীতি মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।
- স্থানীয় জমিদারদের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার বলকান অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে অবদান রেখেছে। অন্যদিকে জমিদারদের বিপরীতে সেখানকার শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিরা গির্জার রহস্য এবং তার কার্যাবলি বিক্রি করে তাদের এলাকাকে উসমানি সাম্রাজ্যের নিয়মে মজবুত করতে চেয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ ইসলামও গ্রহণ করেছেন।
- উসমানি সুলতানগণ খ্রিষ্টানদের নেতৃবর্গের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের প্রতি দান, অনুগ্রহ এবং তাদের সক্ষমতার জন্য উদারতা প্রদর্শন করেছেন, তাদের মধ্য হতে অনেকেই উসমানি সালতানাতের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা দেখিয়েছে।[৪৫]

[৪৪] *কিরআতুন জাদিদাতুন ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন*, ড. যাকারিয়া বাইয়ুমি, পৃষ্ঠা : ৫১-৫৩।
[৪৫] *কিরআতুন জাদিদাতুন ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন।*

ইসলামি সাম্রাজ্যের বহিরাঞ্চলে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করার ব্যাপারে এবং সেখানকার লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করার ব্যাপারে উসমানি শাসকরা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। এভাবে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মসূচি এবং সৎকাজের প্রতি আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্বকেও তারা সমানভাবে পালন করেছেন।

প্রথম উসমান রাহিমাহুল্লাহু তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, মুসলিমদের সম্মান এবং সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ মুসলিম শাসকের কাঁধে আমানতস্বরূপ। তাদের রীতিমতে, এ বিষয়গুলোসহ সৎকাজের প্রতি আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতি নিষেধ করা, ইসলামি বিচারকার্য প্রয়োগ এবং উম্মাহকে উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান ও তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া ইবাদতের আওতায় পড়ে। এর মাধ্যমে উম্মাহ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, পাশাপাশি শাসক এবং জনগণ ব্যাপক উপকার এবং কল্যাণ লাভ করবে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাগুলো হলো—

ইসলামি জাতীয়তা এবং শরিয়াহর প্রতিষ্ঠা। দ্বীন ও আকিদার সংরক্ষণ

এর মাধ্যমে আল্লাহর কালিমা উড্ডীন হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ـ

{যদি আল্লাহ তাআলা মানবজাতির একদলকে অপরদলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তাহলে গির্জা, ইবাদতগাহ এবং মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। যেগুলোতে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়।} [সুরা হজ, আয়াত : ৪০]

একজন মানুষের জন্য আদেশ পালন করা, নিষেধ বর্জন করা এবং দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক। তাই যে কল্যাণের প্রতি আদেশ না করে এবং তা পরিত্যাগ করে সে যেন অনিষ্টের প্রতি আদেশ করল।[৪৬]

উকুবাতে আম্মাহ অর্থাৎ সামগ্রিক শাস্তি তুলে নেওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ـ

[৪৬] *আল-আমরু বিলমারুফিই ওয়ান নাহয়ু আনিল মুনকারি,* খালিদ আসসাবত, পৃষ্ঠা : ৭২।

{তোমাদের যে বিপদাপদ স্পর্শ করে তা তোমাদের হাতের উপার্জনের ফলেই।} [সুরা শুরা, আয়াত : ৩০]

উহুদের ময়দানে মুসলিমদের বিপদের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ـ

{হে নবি, আপনি বলে দিন এসব তোমাদের নিজেদের জন্যই হয়েছে।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৬৫]

সুতরাং সব ধরনের কুফরি এবং গোনাহ বিপদ, বিপর্যয় এবং ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ـ

{তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের থেকে এমন কোনো সৎলোক কেন থাকল না যারা বিশৃঙ্খলা হতে বাধা দিত? তবে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে মুক্তি দিয়েছি।} [সুরা হুদ, আয়াত : ১১৬]

তিনি আরও বলেন—

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ـ

{আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, তিনি কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দেবেন; সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।} [সুরা হুদ, আয়াত : ১১৭]

(এই আয়াতগুলো ইঙ্গিতবহ, যার মাধ্যমে জাতিসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার একটি নীতি প্রকাশ পেয়েছে। যে জাতির মধ্যে জুলুম, ফাসাদ হয় এবং সেগুলো হতে বাধা প্রদানের লোকও বিদ্যমান থাকে, সে জাতি নাজাতপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা সে জাতিকে শাস্তি দেবেন না এবং ধ্বংসের মুখোমুখি করবেন না।)[৪৭]

আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষণ

কেননা, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং নেককাজ করা নেয়ামতলাভের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[৪৭] *যিলালুল কুরআন,* ৪/১৯৩৩।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ـ

{স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন আপনার প্রভু ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদের জন্য নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব।} [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭]

আর সৎকাজের প্রতি আদেশ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করাও একপ্রকারের ইবাদত।

উম্মাহর জন্য কল্যাণের গুণের বাস্তবায়ন

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ـ

{তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের প্রতি আদেশ দেবে, অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১১০]

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হতে দূরে থাকা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ـ

{পুরুষ এবং নারীদের মাঝে যারা মুমিন তারা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ হতে নিষেধ করে, নামাজ পড়ে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসরণ করে।} [সুরা তাওবা, আয়াত : ৭১]

[৫] হে পুত্র, তোমার অনুসারীদের সম্মান করো এবং সৈন্যদের প্রতি অনুগ্রহ করো।

মুসলিম উম্মাহ গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মানুষকে কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন এবং তাদের আত্মিক শুদ্ধতার প্রয়োজনবোধ করে। যা অপরের জন্যও

উপকার বয়ে আনবে। এটাই এই উম্মতের সাক্ষ্য ও চিহ্ন। কেননা, তারা হচ্ছে উম্মতে ওয়াসাত তথা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জাতি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ـ

{এভাবে আমি তোমাদের বানিয়েছি মধ্যপন্থা অবলম্বী জাতি। যাতে করে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন রাসুল।} [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩]

রক্ষক এবং রক্ষিত, শাসক এবং শাসিতের কিছু হক রয়েছে। উসমান রাহিমাহুল্লাহ তার অসিয়তের মাঝে তার ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন, শাসকের ওপরে জনগণের কী কী হক রয়েছে। উসমানি শাসকগণ জনগণের হক বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। তারা যে হকগুলো আদায় করেছেন তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. উম্মতের আকিদা-বিশ্বাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে কাজ করা।
২. উম্মতের ঐক্যের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা।
৩. বহিরাগত আক্রমণ থেকে উম্মতের প্রতিরক্ষায় কাজ করা।
৪. বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং লড়াইকারীদের অনিষ্ট থেকে উম্মাহর রক্ষায় শাসকদের ভূমিকা রাখা।
৫. উম্মাহকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা।
৬. শরিয়ত যে লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে তা হেফাজত করা।
৭. জাকাত, সদকা, ট্যাক্স আদায় এবং সেগুলোকে শরিয়ত নির্দেশিত খাতে ব্যয় করা।
৮. আরবাবে মানাসিব অর্থাৎ জাকাত সদকার হকদার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক আমানতদারীতা অবলম্বন।
৯. জনগণের যথাযথ হক আদায় করা এবং বাইতুল মাল থেকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে অপচয় এবং কৃপণতা না করা। আর সঠিক সময়ে তা হস্তান্তর করা। আগপিছ না করা।
১০. প্রশাসনিক এলাকার প্রত্যেক অঞ্চলে জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের দেখভাল করা, যা তাদের অবস্থার উন্নতির নিয়ামক হয়।[৪৮]

[৪৮] *আল-হাকিমু ওয়াল মাহকুমু ফি খিতাবিল আহি,* ২/৩১৫-৩২৩।

আর শাসকদের প্রতি জনগণের আবশ্যক হকগুলো হলো—

১. আনুগত্য

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ـ

{হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুল এবং উলুল আমর অর্থাৎ জ্ঞানীদের এবং শাসকদের অনুসরণ করো।} [সুরা নিসা, আয়াত : ৫৯]

উসমানি সাম্রাজ্যের জনগণ যত দিন শরিয়তকে আঁকড়ে ধরেছিল তত দিন তারা তাদের শাসকদের আনুগত্য এবং তাদের আদেশ শ্রবণে গুরুত্ব দিত। কেননা, তারা জানত, শাসকদের আনুগত্য আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'গোনাহের ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য হবে কেবল সৎকাজে।'[৪৯]

২. সাহায্য-সহায়তা

উসমানি সাম্রাজ্যের জনগণ সর্বদা তাদের শরয়ি শাসকগণের আশপাশে থাকতেন এবং জিহাদের ডাকে সাড়া দিতেন। অনেকে তাতে অসামান্য অবদান রাখতেন। আর কেউ কেউ সামান্য হলেও অবদান রাখতেন এবং সেটাকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত মনে করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ـ

{তোমরা নেককাজ এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরের সাহায্য করো।} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ২]

উসমানি সাম্রাজ্যের জনগণ তাদের নেতাদের অভিরুচি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। শাসককে সাহায্য করার মানে হচ্ছে তাকে অপমানিত হতে না দেওয়া। আর তাকে সম্মান এবং গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে মূলত তাকে শক্তিশালীই করা হয়। জাতির ওপরে তাদের কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব ছিল আল্লাহর কালিমাকে উন্নীত করার জন্য; যা তাদের প্রতি যথাবিহীত সম্মান এবং নিষ্ঠা প্রদর্শনকে আবশ্যক করে। এর মাধ্যমেই আল্লাহর শরিয়তের প্রতি সম্মান এবং নিষ্ঠা দেখানো হয়, যার মাধ্যমে তারা তাদের কার্যাবলি পরিচালনা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

[৪৯] *সহিহ মুসলিম শরিফ,* কিতাবুল ইমারাহ, বাবু মান ফারাকা আমরাল মুসলিমিন, ৩/১৪৬০। হাদিস নং-১৮৫২।

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাকে সম্মান জানানোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, মুসলিম বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান করা, কুরআনের বাহককে সম্মান করা, এ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এবং কঠোরতা না করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা'।[৫০]

৩. কল্যাণ কামনা করা

উসমানি সাম্রাজ্যের জনগণ সর্বদা তাদের শাসকগণের কল্যাণ কামনা করতেন। এটাকে তারা দ্বীনের নির্যাস মনে করতেন। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'কল্যাণকামিতার নামই হচ্ছে দ্বীন।', এ কথা তিনি তিনবার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, কার জন্য কল্যাণকামিতা?' তিনি বললেন, 'মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসুলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।'

৪. শক্তিশালীকরণ

উসমানি সাম্রাজ্যের জনগণের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, উম্মাহকে সুদৃঢ় করতে হলে তাদের অভিভাবকগণকে দৃঢ় করতে হবে। এ জন্যই আমরা উসমানিদের ইতিহাসে তাদের শাসকদের সুদৃঢ়করণে, তাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানে এবং তাদের কল্যাণকামিতায় জনগণের উল্লেখযোগ্য অবদান দেখতে পাই। ৯৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করা 'আলাউদ্দিন আলি ইবনে আহমদ আল-জামালির' কথা বলি। তিনি ছিলেন একজন আলেম, আবেদ মানুষ। তিনি তিলাওয়াত, ইবাদত, দরস এবং ফাতওয়ায় তার সময় ব্যয় করতেন। জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। তিনি ছিলেন উদার মনের এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। মহৎ গুণাবলির অধিকারী, সত্যের প্রতি নিবেদিত এবং সংযত জবানের অধিকারী। কারও মন্দাচার করতেন না। ৯২৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করা 'সুলতান সেলিম খানের সাথে ছিল আলাউদ্দিনের অনেক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। যেমন, একবার সেলিম খান তার দেড়শ কর্মচারীকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ কথা শুনে আলাউদ্দিন প্রধান দেওয়ানের কাছে যান। তার অভ্যাস ছিল তিনি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ ব্যতীত সুলতানের কাছে যেতেন না। রাজদরবারের আমির-উমারাগণ শায়খের আগমন টের পাওয়া মাত্রই তাকে স্বাগত জানানোতে ব্যস্ত হয়ে যায়। তাকে রাজদরবারের উচ্চ আসনে আসীন করে তার কাছে আরজ করে, হুজুরের কী উদ্দেশ্যে দেওয়ানের কাছে আগমন হলো? তিনি বললেন, আমি সুলতানের সাথে দেখা করতে চাই, তার সাথে আমার কিছু কথা আছে। তারা তাকে সুলতানের সাথে দেখা করার অনুমতি দিলেন। তিনি একাই সুলতানের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্বশীলের কর্তব্য হচ্ছে

[৫০] *আবু দাউদ,* কিতাবুল আদব, তানযিলুন্নাসি মানাযিলাহুম, হাদিস নং-৪৮২২।

সুলতানের আখেরাতের হেফাজত করা। আমি শুনেছি আপনি রাজদরবারের ১৫০ কর্মচারীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। শরিয়ত অনুযায়ী তা বৈধ হবে না। এ কথা শুনে সুলতান রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন বেশ রাশভারী লোক। তিনি শায়খকে বললেন, আপনি সুলতানের কাজে বাধা দিবেন না। এটা আপনার কাজ নয়। শায়খ বললেন, বরং আমি আপনার আখেরাতের ব্যাপারে অনুপ্রবেশ করছি। আর নিশ্চয় এটা আমার কাজের অন্তর্ভুক্ত। আপনি যত দিন বাঁচবেন এরপর একদিন মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। তার সামনে হিসাবের জন্য অবস্থান করতে হবে। যদি আপনি ক্ষমাশীল হন তাহলে আপনি নাজাত লাভ করবেন। অন্যথায় আপনার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং বিশাল শাস্তি। আপনার রাজত্ব এবং ক্ষমতা আপনাকে তা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই সম্মানিত লোকের সত্য আহ্বানের সামনে আত্মসমর্পণ এবং তার কথা মেনে নেওয়া ছাড়া সুলতানের কোনো উপায় ছিল না। তিনি সত্যের সামনে অবনত হলেন। তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। সম্মানিত শায়খ এতেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি সকলকে তাদের কাজ ফিরিয়ে দিতে বললেন। সুলতান তাই করলেন। আল্লাহ তাআলা শায়খ আলাউদ্দিনের প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে মহান। সত্যের জন্য দুঃসাহসী। এ পথে তিনি ভয় পেতেন না কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে। এই আলেমের মাধ্যমে 'সুলতান সেলিম খান' অনেক প্রভাবিত হন। এরপর তার কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে রাজ্যের কাজি হওয়ার জন্য বলেন। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি আপনার জন্য উভয় পাশকেই (দুনিয়া ও আখেরাত) একত্র করলাম। কেননা, আমি উপলব্ধি করেছি, আপনি হক কথা বলেন। শায়খ তাকে লেখেন, আমার কাছে আপনার চিঠি পৌঁছেছে। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ এবং অক্ষত রাখুন। আপনি আমাকে কাজি হতে বলেছেন। নিশ্চয় আমি আপনার কথা মান্য করতাম, তবে আল্লাহ তাআলার সাথে আমি একটি অঙ্গীকার করেছি, তা হলো, আমার মুখ থেকে যেন কখনো 'আমি বিচার করেছি' এই শব্দটি বের না হয়। এরপরও সুলতান আজীবন তাকে ভীষণ ভালোবেসেছিলেন।[৫১]

এভাবেই উসমানি শাসকগণ তাদের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রণীত নীতি মেনে চলেছেন।

[৬] তোমার সৈন্যদল এবং সম্পদের মাধ্যমে শয়তান যেন তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে।

যে ব্যক্তি কুরআন বুঝে, তার মাধ্যমে প্রভাবিত হয় এবং নবি, রাসুল ও সৎলোকদের জীবনী নিয়ে গবেষণা করে, তারা এই অসিয়তটি বুঝতে সক্ষম হবেন। কেননা, তারা

[৫১] *শাযারাতুয যাহাব*, ৮/১৮৫

জানেন, তাওফিক অর্থাৎ কোনো কিছু করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, সম্পদ এবং সৈন্যের মাধ্যমে নয়। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বক্তব্য এমনই ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ' تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ـ

{হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। আপনি আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়া ও আখেরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং সৎলোকদের সাথে মিলিত করুন।} [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১]

এভাবেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার প্রভুর সাথে আলাপ করতেন। তিনি বলতেন, আমি জমিনের ক্ষমতাধর হয়েছি। আমার দিকে আসার জন্য বাহন প্রস্তুত করা হয়। আমার কথায় লোকেরা ওঠে-বসে। আপনি আমাকে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার জ্ঞান দিয়েছেন। আর সম্মান কেবল তারই, যে সম্মান এবং অনুগ্রহ করতে জানে। ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

এই দোয়ার মধ্যে আছে একাত্মবাদের স্বীকার, প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ এবং তার মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রকাশ। তাকে ব্যতীত অন্যান্য বাতিল উপাস্য থেকে বেঁচে থাকার ঘোষণা। আর বান্দার মৃত্যুর সময়ে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করার আবেদন। এসবই আল্লাহ তাআলার হাতে। বান্দার হাতে নয়। আরও আছে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন স্থল এবং তার সান্নিধ্যের সৌভাগ্য কামনা।[৫২]

জুলকরনাইন তার সেই বিখ্যাত সুবিশাল প্রাচীর নির্মাণের সময়ে বলেছিলেন—

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ـ

{তিনি বললেন, 'এটা আমার প্রভুর পক্ষ হতে রহমত।} [সুরা কাহফ, আয়াত : ৯৭]

অথচ তিনি ছিলেন সৈন্য-সামন্ত এবং সম্পদের মালিক। আশপাশের সকল অঞ্চলে ছিল তার আধিপত্য। তার এই বাক্যটি খুবই সুন্দর এবং বরকতময়; যা কয়েকটি অর্থের দিকে ইঙ্গিত দেয়—

[৫২] *আল-ফাওয়ায়িদ লিইবনিল কায়্যিম*, পৃষ্ঠা : ২১।

১. সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

জুলকরনাইন তার বিরাট কাজ সম্পন্ন করার পর সেদিকে তাকালেন। তাকে দম্ভ এবং গর্বের ছিটেফোঁটাও স্পর্শ করতে পারেনি। জ্ঞান-গরিমা এবং শক্তির নেশা তাকে আচ্ছন্ন পারেনি, বরং তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করেছেন। তিনি তাকে যে ভালো কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন তার কৃতিত্ব তাঁর দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৫৩]

২. জিকিরের সর্বোত্তম পন্থার মধ্য হতে একটি হচ্ছে বান্দা তার ওপরে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। ফলে সে উপলব্ধি করবে তার ওপরে আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। তাই সে বিনয়ী হবে, ইনসাফ করবে, আল্লাহর জিকির করবে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে।

এভাবেই উসমান রাহিমাহুল্লাহ অসিয়তের মাধ্যমে তার ছেলেকে শয়তান, তার পথ ও পন্থাসমূহ থেকে বাঁচিয়েছেন এবং তাকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

[৭] নিশ্চয় জিহাদের মাধ্যমে আমাদের দ্বীনের আলো দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত হবে, তাই যা বলবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বলবে।

উসমান রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর দ্বীনকে দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জিহাদকে একটি মাধ্যম মনে করতেন। আর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা, যাতে এক আল্লাহ, যার কোনো শরিক নেই, তার জন্য ইবাদত সাব্যস্ত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ' مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ'إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ـ

{আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রিজিক চাই না, চাই না তারা আমাকে খাবার খাওয়াক, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় রিজিকদাতা এবং সর্বশক্তিমান।} [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬-৫৭]

আর ইবাদতের অর্থ ইসলামের সকল কাজকেই শামিল করে। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মধ্যে—

[৫৩] *যিলালুল কুরআন,* ৪/২২৯৩।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ـ

{হে নবি, আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন-মরণ সব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।} [সুরা আনআম, আয়াত : ১৬২]

এ উদ্দেশ্যেই প্রথম উসমান রাহিমাহুল্লাহ তার সৈন্যদের নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। তার অবস্থা বলে দিত—আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্বাচিত করেছেন। আমরা যাদেরকে ইচ্ছা তাদেরকে বাতিল উপাস্যদের উপাসনা থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনব। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে, অন্যান্য ধর্মগুলোর অত্যাচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে পথ দেখাব।

জমিনে আল্লাহর হুকুমত এবং ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উসমানি শাসকগণের মাধ্যম ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

খ্রিষ্টানরা যখন উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তারলাভে বাধা দেওয়ার এবং তাদের ওপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করল, তখন জিহাদের ভূমিকা ছিল বিরাট পাথরের মতো; যে পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেছে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত সকল চেষ্টা। উসমানি শাসকদের সামনে ছিল আল্লাহ তাআলার এই আদেশ—

وَقٰتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ـ

{তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসে। আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। আর তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে, তারা তোমাদেরকে যেভাবে বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদেরকে সেভাবে বের করে দেবে। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।} [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯০, ১৯১]

উসমানি শাসকগণ এই নসিহত এবং অসিয়তের ওপর আমল করেছেন। তারা প্রত্যেক ওই প্রতিবন্ধকতাকে হটিয়ে দিয়েছেন যা মানুষকে আল্লাহর দাওয়াত শ্রবণ থেকে বাধা দিত, যে দাওয়াত এসেছে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ এবং উন্নত রূপরেখা নিয়ে।

উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যত দিন ইসলাম তাদের মাঝে বাকি ছিল আল্লাহ তাদের হাতে রাজ্যের পর রাজ্য বিজিত করেছেন।

এমনকি বর্তমান সময়েও[৫৪] তাদের হাতে বলকান বিজিত করেছেন। তারা মুসলিম সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছেন ওঁৎ পেতে থাকা খ্রিষ্টান পরাশক্তির কবল থেকে। তাদের কারণেই আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ওপর অটল ছিল।

এভাবে তারা মুসলিমদের পবিত্র জমিনকে রক্ষা করেছেন পর্তুগিজ এবং তাদের সাথে মিলিত খ্রিষ্টানদের কবল থেকে। এ ছাড়া আরও বড় বড় কাজ তারা সম্পন্ন করেছেন, যা আমি এই অধ্যায়ে আল্লাহ চাহেন তো বিস্তারিত বর্ণনা করব।

[৮] আমার বংশধরদের মধ্য হতে যারা সত্য এবং ন্যায়ের পথ থেকে সরে যাবে তারা হাশরের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

এ কথা বলে উসমান রাহিমাহুল্লাহ তার বংশধরদের মধ্য হতে যারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে যাবে তাদের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছেন। আর তার পরবর্তী সময়ে যারা আসবে তাদের জন্য সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দোয়া করেছেন।

ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে এবং ঐশী শাসনবিধান প্রতিষ্ঠায় আদল তথা ইনসাফ হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ। যে সমাজকে অত্যাচার কলুষিত করবে, যে সমাজে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যাবে না তার মধ্যে ইসলামকে পাওয়া যাবে না। এ জন্যই ইসলাম এই নীতির প্রতিষ্ঠা এবং তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। তাই এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে অধিক পরিমাণে আলোচনা হয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু হচ্ছে—

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسٰنِ ـ

{নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়ার আদেশ দেন।} [সুরা নাহল, আয়াত : ৯০]

এ আয়াতে আমর তথা আদেশকে ফে'ল অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, যা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

[৫৪] এটি বই রচনা করার আগের কথা। বর্তমান অবস্থার চিত্র ভিন্ন।—সম্পাদক

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ

{নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমানত তার মালিকের নিকট পৌঁছে দিতে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। আর যখন তোমরা লোকদের মাঝে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে ফায়সালা করার আদেশ দেন।} [সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلٰى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰىٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ـ

{হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ধারক হও, এবং আল্লাহ তাআলার জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমার, তোমার পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। কেউ যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয় আল্লাহই তাদের ব্যাপারে অধিক অবগত। সুতরাং ন্যায়বিচার করতে গিয়ে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা তা থেকে পাশ কাটিয়ে যাও এবং মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত।} [সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৫]

ন্যায় এবং ইনসাফ ছেড়ে দেওয়া জুলুম বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহ তাআলা জুলুমকে হারাম করেছেন আর জুলুমকারীদের নিন্দা করেছেন। তাদেরকে কেয়ামতের দিন কঠিন আজাবের এবং দুনিয়ায় ধ্বংসের ধমক দিয়েছেন।[৫৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ـ

{অত্যাচারীরা যা করে মনে করো না আল্লাহ সে সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না।} [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪২]

[৫৫] আননিযামুস সিয়াসি ফিল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ আবু ফারিস, পৃষ্ঠা : ৪৯।

আল্লাহ তাআলার এই দিক-নির্দেশনার ফলেই উসমান লোকদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করেছেন, যাতে তার পরবর্তী উসমানি শাসকগণ এ নীতি মেনে চলে। তাই তিনি তার সৈন্যদলে এবং তার অধীন সকল কর্মচারীদের মাঝে আল্লাহর একাত্মবাদ প্রচারের লক্ষ্যে এবং তাদের সাথে স্রষ্টার পরিচয় লাভের জন্য কাজ করেছেন।

তিনি একই সাথে তরবারির মাধ্যমে বিশাল বিশাল রাজ্য জয় করেছেন আর তার ইমান এবং ইহসানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করেছেন। তিনি মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর এই কথাকে মেনে চলতেন—

أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ’وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُ جَزَآءً الْحُسْنَىٰ ’ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

–

{যে অত্যাচার করে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে তার প্রভুর কাছে নেওয়া হবে আর তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান আর আমি তাকে সহজ কাজের কথা বলব।} [সুরা কাহফ, আয়াত : ৮৭-৮৮]

তাই তিনি তার অসিয়তে তার পরবর্তী সময়ে হক এবং ন্যায়ের পথে শাসন করতে বলে গেছেন। আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি অসিয়তে তার ছেলেকে বলেছিলেন, ‘তোমার সকল কাজে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো।’[৫৬]

[৫৬] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুন*, পৃষ্ঠা : ৩৩।

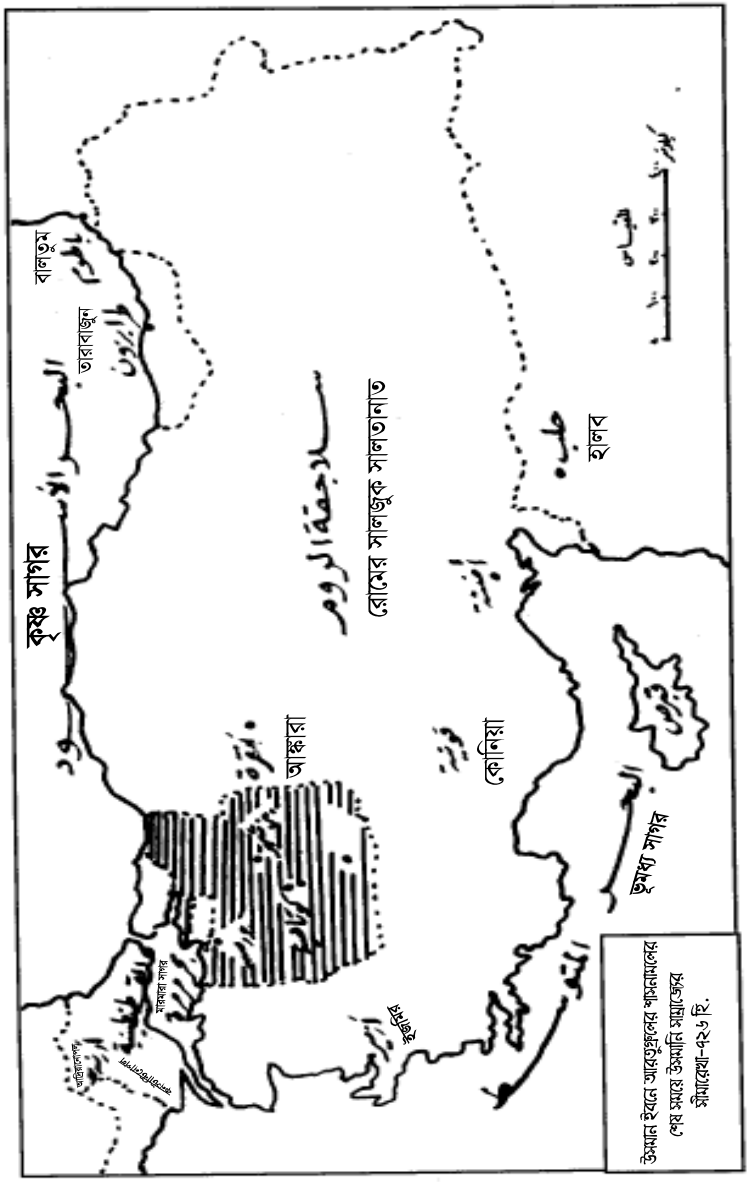

[৯] হে পুত্র, যারা শাসনের লোভে এবং একক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে আমরা তাদের মধ্য হতে নই। আমরা ইসলামের জন্যই বাঁচব, ইসলামের জন্যই মরব।

অসিয়তের এই ধারাটি অন্যান্য সালতানাতগুলোর তুলনায় উসমানি সালতানাতের গঠনতান্ত্রিক অনন্য বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। এই সালতানাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল ইসলামের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করা। এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। কনস্টান্টিনোপলীয় সাম্রাজ্যে আধিপত্য লাভ করা; যারা তাদের এলাকায় মুসলিমদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। এ জন্যই এই উত্থানমুখী সাম্রাজ্যের অধিপতিদের সাথে যুক্ত হয়েছিল গাজি অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধা উপাধি। তারা একটি জনসভায় একজন বড় আলেমের কাছ থেকে জিহাদের ঝান্ডা গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই উপাধি লাভ করতেন।[৫৭] আর গাজি উসমান রাহিমাহুল্লাহ তুর্কি এবং অন্যান্য মুসলিমদের আহ্বান করেছিলেন তারা যেন জিহাদের পতাকাতলে সমবেত হয়। বহুসংখ্যক ধৈর্যশীল মুমিনগণ তার এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কনস্টান্টিনোপলীয়দের ওপরে বিজয় এবং আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৫৮]

উসমানি শাসকগণ তাদের শক্তি, ক্ষমতা, সম্মান, সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্যের সময়ে এই স্থায়ী অসিয়ত মেনেই চলেছেন।

প্রথম উসমান তার মৃত্যুর পূর্বে ১৬০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। বাহরে মারমারা পর্যন্ত অঞ্চলে তার এই উদীয়মান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তার সৈন্যদলের মাধ্যমে তৎকালীন কনস্টান্টিনোপলীয়দের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর আজনিক এবং বুরুসাকে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৯]

[৫৭] *আল-মাসয়ালাতুশ শারকিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৯।
[৫৮] *তুরকিয়া ওয়াস সিয়াসাতুল আরাবিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১৩।
[৫৯] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ১৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান উরখান ইবনে উসমান

[৭২৭-৭৬১ হিজরি/১৩২৭-১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ]

উসমানের মৃত্যুর পর রাজত্বের অধিপতি হন তার ছেলে উরখান। শাসন এবং বিজয় অভিযানসমূহের ক্ষেত্রে তিনি তার পিতার নীতিই মেনে চলেছেন। ৭২৭ হিজরি মোতাবেক ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে তার হাতে 'নিকুমিদিয়া'র পতন হয়, যা এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে ইস্তাম্বুল শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বর্তমান 'ইজমির' শহর । তিনি দাউদ আল-কায়সারির হাত থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সে সকল আলেমদের একজন; যারা মিসরে পড়াশোনা করেছেন।[৬০] তিনি সমসাময়িক কাঠামো অনুযায়ী তার সেনাবাহিনী গঠনে গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং একটি সুসংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬১]

আল্লাহ তাআলা কুসতানতিনিয়া বিজয়ের যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন সুলতান উরখান তা বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাই তিনি একই সময়ে তার রাজ্যের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত হতে 'বাইজেন্টাইন' সাম্রাজ্যের রাজধানীর সীমানা পর্যন্ত একটি কৌশলগত রূপরেখা এঁকেছিলেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি তার ছেলে সুলাইমানকে দারদানিল প্রণালি অতিক্রম করে পশ্চিমপ্রান্তের এলাকাগুলোতে কর্তৃত্ব লাভের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন।

৭৫৮ হিজরি সনের একরাতে সুলাইমান দারদানিল প্রণালি অতিক্রম করেন। তখন তার সঙ্গে ছিল চল্লিশজন মুসলিম অশ্বারোহী। পশ্চিম তীরে পৌঁছে তারা সেখানকার রাষ্ট্রীয় নৌবহরের ওপর আধিপত্য লাভ করেন। এর মাধ্যমে তারা আবার পূর্ব তীরে ফিরে আসেন। তখন উসমানি সালতানাতের কোনো নৌবহর ছিল না। কারণ, উসমানি

[৬০] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৯।
[৬১] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ১৭।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুরুতে তাদের সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। পূর্ব তীরে পৌঁছে সুলাইমান নৌবহরে আরোহণ করে ইউরোপের তীরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানেই তারা 'তারান্নুব' কেল্লার বন্দর জয় করেন। আরও জয় করেন 'গালিয়ুবি' বন্দর। যাতে রয়েছে 'জানা কেল্লা' দুর্গ, 'আবসালা' দুর্গ এবং 'রুদাস্ত' দুর্গ। এর সবকটিই 'দারদানিল' প্রণালির উত্তর থেকে দক্ষিণে অবস্থিত। এই বিজয় অভিযানগুলোর মাধ্যমেই এই সুলতান একটি বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন—যা তার পরবর্তীদের কুসতানতিনিয়া বিজয়ে সহায়ক হয়েছে।[৬২]

সুলতান উরখানের কার্যক্রমসমূহ

এক. একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন

সুলতান উরখানের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হচ্ছে, একটি নতুন ইসলামি সেনাবাহিনী গঠন করা এবং সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষ নিয়মকানুন জারি করা। তিনি সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি ইউনিটে দশজন অথবা একশ কিংবা একহাজার করে সৈন্য ছিল। গনিমত তথা যুদ্ধলব্দ সম্পদের পাঁচ ভাগের একভাগ সেনাবাহিনীর জন্য দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছিলেন। তিনি একটি সার্বক্ষণিক সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার পূর্বে সেনাবাহিনী শুধু যুদ্ধের সময়েই একত্র হতো। তিনি সেনাবাহিনীর জন্য কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, যাতে তাদের পরিচর্যা সুষ্ঠু হয়।[৬৩]

এভাবে তার সাথে তিনি আরেকটি সৈন্যদল মিলিত করেছিলেন—যা 'জেনোসারি' নামে পরিচিত ছিল।[৬৪] অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে মুসলিমরা বিরাট বিরাট বিজয় লাভ করেছিলেন এবং তাদের রাজত্বের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করেছিলেন। এ সময় বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মাধ্যমেই সুলতান উরখান এই সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। এ সমস্ত বিজিত অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর সুলতান তাদেরকে ইসলামের প্রচারের জন্য মুজাহিদিনদের দলের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের ইসলামি চিন্তা-চেতনা লালনের শিক্ষা এবং যুদ্ধের শিক্ষা লাভ হলে তারা বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাবাহিনীর কেন্দ্রগুলোতে তাদের সহায়তায় নিয়োজিত থাকত। তখনকার উলামায়ে কেরাম তাদের শাসক সুলতান উরখানের পাশে থেকে লোকদের অন্তরে জিহাদ, দ্বীনের বিরুদ্ধে

[৬২] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাহ,* ড. জামাল আবদুল হাদি, পৃষ্ঠা : ২২।
[৬৩] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩২।
[৬৪] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩০২।

আক্রমণ প্রতিহত করা এবং দ্বীনের সাহায্যে আগ্রহের প্রতি ভালোবাসার বীজ রোপণ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণের পর তাদের উপাধি হতো গাজি অথবা শহিদ।[৬৫]

অধিকাংশ অমুসলিম ইতিহাসবিদ মনে করে, খ্রিষ্টানদের পরিবার থেকে তাদের শিশুদের ছিনিয়ে তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হতো। তাদেরকেই জেনোসারি সৈন্যদলে যুক্ত করা হতো। আর তাদেরকে যে নিয়মনীতি মেনে চলতে বলা হতো তার নাম ছিল 'নিজামে দাফশারিয়া'। তারা মনে করত, এই নিয়ম ইসলামি শরিয়াহর করের সাথে সম্পৃক্ত। তারা এই করের নাম দিয়েছিল 'জরিবাতুল গিলমান' অর্থাৎ বাচ্চাদের কর। কখনো কখনো তারা এটাকে 'জরিবাতুল আবনা' অর্থাৎ সন্তানদের কর-ও বলত।

তারা মনে করত, এটি এমন কর—যা উসমানি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক খ্রিষ্টান শহর অথবা পল্লীর একপঞ্চমাংশ শিশুদেরকে ছিনিয়ে নেওয়াকে বৈধ করেছিল। মুসলিমদের বাইতুল মালের গনিমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেওয়ার ওপর অনুমত করে। সে সমস্ত বাস্তবতা বিকৃতিকারী ইতিহাসবিদদের মধ্যে ছিল *কার্ল ব্রুকম্যান, জিওনাজ এবং জব;* কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের ধারণাকৃত *নিজামে দাসরাম* বাদশাহ উরখান এবং তার পুত্র মুরাদ ইবনে উরখানের ইতিহাসের ওপর চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। তাদের পরবর্তী সকল উসমানি শাসকদের ওপর থেকে তারা তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। মূলত নিজামে দাসরামা প্রণয়ন করা হয়েছিল ওই সমস্ত খ্রিষ্টান শিশু শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, যারা চলমান যুদ্ধের ফলে এতিম এবং গৃহহীন হয়ে গিয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্য যে নীতির ওপর চলেছে তা হলো ইসলাম। তাদের দিকে অমুসলিম ইতিহাসবিদরা *জারিবাতুল গিলমান* নামে যা রটিয়েছে, তা স্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যার শিশুরাই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাদের মা-বাবাকে হারিয়েছিল। তাই যে সমস্ত শিশুরা তাদের পিতা-মাতাকে হারিয়ে সেই বিজিত শহরের অলিগলিতে অসহায় হয়ে পায়চারী করত উসমানি সাম্রাজ্য তাদের লালনপালনের ভার নিয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের নিরাপত্তা এবং সম্মান নিশ্চিত করেছে। ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মে কি এই নীতি পাওয়া যাবে? উদভ্রান্ত শরণার্থী শিশুদের ইসলাম ধর্মে প্রবেশের ব্যাপারে উসমানি শাসকগণ আগ্রহী না হলে ওই বিকৃতিকারী ইতিহাসবিদরা কি এই অপবাদ দিতে পারত যে, মুসলিমরা খ্রিষ্টান শিশুদের তাদের পিতা-মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছে?

পরিতাপের বিষয় হলো, এই হিংসাত্মক মিথ্যা, প্রকাশ্য অপবাদ এবং বিশাল মিথ্যাচারিতাকে কোনো কোনো মুসলিম ইতিহাসবিদগণ তাদের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। যেন এটি কোনো স্বীকৃত বিষয়! শিক্ষার্থীদের তারা যেন জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি একটি বাস্তব ইতিহাস। অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ

[৬৫] *জাওয়ানিবু মুজিয়াহ,* পৃষ্ঠা : ১২২।

অমুসলিম ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ ইসলামের ওপরে আত্মমর্যাদাবোধের সাক্ষ্য দেয়। তাই তারা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের বইয়ে এসব মিথ্যাকে লিপিবদ্ধ করে। যেমন, ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ফরিদ বেক আল-মোহামি তার বই *আদদাওলাতুল উলিয়াতুল উসমানিয়্যাহ* তে লিখেছেন। ড. আলি হুসুন তার গ্রন্থ *তারিখু দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ* তে লিখেছেন। ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ কুরদ তার গ্রন্থ *খুতাতুশ শামে* লিখেছেন। ড. উমর আবদুল আজিজ তার গ্রন্থ *মুহাজারাতুন ফি তারিখিশ শুয়ুবিল ইসলামিয়্যাহ* তে লিখেছেন। ড. আবদুল করিম *গারাবিয়্যাহ আল-আরবু ওয়াল আতরাক* গ্রন্থে লিখেছেন।

বাস্তবতা হলো, তারা যে জরিবাতুল গিলমান এবং খ্রিষ্টান শহরের এক পঞ্চমাংশ শিশুকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা লিখেছে, এ সম্পর্কে মুসতাশরিক অর্থাৎ প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থ ছাড়া তাদের আর কোনো দলিল নেই। যেমন জব, খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ সোমোফিল, অথবা ব্রুকলিম্যান-এর গ্রন্থসমূহ। আর ইসলামি ইতিহাসের ব্যাপারে তাদের গ্রন্থ এবং তাদের উদ্দেশ্যের ওপরে কখনোই ভরসা করা যায় না।

নিশ্চয় যাদেরকে জিহাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তারা কেউ খ্রিষ্টান ছিল না। তারা ছিল মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান। যারা খ্রিষ্টানদের থেকে সরে এসে ইসলামের সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা এবং আনুগত্যেই এসেছে, জোরপূর্বকভাবে নয়। তারা তাদের সন্তানদেরকে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিত, যেন তাদের ইসলামি তালিম-তরবিয়ত পরিপূর্ণ হয়। আর বাকি যে সমস্ত এতিম এবং শরণার্থী শিশুরা থাকত, উসমানি সাম্রাজ্য তাদেরও লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেছিল।

উরখান ইবনে উসমান যে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদল গঠন করা, যারা যুদ্ধকালীন এবং অন্য সময়ে সমানভাবে সদা প্রস্তুত থাকবে। তিনি এই সৈন্যদল গঠন করেছিলেন তার পারিবারিক অশ্বারোহী এবং সে সমস্ত মুজাহিদগণের সমন্বয়ে—যারা জিহাদের আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিতেন। তাদের সাথে ছিল রোমের সে সকল নেতৃবৃন্দ এবং সেনারা—যাদের অন্তরে ইসলামের সৌন্দর্য প্রবেশ করেছিল। এই সৈন্যদল গঠনের সাথে সাথেই উরখান হাজি 'বাকতাশ' নামের একজন বড় আলেমের কাছে যান এবং তাকে বলেন, তিনি যেন এই সৈন্যদলের জন্য কল্যাণের দোয়া করেন। আলেম হাজি বাকতাশ তাদের সঙ্গে উত্তমরূপে সাক্ষাৎ করেন। একজন সৈন্যের মাথায় হাত রেখে তাদের জন্য দোয়া করেন। যেন তাদের চেহারাগুলো বিজয়ের রঙে শুভ্র থাকে। তাদের তরবারিগুলো হয় ক্ষুরধার, ধারালো। আল্লাহর রাস্তায় তাদের প্রত্যেক যুদ্ধে যেন আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন। তারপর তিনি সুলতান উরখানের দিকে মনোযোগী হয়ে বলেন, আপনি কি এই সেনাবাহিনীর কোনো নাম রেখেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আলেম

বললেন, তাহলে এই সৈন্যদলের নাম হবে, 'يني جرى' আরেক উচ্চারণে, 'تشرى يني' অর্থাৎ 'আল-জাইশুল জাদিদ' তথা নতুন সেনাবাহিনী।

আল-জাইশুল জাদিদের পতাকা ছিল লাল রঙয়ের। যার মধ্যভাগে ছিল চাঁদ। চাঁদের নিচে ছিল একটি তরবারি। যার মধ্যে লেখা ছিল 'জুলফিকার'। উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারির নামের বরকত লাভ।[৬৬]

উরখানের ভাই আলাউদ্দিন বিন উসমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তিনি শরিয়তের আলেম ছিলেন এবং দুনিয়াত্যাগী সঠিকপন্থার সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৬৭]

জিহাদের অনুসারী এবং বাইজেন্টাইনদের বিরোধ বেড়ে যাওয়ার পর উরখান তার আল-জাইশুল জাদিদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হন। তাই তিনি কিছু তুর্কি যুবক নির্বাচিত করেন। কিছু বাইজেন্টাইন যুবক নির্বাচিত করেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের ইসলাম পাকাপোক্ত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে মূল সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করেন এবং তাদেরকে ইসলামি জিহাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্বারোপ করেন। এভাবে তাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। একসময় আল্লাহর রাস্তায় হাজার হাজার মুজাহিদ প্রস্তুত হয়ে যায়।

উরখান এবং আলাউদ্দিন দুজনেই আল-জাইশুল জাদিদের গঠনকে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। ইসলামের প্রচারের লক্ষ্যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদে এবং তাদের অধীন এলাকার বিস্তৃতিতে এটিই হবে প্রধানতম উপকরণ। এর মাধ্যমে যে সমস্ত বাইজেন্টাইনরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ইসলামি জিহাদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের অন্তরে ইসলামের নিয়মকানুন গেঁথে নেওয়ার পর তাদের দ্বারাও ইসলাম প্রচার করানো যাবে।

সারকথা হলো, সুলতান উরখান কোনো খ্রিষ্টান শিশুকে তার পিতৃগৃহ থেকে ছিনিয়ে আনেননি। কোনো খ্রিষ্টান সন্তানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। ব্রুকলিম্যান, জব, জিওনাজ প্রমুখ ব্যক্তিরা যা ধারণা করেছে তা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য। আমাদের ইসলামি ইতিহাস থেকে এগুলোর চিহ্ন মুছে ফেলা উচিত।[৬৮]

প্রত্যেক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মুসলিম বিশেষভাবে আলেম-উলামা, ইতিহাসবিদ, শিক্ষক, আলোচক এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামি জ্ঞানের দাবি হলো, উসমানিদের নামের সাথে যুক্ত এই মিথ্যা এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলোকে মুছে দেওয়া। অবস্থা এমন হয়ে গেছে, যেন এগুলো আসলেই বাস্তব। তার ব্যাপারে কোনো তর্ক-বিতর্ক, তথ্যসূত্র এবং আলাপ-সালাপ গ্রহণ করা যাবে না।

[৬৬] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১৪৭।
[৬৭] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১৪৪।
[৬৮] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১৫৫।

দুই. উরখানের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি

উরখানের যুদ্ধগুলো ছিল রোমকে উদ্দেশ্য করে। যে বছর তাদের একজন শাসক 'কুরাহসি' মারা যায় সে বছরে এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। (৭৩৬ হিজরি-১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)। সে ছিল ওই সমস্ত শাসকদের একজন, রোমের হাতে সালজুকদের রাজত্বের ভাঙনের ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা ছিল। তার মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে বিবাদে লিপ্ত হয়। রাজত্ব দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। উরখান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের বিবাদে অনুপ্রবেশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের রাজত্বের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হন। উদীয়মান উসমানি সাম্রাজ্যের অন্যতম লক্ষ্য ছিল—এশিয়া মাইনর অঞ্চলে রোমের দখল করা সালজুকীয় রাজত্বের অধিপতি হওয়া।[৬৯] তাদের অধীন সমস্ত অঞ্চলের মালিক হওয়া। এ জন্য তাদের মাঝে এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যের মাঝে লড়াই চলতেই থাকে। এরপর সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের যুগ আসে আর পুরো এশিয়া মাইনর অঞ্চল তার সামনে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য হয়।

উরখান তার সাম্রাজ্যের স্তম্ভকে মজবুত করা, বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী এবং আবাদমূলক কার্যক্রম, প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। সেবাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। এর সাথে সাথে বহু মসজিদ এবং বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। সেগুলোর তত্ত্বাবধানে রেখেছেন আলেম এবং শিক্ষকগণকে। তারা সাম্রাজ্যে অত্যন্ত সম্মানিত বলে বিবেচিত হতেন। প্রত্যেকটি গ্রামেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যাতে নাহু-সরফ, তারকিবে লুগাওয়ি অর্থাৎ ভাষাগত গঠনপ্রণালি, মানতেক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, মিথলজি, ফিকহুল লুগাত শাস্ত্র[৭০] ইলমুল বাদি ও বালাগাত তথা অলংকারশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা শেখানো হতো।[৭১]

আর আবশ্যিকভাবে ছিল হিফজুল কুরআন এবং কুরআনের যাবতীয় জ্ঞানের শিক্ষা, সুন্নাহ, ফিকহ তথা মাসআলা এবং আকাইদ তথা আকিদা-বিশ্বাসের শিক্ষা।

সুলতান উরখান কুরাহ সির রাজত্ব অধীন করে বিশ বছর কোনো যুদ্ধ না করেই কাটিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি শহরের আইনকানুন গঠন এবং সৈন্যব্যবস্থা আরও দৃঢ় করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেন। মসজিদ নির্মাণ করে তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সাধারণদের জন্য ব্যাপকভাবে সরকারি সুবিধা প্রদান করেন, যা উরখানের মহত্ত্ব এবং তাকওয়ার, তার বিচক্ষণতা

[৬৯] এখানে সালজুকীয় রাজত্ব বলতে বোঝানো হচ্ছে সেইসব এলাকাকে, রোম সালজুক শাসকদের থেকে যেসব এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল।—সম্পাদক
[৭০] ফিকহুল লুগাত বলতে বোঝানো হয়, একটি ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণের নানান যৌক্তিক ও দার্শনিক দিক নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণাকে।—সম্পাদক
[৭১] *উসুলুত তারিখিল উসমানি, মুহাম্মদ আবদুর রহিম,* পৃষ্ঠা : ৪০।

এবং দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করে। কেননা, উরখান রাজত্ব বিস্তৃতির জন্য একের পর এক যুদ্ধ করেননি। তিনি যে সমস্ত এলাকা অধীন করেছেন তাতে তার রাজত্বকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক নতুন অধীন এলাকাকে তিনি শহুরে ব্যবস্থাপনা, সামরিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষা-সভ্যতায় উন্নত করতে চেয়েছেন। তাই তার সাম্রাজ্যের অণু পরিমাণ অংশকেও পৃথক করা সম্ভব হয়নি। এর ফলাফল ছিল তার সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর অঞ্চলে একটি সুসংহত এবং দৃষ্টান্তমূলক রাজত্বে পরিণত হয়।

এতে করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, সুসভ্যতার বিকাশ এবং বিভিন্ন অঞ্চল আবাদে উরখানের পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে উরখান তার রাজত্বের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মজবুত করেন অপরদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তখন আমব্রাতুর (কুন্তাকুরিনুস) সুলতান উরখানের কাছে তার বিরোধীদের মোকাবেলায় সাহায্য কামনা করেন। তাই উরখান ইউরোপ অঞ্চলে উসমানিদের ভিত মজবুত করতে উসমানি সৈন্যশক্তি প্রেরণ করেন। ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তুরাক্কিয়া অঞ্চলে ভূমিকম্প ঘটে। এতে গালিয়ুবির সীমান্ত ধ্বসে গেলে তার অধিবাসীরা সেখান থেকে সরে যায়। ফলে উসমানিদের জন্য তাতে প্রবেশ করা সহজ হয়ে যায়। উরখানের বাহিনীকে প্রতিহত করার আগেই আল্লাহর সাহায্যে তার বাহিনীর সামনে শহরের সদর দরজা খুলে যায়। গালিয়ুবি হয়ে যায় ইউরোপ অঞ্চলে উসমানিদের অধিকৃত প্রথম অঞ্চল। এখান থেকেই প্রথম দিকের অভিযানগুলো শুরু হয়, যা শেষে বলকান অঞ্চলকে অধিকৃত করার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম বালয়ুলুজিস যখন একক রাজত্ব পরিচালনা করেন, তখন ইউরোপ অঞ্চলে উরখানের প্রতিটি বিজিত এলাকা সুগঠিত হয়। এভাবে সেখানকার শাসকের মোকাবিলায় কুসতানতিনিয়ায় খাদ্যদ্রব্য এবং সাহায্য পৌঁছানো সহজ হয়ে যায়। সে অঞ্চলে উরখান ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক মুসলিমগোত্র প্রেরণ করেছিলেন। আর ইউরোপ অঞ্চলে উসমানিদের এলাকায় খ্রিষ্টানদের বসবাস নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।[৭২]

তিন. যে সমস্ত উপকরণ সুলতান উরখানকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাহায্য করেছিল

১) এই মৌলিক নীতিমালার আলোকে উরখান সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তার পিতা উসমান থেকে তার উপকার লাভ এবং মৌলিক ও নৈতিক যোগ্যতা লাভ—যা তাদেরকে বাইজেন্টাইন আনাতোলিয়া শহর বিজয়ে এবং সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছে। রাজত্বের প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং সীমানার প্রসারণে উরখান তার যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলোর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উসমানি সাম্রাজ্য

[৭২] *উসুলুত তারিখিল উসমানি,* পৃষ্ঠা : ৪৭।

সমুদ্র অতিক্রম করে গালিয়ুবি অধিকৃত করার পরেই খ্রিষ্টানরা উসমানিদের কার্যক্রম সম্পর্কে টের পায়।

২) উসমানিরা যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে আলোচিত ছিল। তারা একই কাতারে, একই লক্ষ্যে, একই ধর্মমত মেনে লড়াই করত, যা সমাপ্ত হয়েছে তাদের মাঝে এবং বলকান উপত্যাকার মাঝে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

৩) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অবসাদের গভীরে তলিয়ে যাওয়া। তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে স্পর্শ করেছিল রাজনৈতিক বিভক্তি এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অবনতি। তাই উসমানিদের জন্য তাদের সাম্রাজ্যে এই অঞ্চলকে যুক্ত করে নেওয়া সহজ ছিল।

৪) খ্রিষ্টানদের দুর্বল অবস্থা, যা মূলত ঘটেছিল বাইজেন্টাইন, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও হাঙ্গেরির শাসকদের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকায়। এ জন্য অধিকাংশ অঞ্চলে রাজনৈতিক এবং সামরিক পদক্ষেপগ্রহণে বিঘ্ন ঘটে। উসমানিদের বিপরীত দিকে তাদের অবস্থানের কারণে।

৫) রোম এবং কুসতানতিনিয়ার মাঝে ধর্মীয় বিরোধ। অর্থাৎ ক্যাথলিক এবং অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের মাঝে বিরোধ, যা স্থায়ী হয়েছিল এবং উভয়দলের শিকড়ে ক্ষতির বিরাট চিহ্ন গেঁথে দিয়েছিল।

৬) ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি নতুন সামরিক শৃঙ্খলাবিধি এবং তাদের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য এবং এ ব্যাপারে উসমানিদের মধ্যকার সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতাদেরকে এর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করা।

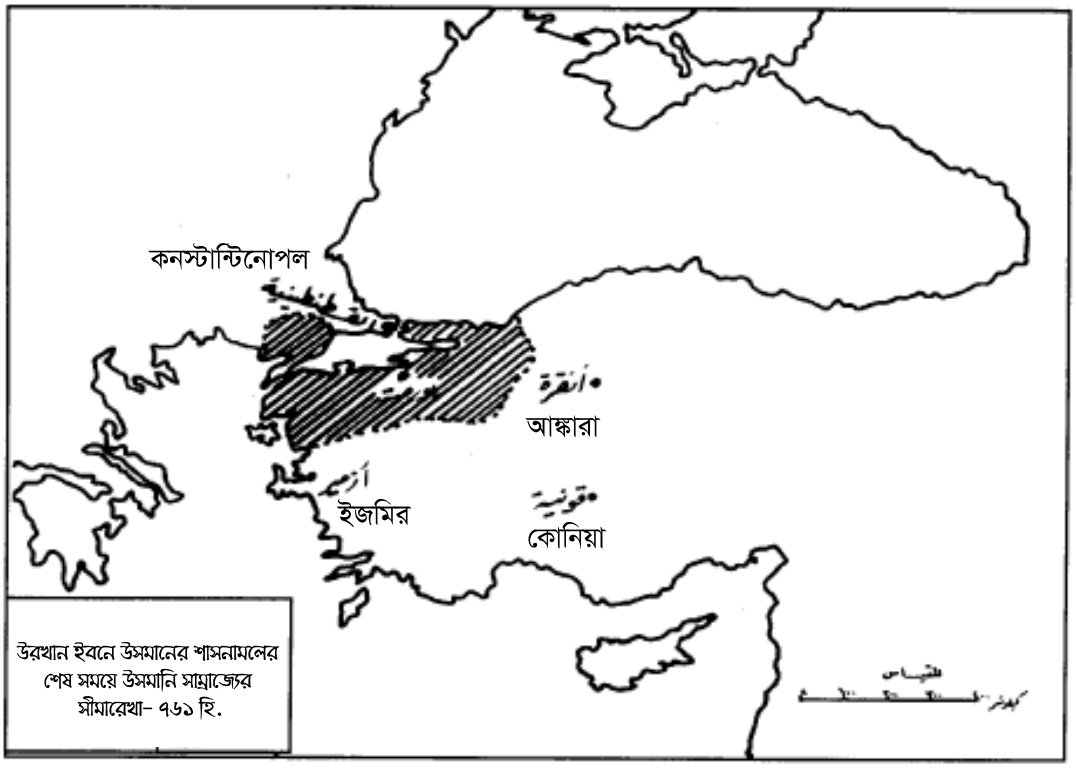

উরখান ইবনে উসমানের শাসনামলের শেষ সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সীমারেখা- ৭৬১ হি.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম মুরাদ

[৭৬১-৭৯১হিজরি/১৩৬০-১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ]

সুলতান প্রথম মুরাদ ছিলেন একজন বীর, মুজাহিদ, সম্মানিত এবং ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি নিয়ম-শৃঙ্খলা ভালোবাসতেন এবং তা আঁকড়ে ধরে রাখতেন। তার প্রজা এবং সৈন্যদের প্রতি ইনসাফ করতেন। যুদ্ধের প্রতি এবং মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তার পাশে ছিল বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ এবং অভিজ্ঞ সেনাধক্ষ্যগণ। তাদের মাধ্যমে তিনি মজলিসে শুরা গঠন করেছিলেন। একই সময়ে তিনি ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তৃত করেছেন।

ইউরোপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন এলাকায় উসমানি সৈন্যরা আক্রমণ করে। ৭৬২ হিজরি মোতাবেক ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে তারা আদ্রিয়ানোপল দখল করে। বলকান অঞ্চলের জন্য এ শহরটি কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কুসতানতিনিয়ার পর সেটি ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। ৭৬৮ সাল থেকে এ শহরটিকেই সুলতান মুরাদ উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী বানিয়ে নেন। এর ফলে রাজধানী ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আদ্রিয়ানোপল হয়ে যায় মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানী স্থানান্তরের দ্বারা সুলতান মুরাদের উদ্দেশ্যগুলো ছিল—

১. যুদ্ধকবলিত আদ্রিয়ানোপলের প্রশাসনিকব্যবস্থা জোরদার করা এবং অন্যান্য যুদ্ধের সম্ভাব্য অঞ্চলের সাথে তার নৈকট্য।

২. ইউরোপিয় অঞ্চল অধিকরণে সুলতান মুরাদের আগ্রহ। যে এলাকায় তাদের জিহাদের দামামা পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাদের পায়ের তলের মাটি শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

৩. এই রাজধানীতে সুলতান মুরাদ সাম্রাজ্য শক্তিশালীকরণের সকল উপাদান এবং প্রশাসনিক নিয়মনীতি একত্র করেছিলেন। ফলে এখানে রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনী,

আইনবিশেষজ্ঞগণ এবং ধর্মীয় আলেমগণ স্থির হয়ে যান। এখানেই শাসকদের প্রাসাদসমূহ স্থাপন করা হয়। শহরের মাদরাসাগুলোকে সংস্কার করা হয় এবং সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামরিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়।

আদ্রিয়ানোপলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সভ্যতা-শিষ্টাচার এবং ধর্মীয় অবস্থা এভাবেই অক্ষত ছিল। এরই মাঝে ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে উসমানিরা কুসতানতিনিয়া বিজয়ে সক্ষম হয়। তখন কুসতানতিনিয়া তাদের সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়।[৭৩]

সুলতান মুরাদের সময়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

এক. মুরাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের মিত্রতা

সুলতান মুরাদ ইউরোপে তার জিহাদ, দাওয়াত এবং বিজয়ের মিশন অব্যহত রেখেছিলেন। তার সেনাবাহিনী মাকদুনিয়া বিজয় করে ফেলে। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন থেকে চক্রান্ত হচ্ছিল। ফলে ইউরোপ এবং বলকানের ক্রুসেডাররা তার বিরুদ্ধে একত্র হয়। তারা বুলগেরিয়া, সার্বিয়া এবং হাঙ্গেরীর ক্রুসেডারদেরকেও নিজেদের সঙ্গে নিয়ে নেয়। তাদের এই মিত্রতার সময়ে উসমানিরা তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ষাটহাজারের একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়। যাদের নেতৃত্বে ছিল 'লালা শাহিন' নামে একজন সেনাপতি। মিত্রশক্তির তুলনায় তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল কম। মারতিজা নদীর তীরে তাসিরমিন নামক এলাকার নিকটে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেখানে মারুয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা পরাজিত হয়। সার্বিয়ার দুই সেনাপতি পলায়ন করে; কিন্তু মারতিজা নদীর গভীরে তাদের সলিল সমাধি হয়। হাঙ্গেরীয়ান সেনাপতি আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এ সময়ে সুলতান মুরাদ মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি শহর জয় করেন। তারপর তিনি বিজিত শহর এবং অঞ্চলসমূহে শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা তৈরির জন্য তার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু রাজধানীতে ফিরে আসেন। এমনটিই একজন বিচক্ষণ শাসকের গুণ।[৭৪]

মারতিজা নদীর তীরে উসমানিদের বিজয়লাভের উল্লেখযোগ্য ফলাফলসমূহ

১. এই বিজয়ের মাধ্যমে তোরাকিয়া এবং মাকদুনিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের অধীন হয়ে যায়। তাদের রাজত্বের সীমানা পৌঁছে যায় বুলগেরিয়ার উত্তরপ্রান্ত এবং সার্বিয়ার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত।

---

[৭৩] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফি তারিখিল ইসলামিল হাদিস,* ড. ইসমাইল আহমদ, পৃষ্ঠা : ৩৮।
[৭৪] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাতিল উলইয়া,* পৃষ্ঠা : ১৩১।

২. শীতকালে গাছ থেকে পাতা যেমন ঝরে পড়ে, বাইজেন্টাইন, বুলগেরিয়া, সার্বিয়ার এলাকাগুলো সেভাবেই ক্রমাগত মুসলিমদের করতলে আসতে থাকে।[৭৫]

উসমানি সাম্রাজ্য এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রথম সন্ধিচুক্তি

উসমানি সাম্রাজ্যের বাহু যখন প্রবল শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন তার আশপাশের এলাকার শাসকরা ভীত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে তাদের মধ্য হতে যারা শক্তিমত্তার দিক দিয়ে দুর্বল তারা। তাই রাজুজা[৭৬]রাষ্ট্র এগিয়ে আসে। তারা সুলতান মুরাদের কাছে দূত প্রেরণ করেন, যেন তিনি তাদের সাথে ব্যবসায়িক এবং সম্প্রীতি চুক্তি করেন। তারা বাৎসরিক ৫০০ দোকা স্বর্ণের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করেন। উসমানি সাম্রাজ্যের এবং খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের মাঝে এটিই ছিল প্রথম কোনো সন্ধিচুক্তি।

কসোভোর যুদ্ধ

সুলতান মুরাদ বলকান অঞ্চল অধিকৃত করার প্রতি নিজ ইচ্ছা থেকেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। তার সেনাপতিদেরও একই অভিপ্রায় ছিল, যা সার্বীয়দের উত্তেজিত করেছিল। তাই তারা সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একাধিকবার বলকান এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উসমানি সৈন্যদের ওপর আক্রমণের দুঃসাহস করে; কিন্তু উসমানিদের ওপরে আল্লাহর সাহায্য আছে বলে একটি কথা আছে। এ কথার বাস্তব প্রতিফলনের ফলে তারা বারবার ব্যর্থ হয়। তাই সার্বিয়া, বসনিয়া, বুলগেরিয়ানরা সুলতান মুরাদের ওপর আক্রমণের জন্য একটি শক্তিশালী ইউরোপীয় ক্রুসেডার বাহিনী গঠন করে। এদিকে সুলতান একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে বলকানের কুসুফা এলাকা পর্যন্ত বিজয় করে ফেলেছিলেন। এ যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুলতান মুরাদের উজির যিনি সবসময় তার সাথে কুরআন নিয়ে ঘুরতেন, তিনি একবার অনিচ্ছাকৃতভাবেই কুরআন খুলে ফেলেন। তখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় কুরআনের এই আয়াতের ওপর—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ـ

{হে নবি, আপনি মুমিনগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। আপনাদের যদি বিশজন ধৈর্যশীল সৈন্যও হয়, তাহলে তারা দুইশজনকে পরাজিত করবে। আর যদি সৈন্যসংখ্যা একশত হয়, তাহলে তারা একহাজার কাফেরকে পরাজিত করবে। কেননা, তারা নির্বোধ জাতি।} [সুরা আনফাল, আয়াত : ৬৫]

[৭৫] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফি তারিখিল ইসলামিল হাদিস,* ড. ইসমাইল আহমদ, পৃষ্ঠা : ৩৭।
[৭৬] ইদরিয়াতিকী সমুদ্র তীরবর্তী।

তিনি এই আয়াত থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করেন। অন্যান্য মুসলিমরাও তার সাথে সুসংবাদ গ্রহণ করেন। এই ঘটনার স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই দুই দলের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে, লড়াই জমে যায়। শেষপর্যন্ত মুসলিমদের নিরংকুশ বিজয়লাভের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৭৭]

দুই. সুলতান মুরাদের শাহাদাতবরণ

কসোভোর যুদ্ধ শেষে সুলতান মুরাদ যুদ্ধপ্রান্তে নিহত মুসলিমদের কাতারে হেঁটে হেঁটে খোঁজ নিচ্ছিলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করছিলেন। এভাবে তিনি আহতদেরও খোঁজ নিতেন। এ সময় এক সার্বীয় সৈন্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। সে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি ছিল। সে সুলতানের দিকে ছুটতে শুরু করলে প্রহরীরা তাকে ধরে ফেলে; কিন্তু সে সুলতানের সাথে দেখা করার এবং ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষ ব্যক্ত করে। ফলে সুলতান প্রহরীদেরকে তাকে ছেড়ে দিতে বলেন। একপর্যায়ে সে সুলতানের হাতে চুমো দিতে চায়। এরপর সুযোগ বুঝে দ্রুততার সাথে বিষাক্ত খঞ্জর বের করে সুলতানকে আঘাত করে। এ আঘাতে ৭৯১ হিজরির ১৫ শাবান সুলতান মুরাদ (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) শাহাদাতবরণ করেন।[৭৮]

সুলতান মুরাদের শেষ কথাগুলো

আমার চূড়ান্ত যাত্রার সময়ে আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ জানেন। অভাবীর দোয়া কবুল করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। শোকর এবং প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। আমি আমার জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। আমি ইসলামের সৈন্যদলের সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি। তোমরা আমার ছেলে বায়েজিদকে অনুসরণ করবে। বন্দিদেরকে কষ্ট ও শাস্তি দেবে না। তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে না। এই সময় থেকে আমি তোমাদের এবং আমাদের বিরাট বিজয়ী সৈন্যদলকে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় সোপর্দ করে যাচ্ছি। তিনিই আমাদের সাম্রাজ্যকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন।[৭৯]

এই মহান সুলতান ৬৫ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন।

কসোভোর যুদ্ধের পূর্বে সুলতান মুরাদের দোয়া

সুলতান মুরাদ জানতেন তিনি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছেন এবং সাহায্য তার কাছ থেকেই আসবে। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পরিমাণে দোয়া করতেন।

[৭৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. সালিম রশিদি, পৃষ্ঠা : ৩০। আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর, পৃষ্ঠা : ৩৮৯।
[৭৮] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান লিলকিরমানি,* পৃষ্ঠা : ১৬।
[৭৯] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৯১।

তার কাছে অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করতেন এবং তার ওপর ভরসা করতেন। তার একনিষ্ঠ দোয়া থেকে আমরা জানতে পারি, সুলতান মুরাদ তার প্রভুর পরিচয় সম্পর্কে জেনেছিলেন এবং উবুদিয়্যাতের আসল অর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলতান মুরাদ তার প্রভুর কাছে মুনাজাতে বলতেন—'হে আল্লাহ, হে দয়ালু, আপনি এবার আপনার এই মুখাপেক্ষী বান্দার দোয়া কবুল করুন। আমাদের ওপর আসমানকে সাহায্যরূপে বর্ষণ করুন। অত্যাচারের মেঘমালাকে দূর করে দিন, যাতে আমরা আমাদের শত্রুদের দেখতে পারি। আর আমরা কেবল আপনার গোনাহগার বান্দা। আপনি দাতা। আমরা আপনার মুখাপেক্ষী বান্দা। আমি আপনার রোনাজারিকারী বান্দা। আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অদৃশ্য, গোপন এবং অন্তর যা গোপন রাখে সব জানেন। আমার নিজের কোনো স্বার্থ, উপকার এবং কোনো সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে দোয়া করি না। আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টি তালাশ করি। হে প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর মাঝে বিদ্যমান সত্তা,[৮০] আমি আপনার কাছে আমার প্রাণ উৎসর্গ করছি। আমার আকাঙ্ক্ষা কবুল করুন এবং মুসলিমদেরকে শত্রুর সামনে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। হে আল্লাহ, হে সর্বাপেক্ষা দয়ালু, আমাকে তাদের মৃত্যুর কারণ বানাবেন না, বরং তাদেরকে আমার সাহায্যকারী বানান। আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ করছি হে প্রভু। আমি সবসময় ইসলামের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শাহাদাত কামনা করি। আমাকে তাদের কষ্ট যেন দেখতে না হয়। হে প্রভু, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং এবারের জন্য আমার দোয়া কবুল করুন, যেন আমি আপনার রাহে এবং আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করতে পারি।'[৮১]

আরেক বর্ণনায় আছে—'ইয়া ইলাহি, আমি আপনার সম্মান এবং বড়ত্বের শপথ করে বলছি, আমি আমার জিহাদের মাধ্যমে এই অস্থায়ী দুনিয়া কামনা করি না। আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই। আপনার সন্তুষ্টি ব্যতীত কোনো বস্তুই কাজের নয়। আমি আপনার সম্মান এবং বড়ত্বের শপথ করে বলছি, আমি আপনার পথেই আছি। তাই আপনার রাস্তায় মৃত্যু দিয়ে আমার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিন।'[৮২]

আরেক বর্ণনায় আছে—'হে আমার প্রভু, হে মাওলা, আপনি আমার দোয়া এবং রোনাজারি কবুল করে নিন। আমাদের ওপর আপনার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন, যা আমাদের আশপাশ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের ধুলোবালিকে নির্বাপিত করে দেবে। আমাদের আশপাশের অন্ধকারকে দূরীভূত করে আমাদেরকে আলো দ্বারা বেষ্টিত করুন, যাতে আমরা আমাদের শত্রুর অবস্থান দেখতে পারি এবং আপনার সম্মানিত ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সাথে লড়াই করতে পারি।

[৮০] অর্থাৎ তিনি তার জ্ঞানের মাধ্যমে সকল বিদ্যমান বস্তুর মাঝে বিদ্যমান।
[৮১] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৯০।
[৮২] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১৯০।

ইয়া ইলাহি, ইয়া মাওলা, সকল শক্তি এবং রাজত্ব আপনারই। আপনার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তাকে তা দান করেন। আমি আপনার দুর্বল, মুখাপেক্ষী বান্দা। আপনি আমার গোপন, প্রকাশ্য সব জানেন। আমি আপনার সম্মান এবং বড়ত্বের শপথ করে বলছি, আমি আমার জিহাদের মাধ্যমে এই অস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষমতা চাই না। আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টি চাই এবং আপনার সন্তুষ্টি কোনো বস্তুই কাজের নয়।

হে প্রভু, মাওলা আমার, আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টির পুণ্য কামনা করি। আপনি আমাকে সকল মুসলিমদের জন্য উৎসর্গ হিসেবে কবুল করে নিন। আপনার সঠিক পথ ব্যতীত অন্য পথে কোনো মুসলমানের ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ আমাকে বানাবেন না।

হে দয়াময়, যদি আমার শাহাদাতের মধ্যে মুসলিম সেনাদের মুক্তি এবং বিজয় থাকে, তাহলে আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাত থেকে বঞ্চিত করবেন না, যেন আমি আপনার প্রতিবেশী হওয়ার পুরস্কার লাভ করতে পারি। আপনার প্রতিবেশী হওয়া কতইনা উত্তম!

ইয়া ইলাহি, ইয়া মাওলা, আপনার রাস্তায় জিহাদের দিকে পথপ্রদর্শন করার মাধ্যমে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। আপনার রাস্তায় মৃত্যু দান করে আমার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিন।'[৮৩]

এই একনিষ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে জানা যায়, সুলতান মুরাদ আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করতে পেরেছিলেন। আরও জানতে পারি, তিনি কালিমায়ে তাওহিদের শর্তাবলি বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি তার জীবন এবং আচার-ব্যবহারে কালিমার শর্তসমূহের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।

যেভাবে তিনি তা করেছিলেন

- সত্যিকার অর্থে কালিমার জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। তার আদেশ, নিষেধ এবং মূর্খতার প্রতিবন্ধক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ـ

{জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।} [সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৯।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ـ

{তবে যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং তারা জানে।} [সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৮৬]

[৮৩] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৪০,৪১।

অর্থাৎ তারা তাদের অন্তর দিয়ে এবং মুখে যা বলে তার মাধ্যমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা সম্পর্কে জানে।

▪ সন্দেহের প্রতিবন্ধক বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন তিনি। সুলতান মুরাদ কালিমার সারমর্মের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। ইমানের ক্ষেত্রে কেবল ইলমে ইয়াকিন অর্থাৎ বিশ্বাসের সাথে জানাই কাজে আসে । ইলমে যন্ন্ তথা ধারণার ভিত্তিতে জানা কোনো কাজে আসে না।[৮৪] আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجٰهَدُوا بِأَمْوٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ـ

{তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।} [সুরা হুজরাত, আয়াত : ১৫]

▪ অন্তর এবং জবানের মাধ্যমে কালিমার চাহিদাকে কবুল করা। কালিমা যে আদেশ, নিষেধ করে এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলে তিনি তা অনুসরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ

{যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে নিজেকে সমর্পণ করে এবং সৎ থাকে, সে যেন মজবুত রশিকে আঁকড়ে ধরল।} [সুরা লোকমান, আয়াত : ২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ

{অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [সুরা নিসা, আয়াত : ৬৫]

[৮৪] *মায়ারিজুল কুবুল*, ২/৪১৯।

▪ তিনি তার প্রভুর সাথে সত্যবাদী ছিলেন। এমন ইখলাসের অধিকারী ছিলেন যার মাধ্যমে তিনি তার নফসকে শিরক থেকে পবিত্র করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ـ

{তাদেরকে একমাত্র এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।} [সুরা বাইয়িনাহ, আয়াত : ৪]

▪ তিনি তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পথে জান ও মাল খরচ করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ ـ

{মানুষের মধ্য হতে কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর অন্যান্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে; কিন্তু যারা ইমানদার তাদের আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা অন্যদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো আজাব প্রত্যক্ষ করত, তাহলে উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর আজাবই সবচেয়ে কঠিনতম।} [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ـ

{হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং

কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৫৪]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, 'যাদের মাঝে তিনটি গুণ থাকবে তারা এর মাধ্যমে ইমানের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে। যথা—১.তার কাছে আল্লাহ এবং তার রাসুল সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হবে। ২. একজন মানুষ অপরকে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই ভালোবাসবে। ৩. আর কুফরি থেকে আল্লাহ মুক্তি দেওয়ার পর তাতে ফিরে যাওয়াকে সে অপছন্দ করবে, যেভাবে সে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াকে অপছন্দ করে থাকে।'[৮৫]

সুলতান মুরাদ ইমান এবং কালিমায়ে তাওহিদের প্রকৃত অর্থ বুঝেছিলেন এবং তার জীবদ্দশায় তার স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। তাই তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ইমানের সম্মান এবং মর্যাদা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপকারকারী নেই। তিনিই জীবন দেন। তিনিই মৃত্যু দেন। তিনিই সকল ক্ষমতা, রাজত্ব এবং নেতৃত্বের মালিক। এ জন্যই তার অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ছাড়া সকল ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। কোনো সৃষ্টিজীবের সামনে তিনি তার মাথা নত করেননি এবং অনুনয় প্রকাশ করেননি। আল্লাহর বড়ত্ব এবং মহত্ত্ব থেকে নিরাশ হননি। কেননা, তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহর প্রতি ইমানের বদৌলতে তিনি অর্জন করেছিলেন দৃঢ়তা, অগ্রগামিতা, ধৈর্য, অটল থাকা, ভরসা এবং উচ্চ মর্যাদার গুণাবলির বিষয়সমূহ। সবই ছিল আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাই তিনি যে যুদ্ধে অংশ নিতেন তাতে মজবুত পাহাড়ের মতো অটল থাকতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তার জান-মালের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। তাই তিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে কুরবানি করে দেওয়ার জন্য কোনো পরোয়া করেননি।

সুলতান মুরাদ প্রকৃত ইমানের জীবনযাপন করেছিলেন। তাই তিনি ছুটেছেন জিহাদের ময়দানে। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন।

সুলতান মুরাদ প্রায় ত্রিশ বছর অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং দক্ষতার সাথে উসমানি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সমসাময়িক কেউ তার প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদ হাঙ্কু নিদিলাস প্রথম মুরাদ সম্পর্কে বলেন, 'মুরাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। আনাতোলিয়া এবং বলকান ছাড়াও মোট ৩৭টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। সবগুলো থেকে বিজয়ী হয়েই ফিরেছেন। তিনি তার সকল প্রজার সাথে কোমল ব্যবহার করতেন। এ ক্ষেত্রে রক্ত এবং ধর্মের পার্থক্যের বিবেচনা করতেন না।'[৮৬]

[৮৫] *বুখারি শরিফ,* কিতাবুল ইমান, বাবু হালাওয়াতিল ইমান ১/১১, হাদিস নং-১৬।
[৮৬] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ১৯।

ফরাসি ইতিহাসবিদ ক্রিনার্ড তার সম্পর্কে বলেন, 'মুরাদ ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বগণের একজন। ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে দাঁড় করালে তিনি তার সময়ের সকল ইউরোপীয় শাসকদের শীর্ষে থাকবেন'।[৮৭]

সুলতান প্রথম মুরাদ তার পিতার কাছ থেকে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, যা তার পিতার ইনতেকালের সময় ৯৫০০০ বর্গ কিলোমিটারে গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি তার ছেলেকে যখন সাম্রাজ্য অর্পণ করেন তখন তা গিয়ে পৌঁছেছিল ৫লক্ষ বর্গ কিলোমিটারে। মোটকথা, তিনি তার উনত্রিশ বছরের রাজত্বকালে তার পিতা উরখানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত রাজত্বের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি রাজত্ব বিস্তৃত করেছিলেন।[৮৮]

কসোভোর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের ফলে যে উপকার হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

১. বলকান অঞ্চলে ইসলামের প্রসার এবং বহুসংখ্যক প্রবীণ এবং বয়স্ক লোকদের স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ।

২. এ যুদ্ধের ফলে অনেক ইউরোপীয় সাম্রাজ্য উসমানিদের সাথে সম্প্রীতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ জিজিয়া দিয়েছে। আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে উসমানিদের আনুগত্য ঘোষণা করেছে, যাতে উসমানিদের রোষানলে পড়তে না হয় এবং তাদের ক্ষমতার ভয়ে।

৩. এ যুদ্ধের মাধ্যমে উসমানি সালতানাতের আধিপত্য বিস্তৃত হয় হাঙ্গেরী, রোমানিয়া এবং তাদের পার্শ্ববর্তী ইদরিয়াতিকের তিরবর্তী অঞ্চলগুলোতে। এমনকি আলবেনিয়া পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়।[৮৯]

[৮৭] প্রাগুক্ত।
[৮৮] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ২০।
[৮৯] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* ড. আবদুল আজিজ আল-উমরি, পৃষ্ঠা : ৩৮৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম বায়েজিদ

[৭৯১-৮০৫হিজরি/১৩৮৯-১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ]

সুলতান মুরাদের শাহাদাতের পর তার ছেলে বায়েজিদ শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বীর, সম্মানিত ও প্রেমময় ব্যক্তিত্ব। ইসলামি বিজয়যাত্রার প্রতি তার উদ্দীপনা ছিল প্রবল। তাই তিনি সামরিক বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্ব দান করেন। তিনি আনাজুলের খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যকে তার লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। এক বছরের মাঝেই তারা উসমানি সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে যায়। বলকান এবং আনাজুলের এই দুই প্রান্তে বায়েজিদ বিজলীর গতিতে তার অভিযানসমূহ পরিচালনা করেছেন। তাই তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'الصاعقة' অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়।[৯০]

তার কার্যক্রমসমূহ

এক. সার্বিয়ার সাথে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক

উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বলকানে যে মিত্রশক্তি তৈরি হয়েছিল সেখানে সার্বিয়ানদেরও ভূমিকা ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও সুলতান বায়েজিদ তাদের সাথে সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করেন। এর মাধ্যমে সুলতান বায়েজিদের উদ্দেশ্য ছিল, তার সাম্রাজ্য এবং হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের মাঝে সার্বিয়া সাম্রাজ্যকে প্রতিবন্ধকরূপে গ্রহণ করা। তিনি তার সামরিক ব্যবস্থায় একটি মিত্রশক্তির প্রয়োজনবোধ করছিলেন। যেমনটি মধ্য এশিয়ায় তুর্কি ইসলামি সালজুক সালতানাত করেছিল। তাই সুলতান বায়েজিদ কসোভোর যুদ্ধে নিহত সার্বিয়ার রাজা লাজারের দুই ছেলেকে সার্বিয়ার শাসক

[৯০] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিততারিখিল ইসলামিয়্যাতিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৪০।

নিযুক্তকরণে সম্মত হন এবং তাদেরকে সার্বিয়ার রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন, ধর্মমত অনুযায়ী শাসন করতে বলেন। বিনিময়ে তারা সুলতান বায়েজিদের অনুগত হবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে জিজিয়া প্রদান করবে। আর সুলতানের বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযানে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য অংশগ্রহণ করবে।[৯১] এ সময় সুলতান বায়েজিদ লাজার মেয়েকে বিয়ে করেন।

দুই. উসমানি নেতৃত্বের সামনে বুলগেরিয়ার অবনত হওয়া

সার্বিয়ার সাথে বোঝাপড়া শেষে বায়েজিদ ৭৯৭ হিজরি মোতাবেক ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বুলগেরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। তাদের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার অধিবাসীদের মাথা অবনত করে দেন। ফলে বুলগেরিয়া তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। উসমানি সাম্রাজ্যের হাতে বুলগেরিয়ার পতনের মাধ্যমে ইউরোপ অঞ্চল নড়েচড়ে বসে। ইউরোপের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে উসমানি সাম্রাজ্যের ভয়ভীতি। বলকান অঞ্চলে উসমানিদের ওপর হামলা করার জন্য খ্রিষ্টান পরাশক্তি আবার পরিকল্পনা শুরু করে।[৯২]

তিন. উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রুসেডীয় খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যগুলোর এক হওয়া

হাঙ্গেরির রাজা সিজাসমুন্ড এবং পোপ নবম বুনিফাস উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রুসেডীয় খ্রিষ্টান রাজত্বগুলোকে এক হওয়ার আহ্বান জানান। চতুর্দশ শতাব্দীতে উসমানি সাম্রাজ্য যেসব আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল তার মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে বড়। এতে বিপুলসংখ্যক রাজত্ব অংশগ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি তারা অস্ত্র, সৈন্যসামন্ত, এবং ধন-সম্পদের মাধ্যমে সমান ভাগ দিয়ে ভূমিকা রেখেছিল। এ যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সামগ্রিক সৈন্যসংখ্যা পৌঁছে যায় এক লক্ষ বিশ হাজারে, যাতে ছিল আলমেনিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, উত্তরের নিচু ভূমি এবং ইতালীয় কতক সাম্রাজ্যের সৈন্যরা।[৯৩]

৮০০ হিজরি মোতাবেক ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে হাঙ্গেরিতে হামলার পরিকল্পনা শুরু হয়; কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তাদের নেতা ও সেনাপতিরা সিজাসমুন্ডের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। সিজাসমুন্ড প্রথমে উসমানিদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন; কিন্তু তাদের সেনাপতিরা প্রথমে হামলা শুরু করে। তারা দানিয়ুব নদীর

[৯১] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিততারিখিল ইসলামিয়্যাতিল হাদিস,* পৃষ্ঠা :৪১।
[৯২] প্রাগুক্ত।
[৯৩] *তারিখু দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* ড. আলি হুসুন, পৃষ্ঠা : ২৪,২৫।

পাশে হামলায় অবতীর্ণ হয়ে বলকানের দক্ষিণে নিকোবোলিসে গিয়ে অবরোধ করে। আর প্রথম ধাক্কাতেই উসমানি সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়। হঠাৎ করেই সুলতান বায়েজিদ তার সাথে একহাজার সৈন্য নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। আর এতেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। যদিও খ্রিষ্টানদের অনুপাতে তারা অনেক কম; কিন্তু অস্ত্রে এবং মনোবলে ছিল তাদের চেয়ে ঊর্ধ্বে। তারা অধিকাংশ খ্রিষ্টানকেই ভূপতিত করে। তারা পলায়নের পথ ধরতে বাধ্য হয়। তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাদের হত্যা এবং বন্দি করা হয়। উসমানি সাম্রাজ্য নিকোবোলিস যুদ্ধ থেকে বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করে এবং শত্রুদের ঘাঁটির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে।[৯৪] বিজয় এবং সাহায্যের রমরমা অবস্থা দেখে সুলতান বায়েজিদ বলেন, নিশ্চয় অচিরেই ইতালি বিজয় হবে। আর রোমের সাধু পিতরের সমাধিস্থলে তার ঘোড়া যব ভক্ষণ করবে।[৯৫] ফ্রান্সের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দি হন। তাদের মধ্যে কাউন্ট ডি নিফার অন্যতম।

সুলতান বায়েজিদ ফিদয়া গ্রহণ করে সকল বন্দি এবং কাউন্ট ডি নিফারকে মুক্তি দেন। সে শপথ করেছিল, সে কখনো আর উসমানিদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করবে না। তাই সুলতান বায়েজিদ তাকে বলেছিলেন, তোমার এই শপথ অব্যহত না রাখার অনুমতি দিচ্ছি তোমাকে, তুমি চাইলে আমার সাথে যুদ্ধ করতে পার। কারণ, আমার কাছে সমস্ত ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সাথে লড়াই করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছু নেই।[৯৬]

হাঙ্গেরির রাজা সিজাসমুন্ড, যে তার ক্ষমতা এবং সামরিক শক্তির কারণে গর্বের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল সে বলেছিল, আকাশ যদি তার একেবারে উচ্চতায়ও পৌঁছে যায় তাহলে আমরা তাকে আমাদের বর্মগুলো দ্বারা আটকে রাখতে পারব। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়। তার সাথে ছিল ফ্রান্সের সেনাপতি রোডস। যখন তারা পালাতে পালাতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে খ্রিষ্টানদের নৌবহর দেখতে পায়। তারা দ্রুতবেগে পেছনে না তাকিয়েই সেখানকার একটি জাহাজে করে পালিয়ে যায়। নিকোবোলিসের যুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের চোখে হাঙ্গেরিদের মর্যাদার অবস্থান খর্ব হয়। তাদের যে অবস্থান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তা উধাও হয়ে যায়।[৯৭]

সে যুদ্ধে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিরাট সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রভাব সুলতান বায়েজিদ এবং ইসলামি সমাজের ওপর পড়েছিল। তাই সুলতান বায়েজিদ প্রাচ্যের ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোর বড় বড় শাসকদের কাছে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে এই

[৯৪] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিততারিখিল ইসলামিয়্যাতিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৪২।
[৯৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. সালিম আররশীদী, পৃষ্ঠা : ৩৩।
[৯৬] *তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়াতিল উসমানিয়্যাহ,* মুহাম্মদ ফরিদ বেক, পৃষ্ঠা : ১৪৪।
[৯৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. সালিম আর রশিদি, পৃষ্ঠা : ৩৩।

বিরাট সাহায্যের খবর পত্র মারফতে পাঠিয়ে দেন। দূতরা তাদের সাথে খ্রিষ্টান বন্দিদেরকে দূরদূরান্তের মুসলিম শাসকদের জন্য উপহারস্বরূপ এবং সাহায্যের প্রমাণস্বরূপ নিয়ে যায়। সুলতান বায়েজিদ সালজুক সালতানাতের ওপরে তার উত্তরাধিকারীদের দলিলস্বরূপ এবং আনাজুলের সকল প্রান্তে তার কর্তৃত্ব পৌঁছানোর জন্য 'সুলতানে রোম' উপাধি ধারণ করেন। তিনি কায়রোর আব্বাসীয় খলিফার কাছে দূত প্রেরণ করে তার এই উপাধির স্বীকৃতি দিতে বলেছিলেন, যাতে তিনি এর মাধ্যমে তার এবং তার পূর্বপুরুষদের রাজত্বের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে সুলতান বায়েজিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ওপরে বিধানগত এবং প্রথাগতভাবে সমর্থন করেন। এ সময় আব্বাসীয় খলিফার সম্মতির সাথে একমত হন মামলুক সুলতান বারকুক। কারণ, তিনি তৈমুর লংয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য একমাত্র সুলতান বায়েজিদকেই যোগ্য মনে করতেন। তখন তৈমুর লং মামলুক এবং উসমানিদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের খেদমত করার জন্য আনাজুলে হাজার হাজার মুসলিম হিজরত করে। হিজরতকারীরা সৈন্য দ্বারা ভরপুর ছিল। আরও ছিল এমন কিছু লোক যারা ইরাক, ইরান এবং মা-ওরা-উন্নাহার অঞ্চলের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় অবদান রেখেছিলেন। মধ্য এশিয়ায় তৈমুর লং এর আক্রমণের সম্মুখস্থল থেকে তারা কোনো মতে পালিয়ে এসেছিল।[৯৮]

[৯৮] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি,* আহমদ আবদুল হালিম, পৃষ্ঠা : ৫৪-৫৫।

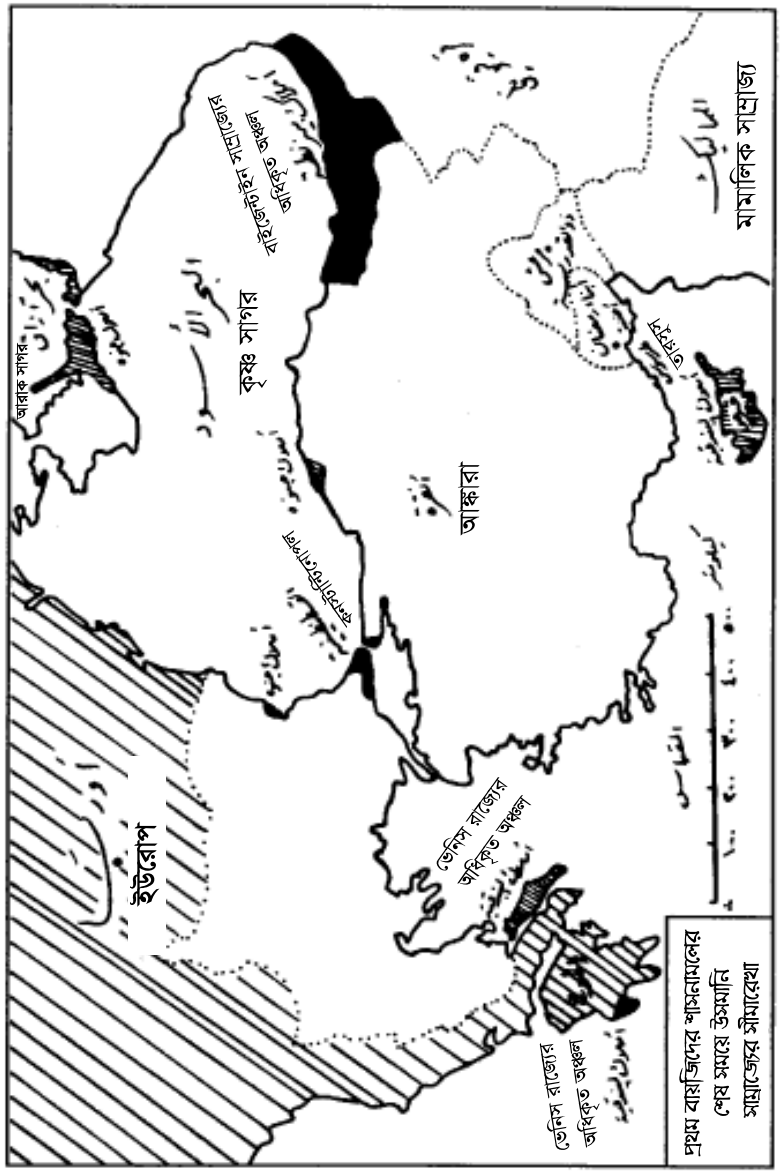

চার . কুসতানতিনিয়া অবরোধ

নিকোবোলিস যুদ্ধের আগে সুলতান বায়েজিদ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর চাপ প্রয়োগে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কুসতানতিনিয়ায় বসবাসকারী মুসলিমদের মাঝে বিচারকার্যের জন্য একজন মুসলিম কাজি নিয়োগে বাধ্য করেছিলেন। এর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী অবরোধ করেন। ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য একটি মুসলিম বিচারসভা, মসজিদ নির্মাণ এবং সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদের জন্য শহরের ভিতরে ৭০০টি গৃহ নির্মাণে সম্মত হন।

এভাবে সুলতান বায়েজিদ তাদের ওপরে কর্তৃত্ব অর্ধেকে নামিয়ে ফেলেন। সেখানে প্রায় ৬০০০ উসমানি সৈন্য মোতায়েনের মাধ্যমে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর আরোপিত জিজিয়ার পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং শহরের বাইরের আঙ্গুর বাগান ও অন্যান্য ফসলের ওপর উসমানি সাম্রাজ্যের কোষাগার নিয়ম জারি করে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মুয়াজ্জিনের আজান চালু হয়।[৯৯]

নিকোবোলিসের যুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের পর বলকান অঞ্চলে মুসলিমদের পায়ের তলের মাটি শক্ত হয়। বলকান অঞ্চলের গোত্রগুলোর মাঝে উসমানি সাম্রাজ্যের ভীতি এবং প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বসনিয়া, বুলগেরিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের সামনে মাথানত করে। উসমানি সৈন্যরা খ্রিষ্টানদের বাকি অমুসলিমসুলভ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া অব্যহত রাখে। সুলতান বায়েজিদ মাওরা উপদ্বীপের শাসকদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন; যারা ক্রুসেডীয় মিত্রশক্তিকে সামরিক সাহায্য করেছিল।[১০০] তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজার ওপরেও শাস্তি আরোপ করেন। কারণ, সুলতান বায়েজিদ তাকে কুসতানতিনিয়া হস্তান্তর করতে বলায় সে এর বিরুদ্ধাচারণ করে। এর বিপরীতে বাইজেন্টাইন শাসক ম্যানুয়েল ইউরোপীয়দের থেকে কোনো সাহায্য পেলেন না। মূলত কুসতানতিনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করা সুলতান বায়েজিদের জিহাদি কার্যক্রমের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য তিনি তার সৈন্যদল নিয়ে বাইজেন্টাইন রাজধানীর ওপর জোরদার অবরোধ স্থাপন করেন এবং তিনি অব্যহতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এমনকি শহর প্রায় পতনের কাছাকাছি চলে এসেছিল। একদিন অথবা তার পরদিনের মাথায় ইউরোপ তাদের শক্তিশালী রাজধানীর পতনের অপেক্ষা করছিল। ঠিক তখনই সুলতান বায়েজিদ তার সাম্রাজ্যে নতুন কিছু সমস্যার ফলে কুসতানতিনিয়া বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসেন।[১০১]

---

[৯৯] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, পৃষ্ঠা : ৫৩।
[১০০] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস*, পৃষ্ঠা : ৪২।
[১০১] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ*, ড. ইসমাইল আহমদ, পৃষ্ঠা : ৪৩।

পাঁচ. তৈমুর লং এবং বায়েজিদের মধ্যকার সংঘর্ষ

তৈমুর লং মা-ওরা-উন্নাহার অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খোরাসান এবং সমরকন্দের সিংহাসনে বসেন। তিনি তার দক্ষ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিশাল একটি অংশে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। এশিয়ায় দিল্লি থেকে নিয়ে দামেশক পর্যন্ত, আরাল সাগর থেকে নিয়ে আরব উপসাগর পর্যন্ত, তার এই বিশাল পরাশক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পারস্য, আর্মেনিয়া, দজলা ও ফোরাতের ঊর্ধ্বাঞ্চল, এবং কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী এলাকাগুলোকে টার্গেট করেন। আর রাশিয়ায় ভলগা, ডন এবং ড্যানিভার নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নেন। তিনি ঘোষণা দেন, তিনি অচিরেই এ অঞ্চলের মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এগুলোকে তার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করবেন। তিনি বারবার একটি কথা আওড়াতেন, (আকাশে যত দিন একজন প্রভু থাকবেন তত দিন জমিনের অধিপতিও একজন হওয়া আবশ্যক)।[১০২] তৈমুর লং ছিলেন একজন বীর, যুদ্ধ প্রতিভাধর এবং রাজনৈতিক দক্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে অনেক তথ্য তালাশ করতেন এবং গোয়েন্দা প্রেরণ করতেন। তারপর ধীরেসুস্থে এবং খুব ভেবেচিন্তে কোনো রকম তড়িঘড়ি না করে সিদ্ধান্ত দিতেন। তার এমন প্রভাব ছিল যে, তার সৈন্যরা যেখানেই থাকত সেখানেই তার আদেশের অনুসরণ করত।

একজন মুসলিম হিসেবে তৈমুর লং আলেম-উলামা এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। বিশেষভাবে যারা নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন তাদের সম্মান করতেন।[১০৩]

তৈমুর লং এবং সুলতান বায়েজিদের মাঝে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কারণের ভূমিকা ছিল তা হলো—

১. ইরাকের শাসকগণের বায়েজিদের কাছে আশ্রয় চাওয়া। যে ইরাক অঞ্চলে তৈমুর লং আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এভাবে এশিয়া মাইনরের কিছু নেতৃবৃন্দ তৈমুর লং এর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। উভয়পক্ষেই আশ্রয়প্রার্থীরা তাদের আশ্রয়দাতাদের অপরপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।

২. খ্রিষ্টান কর্তৃক তৈমুর লংকে বায়েজিদের ওপর আক্রমণের জন্য প্রলুব্ধ করা।

৩. দুই পক্ষের মধ্যে উষ্ণ চিঠির আদানপ্রদান। তৈমুর কর্তৃক প্রেরিত চিঠিতে তৈমুর বায়েজিদকে অপমান করেন। তিনি বায়েজিদকে তার পরিবারের মূলের দিকে

[১০২] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি,* পৃষ্ঠা : ৬৫।
[১০৩] প্রাগুক্ত।

অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে অপমানের চেষ্টা করেন। উসমানি সালতানাত ইসলামের জন্য বিরাট ভূমিকা রেখেছে—এ দিকে লক্ষ্য করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেন। চিঠির শেষে বায়েজিদকে শুধু তুরস্কের শাসক উল্লেখ করে তৈমুর লং তাকে তুচ্ছ করেন। বায়েজিদ তৈমুর লং এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেন তিনি অবশ্যই তিবরিজ এবং তার সালতানাতের দিকে তৈমুর লং-এর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

তৈমুর লং এবং বায়েজিদ উভয়েই তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

ছয়. উসমানি সাম্রাজ্যের বিভক্তি

তৈমুর লং তার সেনাবাহিনী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সিওয়াস অঞ্চলকে টার্গেট করেন। সেখানকার প্রশাসক ছিলেন বায়েজিদের ছেলে আরতুগ্রুল। উভয়পক্ষ ৮০৪ হিজরি মোতাবেক ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে আঙ্কারার নিকটে মুখোমুখি হয়। এ সময় বিরোধীদের মোকাবেলায় বায়েজিদের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার। তৈমুর লং ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে মোঙ্গলীয়রা বিজয়ী হয়। সুলতান বায়েজিদ বন্দি হন এবং এর পরের বছরেই মৃত্যু তাকে চিরতরে মুক্তি দিয়ে দেয়।[১০৪]

এ যুদ্ধে বায়েজিদের পরাজয় ঘটেছিল তার তাড়াহুড়া এবং আগ-বেড়ে আক্রমণ করার কারণে। তিনি ও তার সৈন্যদল যেখানে অবস্থান করেছিলেন সে জায়গাটা উপযোগী ছিল না। যেখানে তার সৈন্যসংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারের বেশি ছিল না সেখানে বিরোধীদের সৈন্যও আশি হাজারের চেয়ে কম ছিল না। বায়েজিদের বহু সৈন্য পানির অভাবে মারা যায়। তখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার সময় ছিল। আঙ্কারায় দু পক্ষের মাঝে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই বায়েজিদের সৈন্যদলে যে সমস্ত তাতারি সৈন্যরা ছিল তারা পলায়ন করে। এ ছাড়া সুলতান বায়েজিদ নিকটবর্তী সময়ে এশিয়া মাইনরের যে সকল এলাকা বিজয় করেন সেখানকার সৈন্যরাও পালিয়ে যায়। তারা গিয়ে তৈমুর লং এর সৈন্যদলের সাথে মিলিত হয়। এরপর উসমানি সুলতান এবং তার সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে পূর্বেকার বীরত্ব এবং মরিয়া হয়ে লড়াই করার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেননি।[১০৫]

পশ্চিমা খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য তৈমুর লং এর এই বিজয়ে আনন্দিত হয়। সুলতান বায়েজিদের পতন এবং তার রাজত্বের বিভক্তিতে তারা আনন্দ প্রকাশ শুরু করে। তারা তৈমুর লং-কে এই বিজয়ের জন্য শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন জানাতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং

[১০৪] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ ফিততারিখিল ইসলামিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ২, ৩।
[১০৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. সালিম আর রশিদি, পৃষ্ঠা : ৩৫।

কাস্টাইলের রাজাকে প্রেরণ করে। ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করে নেয় তারা এখন উসমানি সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত, যারা দীর্ঘদিন তাদেরকে ভুগিয়েছে এবং হুমকির মুখে রেখেছে।[১০৬]

সুলতান বায়েজিদের এ পরাজয়ের পর তৈমুর লং আজনিক, বারুসা প্রভৃতি শহর জয় করেন। এরপর তিনি ইজমিরের সীমান্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করে এই শহরকে সেনাপতি রুডসের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন।[১০৭] এর মাধ্যমে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার কারণে অন্যান্য ইসলামি সাম্রাজ্য দ্বারা যে সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন তা থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। সেন্ট ইয়ুহনাকে হত্যা করার মাধ্যমে তৈমুর লং আনাতোলিয়া অঞ্চলে তার হামলাগুলোর ওপরে জিহাদের মোড়ক লাগানোর চেষ্টা করেন।[১০৮]

এভাবেই তৈমুর লং এশিয়া মাইনরের শাসকদেরকে তাদের রাজত্ব ফিরিয়ে দেন। এরপর বায়েজিদ যে এলাকাগুলো অধীন করেছিলেন সেগুলো স্বাধীন রাজ্য হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দিতে চান। এভাবে তৈমুর বায়েজিদের সিংহাসন নিয়ে লড়াইয়ে মত্ত ছেলেদের মাঝে বিভক্তির বীজ রোপণ করে দেন।[১০৯]

[১০৬] মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, ড. সালিম আর রশিদি, পৃষ্ঠা : ৩৬।
[১০৭] ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি, পৃষ্ঠা : ৫৯।
[১০৮] প্রাগুক্ত।
[১০৯] প্রাগুক্ত।

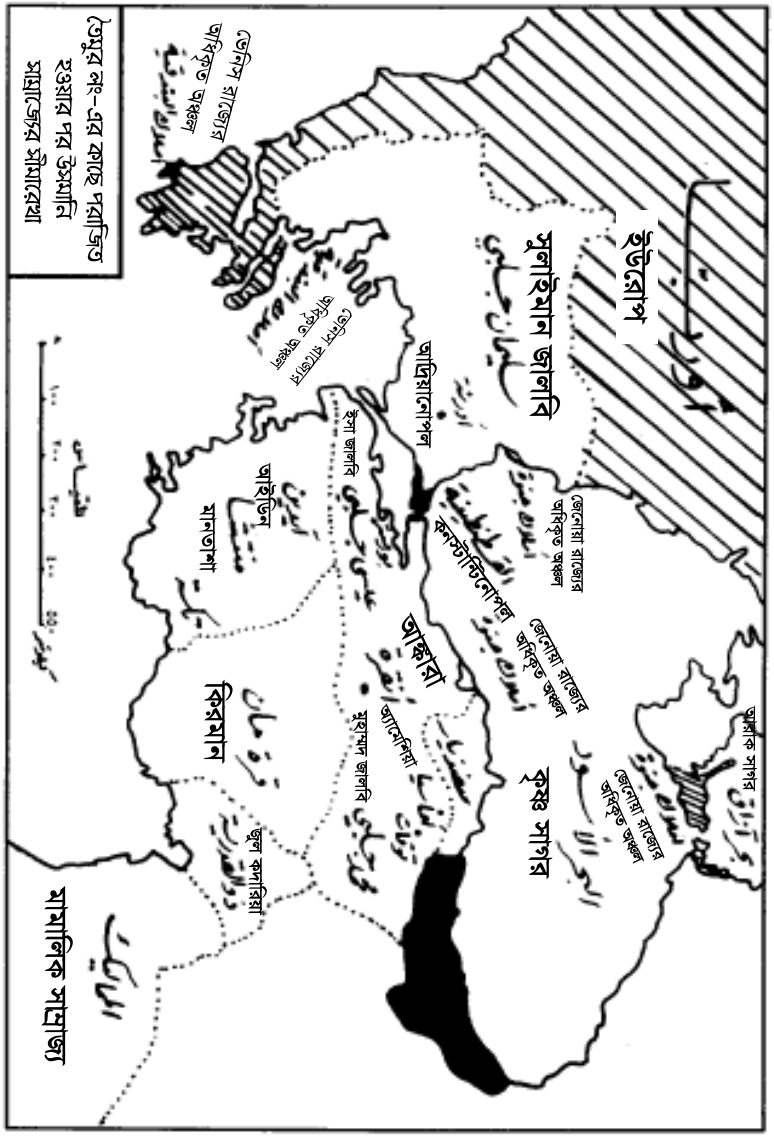

সাত. অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ

বায়েজিদের সন্তানদের মাঝে সিংহাসন নিয়ে অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের কারণে উসমানি সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাদের মধ্যকার এই লড়াই ৮০৬ থেকে ৮১৬ হিজরি মোতাবেক ১৪০৩ থেকে ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তথা দশ বছর অব্যহত থাকে।[১১০]

বায়েজিদের পাঁচ সন্তান ছিল, যারা তার সাথে তৈমুর লং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্য হতে একজন মুস্তফা। তার ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, তিনি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। মুসা তার পিতার সাথে বন্দি হয় এবং অপর তিনজন পালাতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্য হতে সর্বজ্যেষ্ঠ সুলাইমান আদ্রিয়ানোপল চলে যায়। নিজেকে সেখানকার সুলতান ঘোষণা করে। ইসা চলে যায় বারুসা অঞ্চলে এবং নিজেকে সেখানকার সুলতান ঘোষণা করে। এভাবেই তাদের তিন ভাইয়ের মাঝে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তারা রাজত্বের ভগ্ন দেহ নিয়ে ঝগড়া শুরু করে। আর শত্রুরা চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি শোণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। এরপর তৈমুর লং মুসাকে মুক্তি দেয়। তার মাধ্যমে ফিতনার আগুন আরও ঊর্ধ্বমুখী করে দেওয়ার জন্য এবং তাদের হিংস্রতা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে তাদেরকে লড়াইয়ে এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিতে ইন্ধন দিতে থাকে।[১১১]

এক বছর পর তৈমুর লং তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রস্থান করে। আর উসমানি রাজত্বকে রেখে যায় দুর্যোগ, ধ্বংস এবং বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায়।[১১২]

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এ অধ্যায়টি ছিল বিপদের এবং পরীক্ষার। কুসতানতিনিয়া বিজয়ের আগেই তাদের মতো সাম্রাজ্যের কার্যকরী ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলার একটি অনিবার্য নিয়ম হলো, তিনি কোনো জাতিকে বিভিন্নভাবে নিরীক্ষা না করে, অগ্নিপরীক্ষায় না ফেলে ক্ষমতা প্রদান করেন না। এভাবেই তিনি নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টদের পৃথক করে থাকেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদির ওপর অব্যহত একটি নিয়ম, যার কখনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, যাতে তাদের ইমান পরিচ্ছন্ন হয়। এরপরই জমিনে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হবে।

ইমানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য ক্ষমতালাভের পূর্বে মুমিনগণকে পরীক্ষা করা একটি অনিবার্য বিষয়, যাতে করে এর মাধ্যমে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং মজবুত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১১০] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৪৩।
[১১১] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৬।
[১১২] প্রাগুক্ত।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِينَ ـ

{মুমিনরা কি ভেবেছে 'আমরা ইমান এনেছি' এ কথা বলবে আর কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি তাদের পূর্বের লোকদেরও পরীক্ষা করেছি। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জানবেন—তাদের মধ্য হতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।} [সুরা আনকাবুত : ২-৩]

ফিতনার সংজ্ঞা : বিভিন্ন কঠিন কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া। যেমন—স্বদেশ থেকে পৃথক হওয়া, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা এবং সকল কষ্টদায়ক জিনিস গ্রহণ করা, প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, শারীরিক বিভিন্ন প্রকারের বিপদ, কাফেরদের ষড়যন্ত্র এবং কষ্টে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে।[১১৩]

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'أ حسب الناس-এর মধ্যে যে ইস্তেফহাম অর্থাৎ প্রশ্ন আছে তা হচ্ছে অস্বীকারসূচক প্রশ্ন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা আবশ্যকভাবে তার মুমিন বান্দাকে ইমানের অনুপাতে পরীক্ষা করবেন।'[১১৪]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—'সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হন নবিগণ, এরপর সালেহিন তথা আল্লাহর নেককার বান্দাগণ, এরপর যারা তাদের অধিক অনুরূপ হন তারা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে পরীক্ষা করেন, যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা থাকে তাহলে তার বিপদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়।'[১১৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া মুমিনের আবশ্যক গুণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুমিনের দৃষ্টান্ত ফসলের মতো, বাতাস যেমন ফসলকে দোলাতে থাকে; বিপদাপদও মুমিনকে সেভাবে স্পর্শ করতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত দেবদারু বৃক্ষের মতো, মূলোৎপাটন করার আগ পর্যন্ত যা স্পন্দিত হয় না।

বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র, গোত্র এবং সমাজে পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম জারি থাকবে। তাই উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি আল্লাহর পরীক্ষা নেওয়ার এই ধারা অব্যহত ছিল।

উসমানিরা তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা নিয়ে যে ভোগান্তি ভোগ করেছিল সেখান থেকে ক্রমাগত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে উত্তরণের মাধ্যমে তারা অমর হয়ে থাকবে। এ

[১১৩] *তাফসিরে নাসাফি,* ২৪৯/৩।
[১১৪] *তাফসিরে ইবনে কাসির,* ৪০৫/৩।
[১১৫] *সুনানে তিরমিযি,* (৬০১/৪) হাদিসুন হাসানুন সহিহুন।

ধারাবাহিকতায় ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে গিয়ে সুলতান প্রথম মুহাম্মদ একক ক্ষমতার মালিক হন। তিনি রাজত্বের ছুটে যাওয়া বিভিন্ন অঞ্চল একীভূত করতে সক্ষম হন। আঙ্কারার দুর্যোগ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে উসমানি সাম্রাজ্য ফিরে আসে তাদের ঐশী নীতিধারায়। ফলে উসমানিদের মধ্য হতে তৈরি হয়েছিল আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র-স্বভাব, এবং জিহাদের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট একটি জাতি। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে উসমানিরা তাদের ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং উত্তম চরিত্র সংরক্ষণ করেছিল।[১১৬] উরখান এবং তার ভাই আলাউদ্দিন যে বিরল যোগ্যতায় তাদের নতুন রাজত্ব গঠন করেছিলেন এবং আশ্চর্যজনক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন, পাশাপাশি উসমানিদের সন্তান এবং যুবকদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, এ সমস্ত কারণে উসমানিদের অন্তরে একটি পরিপূর্ণ সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টি হয়। আঙ্কারার দুর্ঘটনার পরে এই সাম্রাজ্য নতুনভাবে তার ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে দাঁড়ায়। প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় জীবনের জল। শরিয়তের প্রাণসঞ্চার হয়। নতুন করে তাদের দৃঢ়তা এবং সংযমের কাহিনি চর্চা হতে থাকে তাদের শত্রু, মিত্র সবার মুখে মুখে।[১১৭]

[১১৬] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি,* পৃষ্ঠা : ৬১।
[১১৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ

[৭৮১-৮২৪ হিজরি/ ১৩৬৯-১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে]

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ ৭৮১ হিজরি মোতাবেক ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৮] তার পিতা বায়েজিদের মৃত্যুর পর তিনি উম্মাহর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদ জালবি নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনাকৃতি, গোলাকৃতি চেহারার। তার দুই ভ্রু ছিল মিলানো। গায়ের চামড়া ছিল শুভ্র। গণ্ডদেশ ছিল লাল। প্রশস্ত বুক এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যাধিক উদ্যমী এবং কর্মচঞ্চল। লড়াই এবং শক্তিশালী তির ধনুকের সাহচর্যে থাকতেন। তার রাজত্বকালে তিনি ২৪টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। চল্লিশটি জখমে আক্রান্ত হন।[১১৯] মুহাম্মদ জালবি তার দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ মিটাতে সক্ষম হন। তিনি এক এক করে তার ভাইদের পরাজিত করে তার জন্য রাজত্বের পথ পরিষ্কার করেন এবং একক সম্রাট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । তিনি তার আট বছরের রাজত্বকালকে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন এবং সাম্রাজ্যের ভিত মজবুতকরণে ব্যয় করেন।[১২০] কোনো কোনো ইতিহাসবিদ তাকে উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা আখ্যা দিয়ে থাকেন।[১২১]

এই সুলতান থেকে যা যা অবদান পাওয়া যায় তা হলো, তিনি সহনশীলতার সাথে যারা তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচারণ করেছে তাদেরকে শাসন করেছেন। কিরমানের শাসক যখন উসমানি সাম্রাজ্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল তখন তিনি তাকে হুমকি-ধমকি দিয়ে

[১১৮] *আখতাউন ইয়াজিবু আন তুসাহিহা* (আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু), পৃষ্ঠা : ৩৩।
[১১৯] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুন,* পৃষ্ঠা : ৪১।
[১২০] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭।
[১২১] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুন,* পৃষ্ঠা : ৪১।

পরবর্তী সময়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ, কিরমানের শাসক কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিল সে আর কখনো সাম্রাজ্যের প্রতি খেয়ানত করবে না। সে তার এই শপথ ভেঙে ফেললে তিনি দ্বিতীয়বারেও তাকে ক্ষমা করেন।[১২২]

তার রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল, উসমানি সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন এবং তা অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে মজবুত করা। এ জন্যই তিনি কুসতানতিনিয়ার সম্রাটের সাথে সন্ধি করেন এবং তাকে ও তার মিত্রদেরকে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী কিছু শহর এবং তাসালিয়ার কিছু শহর অর্পণ করে দেন। কালিতবুলির সাথে তার নৌ-বহরের পরাজয়ের পর তিনি কামানের সংস্কার করেন এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় ফিতনা ও বিশৃংখলা নির্মূল করেন। তিনি তৈমুর লং কর্তৃক বিজিত কিছু অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তারা তার আনুগত্য এবং নেতৃত্ব মেনে নেয়।[১২৩]

সুলতান মুহাম্মদের জমানায় বদরুদ্দিন নামে একলোকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তার নামের সাথে আলেম উপাধি লাগিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতান মুহাম্মদের ভাই মুসার অধিভুক্ত একজন সেনা। সে সময় তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সামরিক বিচারকের পদে আসীন হন। এই বিচারককে মুসা ইবনে বায়েজিদ চুম্বন করেছিলেন।

শাকায়েকুন নোমানিয়্যাহ গ্রন্থকার বলেন—

'শায়খ বদরুদ্দিন মাহমুদ ইবনে ইসরাইল। ইবনে কাজি সিমাউনা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তুরস্কের ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত রোমের আদ্রিয়ানোপল শহরের একটি গ্রাম কেল্লা বদরুদ্দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতাও ছিলেন সেখানকার মুসলিম সেনাবাহিনীর বিচারক। সে কেল্লার বিজয় হয়েছিল তার হাতেই। শায়খ বদরুদ্দিনের জন্ম হয়েছিল উসমানি সুলতান গাজি খোদাওয়ান্দকার (প্রথম মুরাদ) এর সময়ে। বাল্যকালে তিনি তার পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শাহেদি নামে একজন প্রসিদ্ধ আলেমের কাছে কুরআন শেখেন এবং হিফজ সম্পন্ন করেন। মাওলানা ইউসুফের কাছে শেখেন নাহু, সরফ। এরপর মিসর চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি মাওলানা সাইয়েদ শরিফ জুরজানির সাথে কায়রোর মাদরাসায় মাওলানা মোবারক শাহ মানতেকির কাছে পড়েন। এরপর তিনি মোবারক শাহের সাথে হজের সফর করেন। মক্কায় তিনি ইমাম জায়লায়ীর কাছে পড়েন। এরপর পুনরায় কায়রোতে ফিরে আসেন। এবার সাইয়েদ জুরজানির সাথে শায়খ আকমালুদ্দিন বাইবুরির কাছে পড়েন। আর এই শায়খ বদরুদ্দিনের কাছেই পড়েছিলেন মিসরের সুলতান ফরজ, যিনি মিসরের মামলুক সাম্রাজ্যের সুলতান বারকুকের পুত্র ছিলেন।

[১২২] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাতি,* পৃষ্ঠা : ২৪৯।
[১২৩] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭।

এরপর শায়খ বদরুদ্দিন প্রভুর আকর্ষণবোধ করেন। তাই তিনি সে সময়কার মিসর অধিবাসী শায়খ সাইদ আল আখলাতির দরগাহে চলে যান। তিনি তার কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। তার মুরিদ হন। শায়খ আখলাতি তাকে তিবরিজ শহরে সুফিবাদের প্রচারে প্রেরণ করেন। বর্ণিত আছে, তিনি যখন তিবরিজে তৈমুর লং এর কাছে যান তখন তার কাছ থেকে প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। শায়খ সব ছেড়ে বাদলিসে চলে যান। এরপর মিসরে সফর করেন। সেখান থেকে চলে যান হালবে, সেখান থেকে কোনিয়ায় এবং সেখান থেকে রোমের তিবরায়। এরপর সাকিজ উপদ্বীপের রাজা তাকে দাওয়াত দেন এবং তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর গাজি উসমানের বংশধর মুসা যখন সালতানাতের অধিপতি হন তখন তাকে সামরিক বিচারক নিযুক্ত করেন। এরপর মুসার ভাই মুহাম্মদ মুসাকে হত্যা করেন এবং শায়খ বদরুদ্দিনকে তার পরিবার-পরিজনসহ আজনিক শহরে বন্দি করে রাখেন।[১২৪]

আজনিক তুরস্কে অবস্থিত একটি শহর। এখানেই শায়খ বদরুদ্দিন মাহমুদ ইবনে ইসরাইল তার নষ্ট আকিদার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। তিনি সম্পদ, ভোগবিলাস এবং ধর্ম সবকিছুতে সাম্য বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে থাকেন। তিনি মুসলিম এবং অমুসলিমের মাঝে ধর্মীয় পার্থক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন, মানুষ সবাই ভাই ভাই। ধর্ম বিশ্বাস তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে। এমন মতের দিকেই ইহুদি মিশনারীরা দাওয়াত দিত। তিনি তার এই অসাড় মতের সাথে সহমত পোষণকারী কিছু গণ্ডমূর্খ এবং দুনিয়ালোভী দুরাচারীদের জুটিয়ে নেন। এই মুফসিদ বদরুদ্দিনের কিছু ছাত্র তৈরি হয়ে যায়। তারা মানুষকে তার মতের দিকে আহ্বান করতে থাকে। তাদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ একজনের নাম বীর কলিজা মোস্তফা। আরেকজনের নাম হলো তোরা কামাল। বলা হয়ে থাকে তার মূল ছিল ইহুদি। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদিরা সর্বদা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং আছে।

এই ফাসেদ মত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এবং তার মতাবলম্বী বৃদ্ধি পায়। সুলতান মুহাম্মদ জালবি এই বাতিল মতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং তার এক সেনাপতিকে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী দিয়ে বদরুদ্দিনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেন। আফসোসের কথা হলো মুহাম্মদ জালবির প্রেরিত সৈন্যদলের সেনাপতি সিসমান গাদ্দার বীর কলিজার হাতে নিহত হয় এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। সুলতান মুহাম্মদ তার প্রধান উজির বায়েজিদ পাশার নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তারা বীর কলিজার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে তার আস্তানা কোরা বোরনুতে নাস্তানাবুদ

[১২৪] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* (১৩৩,১৩৪) শাকায়েকে নোমানিয়্যাহর মাখতুত নোসখা থেকে বর্ণনা করেন।

করেন। এরপর আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে বীর কলিজার ওপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ

{যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।}
[সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩৩]

শায়খ বদরুদ্দিন তার ভ্রান্তিতে অবিচল থাকেন। তিনি মনে করেন, রাজ্যের কোণে কোণে যে বিচ্ছিন্নতা এবং বিশৃঙ্খলা চলছে এর মাধ্যমে অচিরেই তিনি রাজত্বের ক্ষমতা লাভ করবেন। বদরুদ্দিন বলতেন, 'আমি অচিরেই সারা বিশ্বের রাজা হব। আমার অদৃশ্য ইঙ্গিতবহ বিশ্বাস এর মাধ্যমে ইলমের শক্তি এবং তাওহিদের গোপনভেদ দিয়ে আমি বিশ্বকে আমার মুরিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। আমি আহলে তাকলিদ তথা অনুসরণকারীদের মাজহাব এবং নিয়মকানুন বাতিল করে দেব এবং আমার পানপাত্রের ব্যাপকতার মাধ্যমে কিছু হারামকে হালাল করব।'[১২৫]

রোমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত ওয়ালাচিয়ারের শাসক এই নিম্নগামী, বিদআতি এবং জিন্দিককে মৌলিক এবং সামরিক সমর্থন দিত। আর সুলতান মুহাম্মদ জালবি এই ফাসেদ মতকে দূর করার জন্য এবং তার কণ্ঠনালী চেপে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন। ফলে বদরুদ্দিন বর্তমান বুলগেরিয়ার ডেলি ওরমান অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়।[১২৬] মুহাম্মদ শরফুদ্দিন শায়খ বদরুদ্দিনের ডেলি ওরমান অঞ্চলে যাওয়া সম্পর্কে বলেন, 'এই ঘটনা এবং তার সাথে পরিবেষ্টিত যে সকল এলাকা আছে সেগুলোকে মাওয়াল বাতেনিয়্যাহ তথা বাতেনিদের আশ্রয়স্থল বলা হয়ে থাকে। সে অঞ্চল বাবা ইসহাকের শিষ্য দ্বারা ভরপুর ছিল। তারা সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তাই শায়খ বদরুদ্দিনের এই স্থানের প্রতি মনোযোগ এবং তার হাজার

[১২৫] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ১৪০।
[১২৬] প্রাগুক্ত।

হাজার সমর্থকদের একত্রিকরণ এবং এ অঞ্চল থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনাই বলে দেয় এই ভণ্ড শায়খ কেন এই জায়গাকে বেছে নিয়েছিলেন।'[১২৭]

ডেলি ওরমান অঞ্চলে শায়খের নিকট ইউরোপীয় সাহায্য আসা শুরু হয়। উসমানি সুলতান প্রথম মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তার অবাধ্যতার ফিতা আরও বিস্তৃত হয়ে যায়। ইসলামের শত্রু ভিন্নমতাবলম্বীদের সদস্য সংখ্যা পৌঁছে যায় সাত-আট হাজারে।[১২৮]

সুলতান মুহাম্মদ সব বিষয়ে বেশ সতর্কতা এবং সজাগ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। অবাধ্যচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি মোটেও উদাসীন ছিলেন না। তাই তিনি নিজেই শায়খ বদরুদ্দিনের সাথে লড়াই করারা জন্য নেমে পড়েন। এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি ডেলি ওরমানের দিকে রওনা হন।

সুলতান মুহাম্মদ বর্তমান গ্রিসে অবস্থিত সিরিউসকে তার সেনা পরিচালনার কেন্দ্র বানান। তার সেনাশক্তিকে তিনি অবাধ্যাচারীদের কাছে প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে পরাজিত করে। তাদের নেতা অবাধ্যাচারী বদরুদ্দিন ডেলি ওরমানে সুলতান থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে।[১২৯]

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ এর প্রতিনিধিদল অবাধ্যচারীদের কাতারে ফাটল ধরাতে সক্ষম হন এবং তাদের ব্যাপারে মজবুত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর ফলেই অবাধ্যদের প্রধান বদরুদ্দিনকে বন্দি করা হয়।[১৩০]

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ যখন বদরুদ্দিনের মুখোমুখি হলেন, তাকে বললেন, আমার কী হলো! আমি আপনার চেহারায় হলুদ বর্ণ দেখছি কেন?

বদরুদ্দিন জবাব দিল, সূর্যও অস্তমিত হওয়ার আগে হলুদবর্ণ ধারণ করে মালিক।

সাম্রাজ্যের আলেমগণ বদরুদ্দিন এর সাথে ইলমি মোনাজারায় লিপ্ত হন। এরপর তার বিরুদ্ধে শরয়ি বিচার বসানো হয়। উলামায়ে কেরামের ফতওয়ার ওপর নির্ভর করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। যার সূত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস— 'তোমাদের মধ্য হতে সবাই যখন একজনের বিরুদ্ধে একমত হয়, যে কিনা তোমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং তোমাদের দলকে বিভক্ত করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা কর।'[১৩১]

[১২৭] প্রাগুক্ত।
[১২৮] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ১৪১।
[১২৯] প্রাগুক্ত।
[১৩০] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ১৪১-১৪২।
[১৩১] *মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ইযা বুয়িয়া লিখলিফাতাইনি,* (১৪৬০/৩) হাদিস নং-১৮৫২।

বদরুদ্দিন যে ভ্রান্ত মতের দিকে আহ্বান করতেন তা বর্তমান ইহুদি মিশনারীদেরই মতো। (পঞ্চদশ শতাব্দী হিজরি মোতাবেক বিংশ শতাব্দী খ্রিষ্টীয়)। তিনি ইসলামি সহিহ আকিদার এবং ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেন। কারণ, তিনি মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান, গোপূজারি এবং কমিউনিস্টদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের কথা বলতেন। আর এটা ইসলামের আকিদার পরিপন্থী। ইসলাম শক্তভাবে বলে দিয়েছে, মুসলিমদের মাঝে এবং অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী কোনো ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নেই। যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে তাদের মাঝে আর একাত্মবাদী মুমিনদের মাঝে কীভাবে ভ্রাতৃত্ব হবে?[১৩২]

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ কবিতা, সাহিত্য ভালোবাসতেন। বলা হয়ে থাকে, তিনিই প্রথম উসমানি শাসক যিনি মক্কার আমিরের কাছে বাৎসরিক হাদিয়া পাঠাতেন। যেটাকে সররা বলা হতো। সররা বলা হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার অংশকে যা মক্কা এবং মদিনার দরিদ্রদের বণ্টন করার জন্য পাঠানো হয়।[১৩৩]

উসমানি প্রজাগণ সুলতান প্রথম মুহাম্মদকে ভালোবাসতেন। তারা ভালোবেসে তাকে পাহলোয়ান উপাধি দিয়েছিলেন। পাহলোয়ান অর্থ বীর, নায়ক। তারা তাকে এ উপাধি দিয়েছিলেন তার কর্মোদ্যমতা এবং বীরত্ব দেখে। তার মহৎ কর্মকাণ্ড এবং বিরল প্রতিভার কারণে—যার মাধ্যমে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং উসমানি সাম্রাজ্যকে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে গেছেন। তার উত্তম স্বভাব, আচরণ এবং প্রেমময়তা দেখে এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তার প্রীতি দেখে তার প্রজাগণ তাকে ভালোবেসে জালবি উপাধিও দিয়েছিলেন। এটি একটি সম্মানজনক উপাধি, যার মধ্যে প্রেমময়তা এবং ব্যক্তিত্বের অর্থ রয়েছে।

যদিও কতক উসমানি শাসক খ্যাতির দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেও তিনি ছিলেন উসমানি শাসকদের মাঝে সবচেয়ে বিচক্ষণ। পশ্চিমা এবং ইউনানি ইতিহাসবিদগণ তার মানবতার কথা স্বীকার করেছেন। উসমানি ইতিহাসবিদগণ তাকে আখ্যা দিয়েছেন দক্ষ নাবিক এবং ক্যাপ্টেন হিসেবে।[১৩৪] যিনি উসমানি সাম্রাজ্যের জাহাজকে দক্ষভাবে চালিত করেছেন যখন তাতারিদের হামলা, অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ এবং বাতেনি ফেতনা তাকে গুটিয়ে নিয়েছিল।

[১৩২] *আখতাউন ইয়াজিবু আন তুছাহহিহা ফিত তারিখি* (আদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ), পৃষ্ঠা : ৩৮।
[১৩৩] *তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়াতিল উসমানিয়্যাতি,* পৃষ্ঠা : ১৫২।
[১৩৪] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি,* পৃষ্ঠা : ৬২।

ইনতেকাল

উসমানি সাম্রাজ্য যে ফিতনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল তার চিহ্ন মিটানোর ক্ষেত্রে এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানে সুলতান মুহাম্মদ তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। ভবিষ্যতে দাঙ্গা ফাসাদ যেন সৃষ্টি না হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ শান্তিপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে করতেই তিনি উপলব্ধি করেন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই তিনি বায়েজিদ পাশাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, 'আমি আমার ছেলে মুরাদকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করলাম, তাই তাকে অনুসরণ করবে। যেভাবে আমার সাথে সত্যবাদী ছিলে সেভাবে তার সাথেও সত্যবাদী থাকবে। আমি চাই তোমরা এখনই আমার কাছে মুরাদকে নিয়ে আস। হয়তো আমি এর পরে বিছানা থেকে উঠতে পারব না। তার আসার আগেই যদি প্রভুর ডাক এসে যায় তাহলে সে এলে তারপর আমার মৃত্যুর ঘোষণা দেবে।'[১৩৫]

৮২৪ হিজরি মোতাবেক ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে আওরানা শহরে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ৪৩ বছর বয়সে তিনি তার সৃষ্টিকর্তার কাছে তার প্রাণপাখি সমর্পণ করেন। সুলতানের মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যার পরিণাম সুখকর হবে না—এই আশঙ্কায় সুলতানের দুই উজির ইবরাহিম এবং বায়েজিদ পাশা দ্বিতীয় মুরাদ আসার আগ পর্যন্ত সৈন্যদের কাছে সুলতানের মৃত্যুর খবর গোপন রাখার ব্যাপারে একমত হন। তারা প্রচার করেন, সুলতান অসুস্থ। তারা সুলতানের ছেলের কাছে খবর পাঠান এবং একচল্লিশ দিন পর তিনি উপস্থিত হয়ে রাজত্বের ক্ষমতা বুঝে নেন।[১৩৬]

সুলতান প্রথম মুহাম্মদ শান্তি, জ্ঞান এবং বিজ্ঞদের ভালোবাসতেন। এ জন্য তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানীকে আদ্রিয়ানোপল (যোদ্ধাদের শহর) থেকে স্থানান্তর করে বুরুসায় (ফুকাহা তথা বিজ্ঞদের শহর) স্থানান্তর করেন।[১৩৭] তিনি ছিলেন সমুন্নত চরিত্রবান, মজবুত ও অদ্বিতীয় সহনশীলতার অধিকারী এবং শত্রু মিত্রদের সাথে চলাফেরায় দুর্লভ নীতির অধিকারী।

[১৩৫] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুনা,* পৃষ্ঠা : ৪১।
[১৩৬] *তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়াতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১৫২।
[১৩৭] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি,* পৃষ্ঠা : ৬৩।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তার পিতা মুহাম্মদ জালবির ইনতেকালের পর ৮২৪ হিজরি মোতাবেক ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় আসীন হন। তখন তার বয়স আঠারোও অতিক্রম করেনি। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে এবং ইউরোপের সর্বত্র ইসলামের দিকে আহ্বান করাকে ভালোবাসতেন।[১৩৮]

তার খোদাভীরুতা, দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা ছিল সর্বজনবিদিত।[১৩৯] সুলতান মুরাদ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের দফারফা করতে সক্ষম হন। যে বিদ্রোহের শুরু হয়েছিল তার চাচা মুস্তফা এবং তাকে সমর্থনকারীর হাত ধরে। উসমানি সাম্রাজ্যের শত্রুদের হাত ধরে। বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েল ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। তার কারণেই সুলতান দ্বিতীয় মুরাদকে যত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই দ্বিতীয় ম্যানুয়েলই সুলতান মুরাদের চাচা মুস্তফাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তফা সুলতানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাতে নেতৃত্ব লাভ করার জন্য মুস্তফা গালিয়ুবি শহর অবরোধ করেছিলেন। সুলতান মুরাদ তার চাচাকে গ্রেফতার করেন এবং বিদ্রোহের জন্য তাকে বিচারকার্যের সম্মুখীন করেন। এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় ম্যানুয়েল সুলতানের বিরুদ্ধে তার চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। সে সুলতানের এক ভাইয়ের সাথে আঁতাত করে তাকে আনাতোলিয়া শহরের নিকিয়ার ক্ষমতায় বসায়। মুরাদ সেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে তার শক্তির নিরোধে সফল হন এবং তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এরপর সেই ভাইকে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে সুলতান মুরাদ বাইজেন্টাইন সম্রাটকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার মনস্থ করেন। তাই তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুলুলানিকের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ৮৩৪

[১৩৮] *আখতাউন ইয়াজিবু আন তুসাহহিহা* (আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু), পৃষ্ঠা : ৩৮।
[১৩৯] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুনা,* পৃষ্ঠা : ৪৩।

হিজরি মোতাবেক ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে হামলা করে তা দখল করে নেন। এরপর তা উসমানি সালতানাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

সুলতান মুরাদ বলকান অঞ্চলের বিদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডের দিকেও তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাই সে অঞ্চলে উসমানি সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত করার দিকে ব্রতী হন। তিনি উসমানি সেনাবাহিনীকে ওলাশিয়া অঞ্চল অধিকৃত করার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাদের ওপরে বাৎসরিক জিজিয়া আরোপ করেন। তিনি সার্বিয়ার নতুন সম্রাটকে (স্টিভ লাজার মিথস) উসমানি সাম্রাজ্যের সামনে অবনত হতে এবং তাদের শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করেন এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব নবায়ন করেন। এরপর উসমানি সেনাবাহিনী উত্তরের দিকে মনোযোগী হয়। সেখানে ইউনান তথা গ্রিস অঞ্চলে তারা উসমানি সাম্রাজ্যের ঘাঁটি স্থাপিত করেন। সুলতান তার জিহাদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেরি না করে হাঙ্গেরি এবং আলবেনিয়ার বিদ্রোহীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

৮৩৪ হিজরি মোতাবেক ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি সৈন্যগণ আলবেনিয়া দখল করে নেন এবং তার উত্তরাঞ্চলে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করেন। তবে সেখানকার দক্ষিণাঞ্চলে উসমানি সেনাবাহিনী তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। আলবেনিয়া পর্বতমালার পাদদেশে আলবেনিয়ানরা উসমানি সেনাবাহিনীকে রুখে দিতে সক্ষম হয়। এভাবে তারা স্বয়ং সুলতান মুরাদ কর্তৃক পরিচালিত পরপর আরও দুটি আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে উসমানিরা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হন। খ্রিষ্টানরা আলবেনিয়ানদের এই বিজয়ের ফলে তাদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়। বিশেষ করে ভেনিস অঞ্চলের শাসকরা। তারা উসমানিদের এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিজয় হলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। কারণ, এ অঞ্চলের সামুদ্রিক সীমানা ভূমধ্যসাগরের সাথে মিলিত হয়ে ভেনিসের সাথে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত ছিল। তখন তারা ইদরিয়াতিক সমুদ্রের সীমাবদ্ধ এলাকায় ভেনিসের নৌ-বহরের প্রতিরোধে সক্ষম হতো। এভাবেই সুলতান মুরাদ আলবেনিয়ায় উসমানি সাম্রাজ্যের স্থিতি দেখে যেতে পারেননি।[১৪০]

আর হাঙ্গেরী ও তার আশপাশের অঞ্চলে উসমানিরা ৮৪২ হিজরি মোতাবেক ১৪৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হাঙ্গেরীয়ানদের পরাজিত করেন এবং তাদের সত্তুর হাজার সৈন্য বন্দি করেন। পাশাপাশি আরও কিছু অঞ্চলে তারা কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এরপর তারা সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড দখল করার জন্য সম্মুখ অগ্রসর হন; কিন্তু সুলতান তার এই চেষ্টায় ব্যর্থ হন। পোপের নেতৃত্বে ক্রুসেডীয় খ্রিষ্টানরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বড়সড় মিত্রবাহিনী গঠন করে ফেলে। এই মিত্রশক্তির লক্ষ্য ছিল ইউরোপ থেকে পুরোপুরিভাবে উসমানিদেরকে হটানো। পোপ কর্তৃক পরিচালিত এই মিত্রশক্তির মধ্যে শরিক হয় হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সার্বিয়া, ওয়ালাচিয়ার, জেনোয়া, ভেনিস এবং বাইজেন্টাইন

[১৪০] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৪২।

সাম্রাজ্য। তাদের সাথে যোগ হয় আলমেনিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্রের পদাতিক বাহিনী। এই ক্রুসেডীয় মিত্র বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় হাঙ্গেরির ক্ষমতাধর সেনাপতি ইয়ুহনা হুনিয়াদিকে। হুনিয়াদি ক্রুসেডীয় স্থলবাহিনীকে নিয়ে উত্তরের দিকে দানিয়ুব অতিক্রম করে ফেলেন। ৮৪৬ হিজরি মোতাবেক ১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দে উসমানিদের ওপর পরপর দুটি হামলা করেন। ফলে উসমানিরা সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়।[১৪১]

৮৪৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দে 'সিজজাদান' নামক এলাকায় এই চুক্তি দশ বছরের জন্য নির্ধারণ করা হয়। সেখানে সুলতান মুরাদ সার্বিয়ার আধিপত্য ছেড়ে দেন। 'জর্জ ব্রাংকোফেটস'কে সেখানকার শাসক মেনে নেন। এভাবে সুলতান মুরাদ ওয়ালাচিয়ারের এলাকা হাঙ্গেরিকে ছেড়ে দেন। তার জামাতা উসমানি সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মাহমুদ শিবলিকে মুক্ত করে আনেন। ষাট হাজার ডিউকের উপস্থিতিতে হাঙ্গেরী এবং উসমানিদের উভয় ভাষায় সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। হাঙ্গেরীর শাসক 'ল্যাডিসলাস' ইঞ্জিল ছুঁয়ে এবং সুলতান মুরাদ কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেন তারা এই সন্ধিচুক্তির শর্তাবলি দায়িত্ব এবং সম্মানের সাথে পালন করবেন।

[১৪১] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৪২।

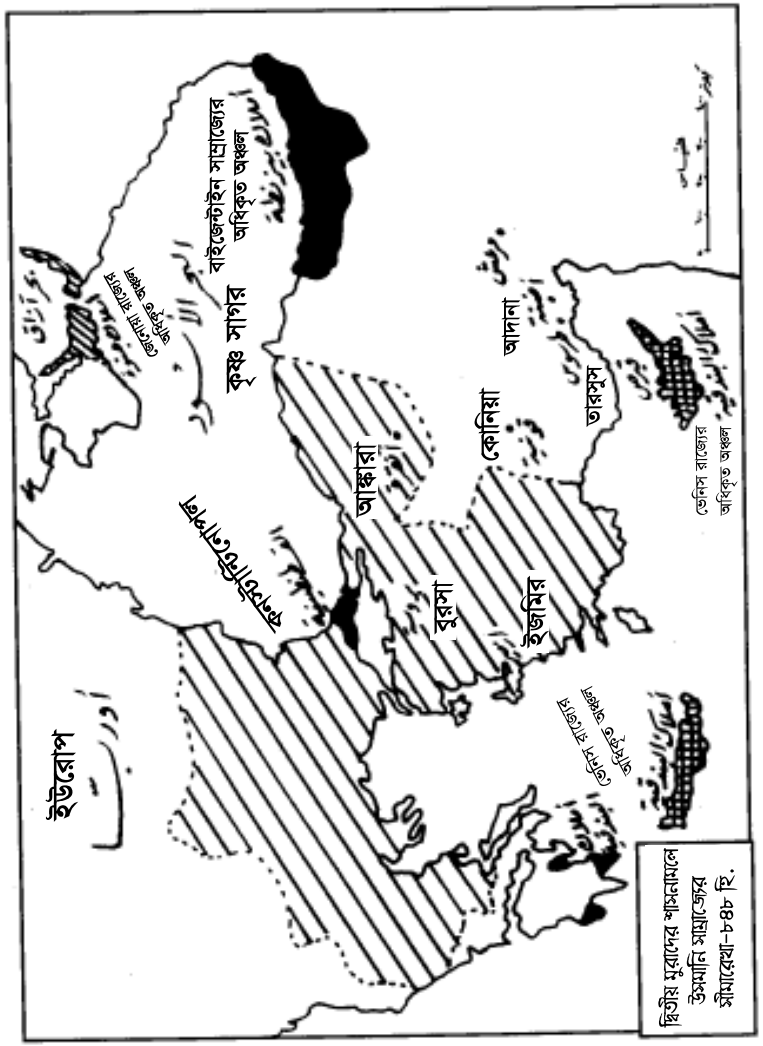

ইউরোপীয় শত্রুদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করে সুলতান মুরাদ আনাজুলে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তার ছেলে আমির 'আলা'র মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তার শোক আরও গভীর হয়। তিনি দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করেন। তার ছেলে মুহাম্মদের কাছে রাজত্ব হস্তান্তর করেন। তখন মুহাম্মদের বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ। তার অল্প বয়সের কারণে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তার রক্ষণাবেক্ষণে রাজদরবারের কয়েকজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোককে নিয়োজিত করেন। এরপর তিনি এশিয়া মাইনরের

ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে চলে যান, যেন সেখানে তার অবশিষ্ট জীবন দুনিয়াবী ঝামেলামুক্ত এবং প্রশান্তিপূর্ণভাবে কাটিয়ে দিতে পারেন। তার রাজত্বের সকল অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি নির্জনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তার ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করায় মনোনিবেশ করেন। তবে এই নির্জনতা এবং ইবাদতের স্বাদ তিনি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি।[১৪২] এমতাবস্থায় কার্ডিনাল সিজারিনি এবং তার কিছু সহযোগী উসমানিদের সাথে তাদের করা সন্ধিচুক্তি ভাঙ্গার জন্য এবং ইউরোপ থেকে উসমানিদের একেবারে বের করে দেওয়ার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করতে থাকে। এ ব্যাপারে বিশেষ ভুমিকা রেখেছিল সুলতান মুরাদ কর্তৃক তার ছেলের কাছে সিংহাসন ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। রাজত্ব পরিচালনায় তখন যার কোনো অভিজ্ঞতা এবং অবদান ছিল না। পোপ চতুর্থ আওজিন এই শয়তানি চিন্তার ইন্ধনদাতা ছিল।[১৪৩] সে খ্রিষ্টানদেরকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য বলে এবং খ্রিষ্টানদের এবং মুসলিমদের মাঝে সংঘর্ষের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সে বলেছিল, মুসলিমদের মাঝে এবং খ্রিস্টানদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল। কেননা, তা জমিনে মাসিহের প্রতিনিধি পোপের অনুমতি ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছে। আর কার্ডিনাল সিজারিনি ছিল বেশ উদ্যমী, সে কোনো কাজ থেকেই পিছিয়ে থাকত না। সে উসমানিদের বিরুদ্ধে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। এ জন্যই সে খ্রিষ্টান দেশগুলো ঘুরে ঘুরে তাদের নেতাদেরকে মুসলিমদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। আর যারা চুক্তি ভঙ্গের বিরোধিতা করত তাদেরকে বোঝাত। সে তাদেরকে বলত, 'পোপের নামে যে চুক্তিভঙ্গ করবে তারা দায়মুক্ত হবে এবং তাদের সৈন্য সামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাদের জন্য উচিত হলো পোপের পথ অনুসরণ করা। এটাই সম্মান এবং মুক্তির পথ। এরপরও যার অন্তর তাকে বাধা দেয় এবং গুনাহের ভয় করে তাহলে সেই তার পাপের বোঝা বহন করবে।[১৪৪]

খ্রিষ্টানরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদল প্রস্তুত করে। তারা কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী বুলগেরিয়ার 'ফারনা' শহর অবরোধ করে, যা মুসলিমদের হাতে স্বাধীন হয়েছিল। চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতার একটি মাধ্যম। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপরে চুক্তিভঙ্গকারীদের সাথে লড়াই করাকে আবশ্যক করেছেন। তিনি বলেন—

فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ـ

{তোমরা কাফের নেতাদের হত্যা করো। নিশ্চয় তারা কোনো চুক্তি রক্ষা করে না, যেন তারা এই কাজ থেকে বিরত থাকে।} [সুরা তাওবা, আয়াত : ১২]

[১৪২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৪২-৪৩।
[১৪৩] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৪৩।
[১৪৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৪৪।

তারা কোনো অঙ্গীকার, চুক্তি রক্ষা করে না। এটা তাদের সবসময়ের একটি স্বভাব। তারা কোনো জাতির সাথে লড়াই করা থেকে ভয় করে না। কোনো দুর্বল মানুষকে দেখলেই তারা তাকে হত্যা করে, জবাই করে।[১৪৫] আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ـ

{তারা কোনো মুমিনের ব্যাপারে কোনো আত্মীয়তা এবং অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। তারাই হলো সীমালংঘনকারী।} [সুরা তওবা, আয়াত : ১০]

উসমানি সাম্রাজ্যের দিকে খ্রিষ্টানদের এই হামলার পরিকল্পনার সময় আদ্রিয়ানোপলের মুসলিমগণ ক্রুসেডারদের এই হামলার কথা শুনতে পান এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি গ্রাস করে নেয়। সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা সুলতান মুরাদের কাছে দূত প্রেরণ করে তাকে জলদি করে এসে এই দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য বলে। মুজাহিদ সুলতান ক্রুসেডীয় দুর্যোগের বিরুদ্ধে উসমানিদেরকে পরিচালনার জন্য তার নির্জনতা থেকে বের হয়ে আসেন। সুলতান মুরাদ জেনোয়ার সাথে চুক্তি করতে সক্ষম হন, যেন তারা চল্লিশ হাজার উসমানি সৈন্যকে তাদের নৌযানের মাধ্যমে এশিয়া থেকে ইউরোপে নিয়ে যায়। এই চুক্তি হয়েছিল ক্রুসেডারদের নৌ-বহরের নাকের ডগায়। প্রত্যেক উসমানি সেনার বিনিময় নির্ধারণ করা হয় জনপ্রতি এক দিনার ।

সুলতান মুরাদ তার অভিযানে বেশ দ্রুততা অবলম্বন করেন। ফলে তিনি সেদিনই ভারনায় পৌঁছেন যেদিন সেখানে ক্রুসেডার সৈন্যরা পৌঁছেছিল।

পরের দিনই মুসলিম এবং খ্রিষ্টান উভয় বাহিনীর মাঝে লড়াই শুরু হয়ে যায়। তা ছিল খুবই অস্থির এবং ভয়াবহ লড়াই। সুলতান মুরাদ যে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তারা তিরবিদ্ধ করে তা টুকরো টুকরো করে ফেলে। যেন তারা মুসলিমদের এবং আসমান ও জমিনকে তাদের শত্রুতা এবং গাদ্দারী দেখাতে পারে এবং তাদের সৈন্যদের মধ্যে উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে পারে।[১৪৬]

দু-পক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এ যুদ্ধে খ্রিস্টানদের বিজয় হতে পারত। কারণ, তাদের ধর্মীয় ক্রোধ ছিল, অধিক উদ্দীপনা ছিল। কিন্তু তাদের এই ক্রোধ এবং উদ্দীপনা উসমানিদের জিহাদিশক্তির সামনে ধুলোয় মিশে যায়। চুক্তিভঙ্গকারী হাঙ্গেরীর রাজা 'লাডিসলাস' এবং চুক্তি পরিপূর্ণকারী সুলতান মুরাদ যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর মুখোমুখি হন। তাদের দুইজনের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। অবশেষে মুসলিম সুলতান হাঙ্গেরির খ্রিষ্টান রাজাকে হত্যা করতে সক্ষম হন। তিনি তাকে তিরের

[১৪৫] *আখতাউন ইয়াজিবু আন তুসাহহিহা* (আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু), পৃষ্ঠা : ৪১।
[১৪৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* সালিম আররশিদী, পৃষ্ঠা : ৪৫।

এক শক্ত আঘাতে ধরাশয়ী করে দেন এবং তাকে তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ভূতলে ফেলে দেন। এরপর কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার ধর ছিন্ন করে রক্তাক্ত তিরের ডগায় রেখে আনন্দ চিত্তে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উত্তোলন করে।[১৪৭]একজন মুজাহিদ শত্রুদের লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বলেন, 'হে কাফেরের দল, এই দেখ্ তোদের রাজার মাথা।' সমস্ত খ্রিস্টান সৈন্যদের ওপর এই দৃশ্যটি বিরাট প্রভাব ফেলে। ভয়-ভীতি তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। এরপর মুসলিমরা তাদের ওপর জোরদার হামলা করে। তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। খ্রিস্টানরা পরস্পরকে সামাল দিতে দিতে পলায়ন করে। সুলতান মুরাদ এখানেই ক্ষ্যান্ত থাকেন। তার শত্রুদেরকে আর পিছু ধাওয়া করেননি। নিশ্চয় এটি ছিল বিরাট বিজয়।[১৪৮]

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কসোভোর সমভূমিতে। ১৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দের (৮৫২হিজরি) ১৭ অক্টোবরে। যুদ্ধের সময় ছিল তিন দিন। উসমানিগণের নিরংকুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে যার সমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধ কমপক্ষে দশ বছরের জন্য হলেও হাঙ্গেরীকে ওই সমস্ত সাম্রাজ্য থেকে ছিটকে দেয়, যারা উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাহস করতে পারত।[১৪৯]

সুলতান মুরাদ তার রাজত্ব এবং দুনিয়াবিমুখতা ত্যাগ করেননি। তিনি আরেকবার তার ছেলের হাতে রাজত্ব সঁপে দিয়ে ম্যাগনেশিয়ায় তার নির্জনবাসে ফিরে যান। যেভাবে বিজয়ী সিংহ তার আস্তানায় ফিরে যায়।

যে সমস্ত সুলতান ও রাজাগণ তাদের রাজত্ব, সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন। রাজত্বের আরাম আয়েশ এবং মানুষের কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনতা বেছে নিয়েছেন তাদের সবার কথাই ইতিহাস আমাদের জানিয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ আবার তাদের রাজত্বে ফিরে এসেছে; কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ব্যতীত এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যিনি দুইবার তার রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি ছোট এশিয়া মাইনর, যেখান থেকে তিনি চলে এসেছেন, সেখানে আর ফিরে যেতে চাননি। ফলে আদিয়ানোপলের জেনেসারি সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দাঙ্গা ফাসাদ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সুলতান মুহাম্মদ তখন ছিলেন একজন অল্পবয়সী, অপরিণত যুবক। সাম্রাজ্যের কিছু দায়িত্বশীলগণ এই ব্যাপারটি আরও ব্যাপক হওয়ার এবং বিপদ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। তারা আশঙ্কা করেন যেন অনিষ্ট আর না ছড়ায় এবং এর শোচনীয় পরিণাম না হয়। তাই তারা আবার সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের আবেদন জানান। সুলতান মুরাদ আবার ফিরে এসে তাদের লাগাম টেনে

[১৪৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. আব্দুস সালাম আবদুল আজিজ, পৃষ্ঠা : ২২।
[১৪৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. আবদুস সালাম আবদুল আজিজ, পৃষ্ঠা : ৪৬।
[১৪৯] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৪৭।

ধরেন।[১৫০] জেনেসারিরা তার সামনে মাথা নত করে। তিনি তার ছেলে মুহাম্মদকে আনাজুলের প্রশাসক বানিয়ে ম্যাগনেশিয়ায় পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসন ধরে রাখেন এবং যুদ্ধ ও বিজয়ের ভেতর জীবন কাটিয়ে দেন।[১৫১]

এক. মুরাদ এবং তার শায়ের, আলেম এবং ভালো কাজের প্রতি ভালোবাসা পোষণ

মুহাম্মদ হারব বলেন, 'দ্বিতীয় মুরাদ যদিও কবিতা কম লিখেছেন এবং আমাদের কাছে তার খুব কম কবিতাই আছে, তবে তিনি কবি, সাহিত্যিকগণকে সম্মান করতে কুণ্ঠাবোধ

[১৫০] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. আবদুস সালাম আবদুল আজিজ, পৃষ্ঠা : ৪৬।
[১৫১] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২৩।

করতেন না। তিনি কবিগণকে অনেক এনাম তথা পুরস্কার দিয়েছেন। কবিদের তিনি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন তাদের স্বরচিত কবিতা শোনানোর জন্য তার মজলিসে ডাকতেন। তাদের মাঝে এবং সুলতানের মাঝে নানা আলাপচারিতা এবং কথাবার্তা হতো। কেউ সমাদৃত হতো আবার কেউ অনুযোগের কবলে পড়ত। কেউ পছন্দনীয় হতো আবার কেউ বিতাড়িত হতো। অধিকাংশ সময় তিনি প্রতিভার পুরস্কার দিয়ে অথবা কোনো পেশা নির্ধারণ করে দিয়ে তাদের মধ্য হতে দরিদ্রদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিতেন। যেন তারা জীবিকার পেরেশানি থেকে মুক্ত হয়ে পুরোপুরিভাবে কবিতা রচনায় মনোযোগী হতে পারেন। তার সময়কাল অনেক কবিকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।'[১৫২]

রাজপ্রাসাদের আশপাশে বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষা একাডেমি ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, তৎকালীন কবিগণও জিহাদের ময়দানে সুলতানের সাথে থাকতেন।[১৫৩]

তার একটি কবিতা হচ্ছে, 'এসো সবাই জিকির করি আল্লাহ তাআলার/আমরা তো নই চিরস্থায়ী এই দুনিয়ার।'[১৫৪]

তিনি ছিলেন বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং বীর শাসক। তিনি হারামাইন শরিফের অধিবাসীদের জন্য তার সম্পদ থেকে প্রতি বছর তিন হাজার পাঁচশত দিনার দান করতেন। তিনি ইলমের, আলেমগণের এবং পির-মাশায়খগণের সম্মান করতেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তিনি তার রাজত্বকে সুবিন্যস্ত করেছেন। পথ-ঘাটকে নিরাপদ করেছেন। শরিয়ত এবং ধর্মের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর কাফের এবং নাস্তিকদের করেছেন নাস্তানাবুদ।[১৫৫]

তার সম্পর্কে ইউসুফ আসাফ বলেন, 'তিনি ছিলেন খোদাভীরু, একজন অদ্বিতীয় নায়ক। কল্যাণপ্রেমী এবং দয়া ও সহানুভূতিশীল।'[১৫৬]

দুই. তার মৃত্যু এবং অসিয়ত

আননুজুমুজ জাহিরাহ গ্রন্থকার ৮৫৫ হিজরিতে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন—

'তিনি সম্মান এবং মর্যাদার দিক দিয়ে তার সময়ের শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন। তার মাঝে ছিল বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা, দৃঢ়তা, সম্মানবোধ, বীরত্ব এবং নেতৃত্বের গুণ। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে তার জীবন নিঃশেষ করে দেন। বহু যুদ্ধে অংশ নেন। বহু যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। শত্রুকে পরাজিত করে বহু দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং কেল্লার অধিপতি হন।

[১৫২] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ২৪৬।
[১৫৩] প্রাগুক্ত।
[১৫৪] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুনা আল-কিতাবুল মুসাওয়ার,* পৃষ্ঠা : ৪৩।
[১৫৫] *তারিখুস সালাতিনি আলি উসমান লিল কিরমানি,* পৃষ্ঠা : ২৫।
[১৫৬] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ৫৫।

তিনি নফসের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তার অবস্থা ছিল তেমন যেমনটি কোনো এক বিজ্ঞ লোক বলেছিলেন। তাকে তার দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি গোনাহের মাধ্যমে তাকে বিচ্ছিন্ন করি আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা জোড়া দিই'। তাই তিনি আল্লাহর ক্ষমাশীলতা এবং মর্যাদার অধিক হকদার। তার রয়েছে অনেক প্রসিদ্ধ অবদান। ইসলামের সমৃদ্ধি এবং শত্রুকে কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে তার রয়েছে গৌরোবোজ্জ্বল ইতিহাস। তাই তার সম্পর্কে বলা হয়েছিল—'তিনি ছিলেন ইসলামের প্রাচীরস্বরূপ। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে জান্নাত দান করুন।'[১৫৭]

তিনি ৪৮ বছর বয়সে তার আদ্রিয়ানোপলের প্রাসাদে ইনতেকাল করেন। তার অসিয়ত অনুযায়ী তাকে বুরুসায় জামে মুরাদিয়ার পাশে সমাহিত করা হয়।

তিনি অসিয়ত করে যান, তার কবরের ওপরে যাতে কিছু নির্মাণ করা না হয়। আর তার কবরের পাশে কিছু ঘর নির্মাণ করতে বলেন। যার মধ্যে বসে হাফেজগণ কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সবশেষে তাকে জুমার দিন দাফন করতে বলেন। তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা হয়।[১৫৮]

তিনি তার অসিয়তনামায় কিছু কবিতা লিখে যান। তিনি বড় কবরে তার দাফন হওয়ার ভয় করতেন। তিনি চাইতেন তার দাফনের স্থলে যেন কিছু নির্মাণ করা না হয়। তাই তিনি এ সম্পর্কে কবিতা লিখে যান,

'মানুষ যেদিন দেখতে আসবে সেদিন যেন তারা সেখানে আমার মাটি দেখতে পায়।'[১৫৯]

সুলতান মুরাদ অনেক জামে মসজিদ এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক প্রাসাদ এবং খনি নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিন তলাবিশিষ্ট আদ্রিয়ানোপলের জামে মসজিদ। এই মসজিদের পাশে তিনি একটি মাদরাসা এবং সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন, যাতে তিনি ফকির মিসকিনদের খাওয়াতেন।[১৬০]

[১৫৭] *আননুযুমুজ জাহিরাহ* (৩/১২) জামালুদ্দিন আবুল মাহাসিন ইউসুফ বিন তুগরি।
[১৫৮] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুনা,* পৃষ্ঠা : ৪৩।
[১৫৯] *আলুসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ।*
[১৬০] *আসসালাতিনুল উসমানিয়্যুনা,* পৃষ্ঠা : ৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এবং কুসতানতিনিয়া বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ

[৮৫৫-৮৮৬হিজরি/১৪৫১-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ]

তিনি হলেন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ। যিনি ৮৩৩ হিজরি মোতাবেক ১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উসমানি শাসকদের ধারাবাহিকতায় তিনি ছিলেন সপ্তম শাসক। তার উপাধি আল-ফাতিহ তথা বিজয়ী এবং আবুল খায়রাত তথা কল্যাণের বাবা। তার প্রায় ত্রিশ বছরের রাজত্বকাল ছিল মুসলিমদের জন্য কল্যাণ এবং সম্মানের সময়।[১৬১] তার পিতার ইনতেকালের পর তিনি ৮৫৫ হিজরির ১৬ মুহাররম মোতাবেক ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার ন্যায় এবং ক্ষমতার মাঝে সমন্বয়কৃত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এভাবে তিনি কৈশোর থেকেই আমির-উমারাদের বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তার সমবয়সীদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। বিশেষভাবে তিনি সে সময়ের অনেক ভাষা জানতেন এবং ইতিহাস অধ্যয়নের প্রতি তুমুল আগ্রহী ছিলেন, যা তাকে পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিত্ব, রাজত্ব গঠনে এবং যুদ্ধের ময়দানে সাহায্য করেছে। অবশেষে তিনি কুসতানতিনিয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে মুহাম্মদ আল-ফাতিহ উপাধিতে ভূষিত হন।

বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ক্ষেত্রে তিনি তার পিতা এবং পূর্বপুরুষদের অনুসৃত নীতি মেনে চলেছিলেন। তিনি সালতানাতের ভার গ্রহণের পর উসমানি সাম্রাজ্য কর্তৃক অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলোতে ঘাঁটি নির্মাণের প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করেন। সম্পদের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সম্পদকে সঠিক কাজে ব্যয় করেন। এতে কোনো অপচয়, অহমিকা এবং বিলাসিতা করেননি। এভাবে সামরিক বাহিনীর উন্নয়নেও তিনি মনযোগী হন। তা পুনরায় ঢেলে সাজান এবং সৈন্যদের জন্য বিশেষ নিবন্ধনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

[১৬১] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ২৫৩।

তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক অঞ্চলের প্রশাসনিক-ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। পূর্বে অতিক্রান্ত অনেক প্রশাসক সেখানকার প্রশাসনিক-ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং অবহেলার অভিযোগ করেছিলেন। তিনি রাজত্বের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেন এবং উন্নত প্রশাসনিক ও সামরিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা সম্প্রসারণ করেন; যা রাজত্বের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রাজত্বের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের অধ্যায় শেষ করে তিনি ইউরোপের খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য বিজয়ের এবং তাতে ইসলামের প্রচার-প্রসারের দিকে ব্রতী হন। তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি উপাদান তাকে সাহায্য করেছে। তার মধ্য হতে একটি হলো, অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষের ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়া। এমনকি সেখানকার প্রতিটি অঞ্চল এবং শহরের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাও। কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ এতেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কুসতানতিনিয়া বিজয়ের মাধ্যমে তার বিজয় অভিযানগুলো মাথায় মুকুট পরানোর জোরদার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রুসেডীয় শক্তিদের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র অনেক আগে থেকেই চলছিল। এ কাজে দীর্ঘদিন থেকেই খ্রিষ্টানরা ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল আর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছিল। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এ সাম্রাজ্য বিজয় করে কুসতানতিনিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী বানিয়ে নেন এবং তার পূর্ববর্তী ইসলামি সেনাপতিগণ যা পারেননি তা তিনি করে দেখান।[১৬২]

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

কুসতানতিনিয়াকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম কনস্টান্টিন-এর হাতে এ শহরের গোড়াপত্তন হয়।[১৬৩] বিশ্ব মানচিত্রে এর অবস্থান ছিল অতুলনীয়। এমনকি এ শহর সম্পর্কে বলা হয়েছে—'যদি সারা দুনিয়া শুধু একটি রাষ্ট্র হতো, তাহলে কুসতানতিনিয়া হতো সে রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য শহর।'[১৬৪]

এ শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই একে বাইজেন্টাইনরা তাদের রাজধানী বানিয়ে নিয়েছে। বিশ্বের বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।[১৬৫] মুসলিমরা যখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়, সে লড়াইয়ে এ শহরের

[১৬২] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাতি,* পৃষ্ঠা : ৪৩।
[১৬৩] *উরুবা ফিল উসুরিল উস্তা,* সাইদ আশুর, পৃষ্ঠা : ২৯।
[১৬৪] *ফাতহুল কুসতানাতিনিয়া ওয়া সিরাতুস সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* ড. মুহাম্মদ মোস্তফা পৃষ্ঠা : ৩৬-৪৬।
[১৬৫] *আল-মুজতামাউল মুদুনি,* (আল-জিহাদু যিদ্দাল মুশরিকিন) ড. আকরাম জিয়া আল-উমারি, পৃষ্ঠা : ১১৫।

গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এ জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক জায়গায় তার সাহাবিগণকে এ শহর বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। এর মধ্য হতে একটি হলো, যা খন্দকের যুদ্ধের সময় ঘটেছিল।[১৬৬] এ জন্য বিভিন্ন যুগের অতিক্রমকালে মুসলিম খলিফা এবং সেনাপতিগণ এ শহর বিজিত করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিস তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়—'অবশ্যই কুসতানতিনিয়া এক ব্যক্তির হাতে বিজিত হবে। সেই শাসক কতইনা উত্তম আর সে বাহিনী কতইনা উত্তম বাহিনী।'[১৬৭]

এ জন্যই সেই ৪৪ হিজরি থেকেই মুসলিমদের অভিযানের শুরুর দিকে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকেই মুসলিম মুজাহিদদের এ শহরের দিকে অভিযান শুরু হয়; কিন্তু সে অভিযান সফল হয়নি। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে এ শহরে আরেকটি অভিযান হয়, তবে ফলাফল হয় একই।

এভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্য কুসতানতিনিয়া বিজয়ের জন্য আরেকটি আক্রমণ পরিচালনা করে। এটিকে এ শহরের ওপর উমাইয়্যাদের সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণ হিসেবে ধরা হয়। এ আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল ৯৭ হিজরিতে সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের শাসনকালে।[১৬৮]

এ শহরের বিরুদ্ধে অভিযান চলতেই থাকে। এ ধারাবাহিকতায় প্রথম আব্বাসীয় শাসকের যুগেও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জোরদার হামলা হয়; কিন্তু তারা কুসতানতিনিয়ার সীমান্ত পর্যন্তও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তা সত্ত্বেও এ হামলা শহরকে কাঁপিয়ে দেয় এবং এর অভ্যন্তরে ভীতির সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে ওই আক্রমণ যা ১৯০ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে সম্পন্ন হয়।[১৬৯]

এরপর এশিয়া মাইনরের আরও কয়েকটি সাম্রাজ্য এভাবে অভিযান পরিচালনা করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সালজুক সালতানাত। এ ধারাবাহিকতায় সালজুক শাসক আলপ আরসালান (৪৫৫-৪৬৫ হিজরি/১০৬৩-১০৭২ খ্রিষ্টাব্দ) রোমের সম্রাট দিমুনুসকে ৪৬৪ হিজরি মোতাবেক ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে মিলাযকারদ নামক স্থানে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এরপর তাকে বন্দি করে, প্রহার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এর কিছুদিন পর সালজুক সুলতানের কাছে বাৎসরিক জিযিয়া প্রদানের শর্তে তাকে মুক্ত করে দেন। এর মাধ্যমে রোমের সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ সালজুক সালতানাতের কাছে মাথানত করে। সালজুকদের বৃহৎ সালতানাত দুর্বল হয়ে যাওয়ার

[১৬৬] *মুসনাদে আহমাদ,* ৪/৩৩৫।
[১৬৭] প্রাগুক্ত।
[১৬৮] *ইবনে খালদুন আল-ইবর,* ৩/৭০, *তারিখু খলিফাতি ইবনি খাইয়্যাত,* পৃষ্ঠা : ৩১৫।
[১৬৯] *খলিফাতু ইবনু খাইয়্যাত, তারিখুহু,* ৪৫৮ পৃষ্ঠা, তারিখুত তবারি, ৬০/১০, *আল-কামিলু লিইবনিল আসির,* ৬/১৮৫-১৮৬।

পর আরও কয়েকটি খণ্ড খণ্ড সালজুক সালতানাতের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্য হতে একটি হচ্ছে এশিয়া মাইনরে রোমের সালজুক সালতানাত। যারা তাদের রাজত্বকে পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তার করতে এবং রোমান সাম্রাজ্যকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়।

অষ্টম হিজরি শতাব্দী আর চতুর্দশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে উসমানিরা রোমের সালজুকদের পেছনে ফেলে দেয়।[১৭০] তারা কুসতানতিনিয়া বিজয়ের জন্য নতুন করে আক্রমণ করতে থাকে। এর সূত্রপাত হয় সুলতান বায়েজিদ (যার উপাধি ছিল ঘূর্ণিঝড়)-এর শাসনকালে। তার সামরিক শক্তি ৭৯৬ হিজরি মোতাবেক ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ শহরকে মজবুতভাবে অবরোধ করতে সক্ষম হয়।[১৭১]

সুলতান বায়েজিদ বাইজেন্টাইন সম্রাটকে শান্তিপূর্ণভাবে শহর ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু সে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিরোধে ইউরোপীয়দের সাহায্য লাভের চেষ্টায় এই আহ্বান এড়িয়ে চলে এবং গড়িমসি করতে থাকে। সে সময় তৈমুর লং পরিচালিত মোঙ্গলীয় সেনাবাহিনী উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে সুলতান বায়েজিদ তার সামরিক শক্তি হটিয়ে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন। যেন তিনি বাকি উসমানি সৈন্যদের নিয়ে মোঙ্গলীয়দের মুখোমুখি হতে পারেন। এখানেই তাদের মাঝে আঙ্কারার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেই সুলতান বায়েজিদ বন্দি হন; এরপর বন্দি অবস্থায় ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৭২] ফলে উসমানি সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। কুসতানতিনিয়া বিজয়ের পরিকল্পনা পিছিয়ে যায় বহুদূরে।

সাম্রাজ্যের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। এরই মাঝে জিহাদের প্রাণ নতুন করে ফিরে আসে। সুলতান মুরাদের সময়কালে, যিনি ৮২৪-৮৬৩হিজরি/১৪২১-১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার সময়ে কয়েকবার কুসতানতিনিয়া বিজয়ের চেষ্টা করা হয়। এ সময় উসমানি সেনাবাহিনী একাধিকবার কুসতানতিনিয়া অবরোধে সক্ষম হয়। এ সময়ে বাইজেন্টাইন সম্রাট উসমানি সাম্রাজ্যের উসমানিদের মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টায় রত ছিলেন। এই কাজে সে সুলতানের অবাধ্যাচারীদের ব্যবহার করেছিল।[১৭৩] এভাবে সে তার উদ্দেশ্যে সফল হয়। ফলে উসমানিরা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সময়ে তাদের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল হতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের শাসনামলেই তা সম্ভব হয়।

[১৭০] *ক্বিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৪৬।
[১৭১] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ১৮।
[১৭২] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* ড. আবদুল আজিজ আল-উমারি, পৃষ্ঠা : ৩৫৮।
[১৭৩] প্রাগুক্ত।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার পিতার জীবদ্দশায় রাজকীয় কার্যক্রমের সাথে থাকতেন। তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন স্থানে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের কুসতানতিনিয়া বিজয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এমনকি পূর্বের বিভিন্ন ইসলামি সাম্রাজ্যগুলো কর্তৃক পরিচালিত অভিযানগুলোর কথাও জানতেন। এর প্রেক্ষিতেই তিনি ৮৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে[১৭৪] ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে কুসতানতিনিয়ার দিকে লক্ষ রাখতে শুরু করেন এবং তা বিজয়ের পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন। এতে বিরাট ভূমিকা রাখে ইসলাম, ইমান এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার প্রতি আলেমগণ কর্তৃক সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের তত্ত্বাবধান। এ জন্যই সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইসলামি শরিয়াহকে আবশ্যক করেছিলেন। তাকওয়া এবং খোদাভীরুতার গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন। তিনি ইলম এবং আহলে ইলমকে ভালোবাসতেন। ইলমের সমৃদ্ধিতে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তার পিতার নির্দেশনায় আলেমগণ সুলতান মুহাম্মদের তত্ত্বাবধান করেন। তাকে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ করে তোলেন। দুনিয়াবিমুখ বড় বড় আলেমগণ, যারা নফসের সাথে জিহাদ করতেন তারাই সুলতানের দেখভাল করেছেন।[১৭৫]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার বাল্যকাল থেকেই আল্লাহওয়ালা আলেমগণের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, 'শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাইল আল-কাওরানি'। তার মর্যাদার কথা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি মুহাম্মদ আল-ফাতিহের পিতা দ্বিতীয় মুরাদের সময়ে তার শিক্ষক ছিলেন। সে সময়ে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ম্যাগনেশিয়ার প্রশাসক ছিলেন। তার পিতা তার কাছে বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রেরণ করেছিলেন; কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তাদের আদেশ মানেননি এবং কিছুই পড়েননি। এমনকি তিনি কুরআন কারিম পর্যন্তও সমাপ্ত করেননি। তাই সুলতান মুরাদ এমন একজন ব্যক্তিকে তালাশ করছিলেন যার গাম্ভীর্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে। তখন তারা শায়খ কাওরানির নাম উল্লেখ করে। সুলতান মুরাদ তাকে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তার কথা না শুনলে প্রহার করার জন্য তাকে একটি বেত-ও দিয়ে দেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদের কাছে হাতে লাঠি নিয়েই যান। তাকে বলেন, 'তোমার পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে জ্ঞান শেখানোর জন্য এবং আমার আদেশের বিরোধিতা করলে তোমাকে প্রহার করার জন্য। এ কথা শুনে সুলতান মুহাম্মদ মৃদু হাসেন। তখন সেখানেই শায়খ কাওরানি তাকে বেদম প্রহার করেন। সুলতান মুহাম্মদ ভয় পেয়ে যান এবং অল্প কদিনের মাঝেই কুরআন খতম করেন।[১৭৬]

[১৭৪] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* ড. আবদুল আজিজ আল-উমারি, পৃষ্ঠা : ৩৫৯।
[১৭৫] *তারিখুদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা,* ড. আলি হুসুন, পৃষ্ঠা : ৪২।
[১৭৬] *কিতাবুশ শাকায়িকিন নোমানিয়্যাহ ফি উলামায়িদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৫২, তারিখে দাওলাতে উসমানিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করে, পৃষ্ঠা : ৪৩।

এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। আর সে সকল সম্মানিত মুরব্বি আলেমগণ, বিশেষ করে উল্লিখিত এই সম্মানিত আলেম যদি সুলতানদের দ্বারা শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ হতে দেখতেন, তাহলে সুলতানের আদেশ অমান্য করতেন এবং তার অনুগত হতেন না। তিনি সুলতানকে নাম ধরে ডাকতেন। মোসাফাহার সময়ে সুলতানই তার হাতে চুম্বন করতেন। তাই তাদের মধ্য হতে মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতো মহৎ লোকের আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিকই ছিল। শায়খ কাওরানি ছিলেন শরিয়তের বিধান মান্যকারী, আদেশ-নিষেধ অনুসরণকারী এবং তার গুরুত্ব প্রদানকারী। প্রথমে নিজের ওপর শরিয়তের আদেশ প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে প্রজাদের ওপর প্রয়োগ করতেন। তিনি ছিলেন মুত্তাকি, এবং সৎলোক। তিনি আলেম এবং নেককার বান্দাদের কাছে দোয়া চাইতেন।[১৭৭]

সুলতান মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বগঠনে শায়খ আক শামসুদ্দিনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি বাল্যকাল থেকে সুলতানের অন্তরে দুটি বিষয় ঢেলে দেন—

১. উসমানিদের জিহাদিশক্তি বৃদ্ধি ।

২. বাল্যকাল থেকেই সর্বদা সুলতানকে অনুপ্রাণিত করতেন এই বলে, তিনিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের উদ্দেশিত ব্যক্তি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> 'কনস্টান্টিনোপল অচিরেই বিজিত হবে। সে শাসক কতইনা উত্তম! আর সে বাহিনী কতইনা উত্তম বাহিনী!।'[১৭৮]

এ জন্য সুলতান ফাতিহ চাইতেন যেন তার ওপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত হাদিসটি বাস্তবায়িত হয়।[১৭৯]

এক : বিজয় অভিযানের জন্য তার প্রস্তুতি

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়া বিজয়ের জন্য তার চেষ্টা অব্যহত রাখেন এবং নানা পরিকল্পনা ও ফন্দি আঁটতে থাকেন। এ লক্ষ্যে তিনি উসমানি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী এবং সুঠাম সৈনিকদের মাধ্যমে শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেন। সৈন্যসংখ্যা পৌঁছে যায় প্রায় এক মিলিয়নের চার ভাগের এক ভাগে।[১৮০] তৎকালীন যে কোনো সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর তুলনায় এটা ছিল বিরাট একটি সংখ্যা। অনুরূপ তিনি সেই

[১৭৭] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* ড. আলি হুসুন, পৃষ্ঠা : ৪৩।
[১৭৮] *মুসনাদে আহমদ,* পৃষ্ঠা : ৩৩৫/৪।
[১৭৯] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৫৯।
[১৮০] *তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়াতিল উসমানিয়্যাহ,* মুহাম্মদ ফরিদ বেক, পৃষ্ঠা : ১৬১।

বিশাল সংখ্যাকে নানা যুদ্ধবিদ্যাও রপ্ত করিয়েছিলেন। তাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধজয়ের লক্ষ্যে পরিপূর্ণভাবে গঠন করার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও শিখিয়েছেন। এভাবেই সুলতান ফাতিহ তাদেরকে মৌলিক এবং আক্ষরিকভাবে গঠন করেছেন এবং তাদের অন্তরে জিহাদের বীজ বপন করে দিয়েছেন। তাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুসতানতিনিয়া বিজয়ী সৈন্যদলের প্রশংসার কথা। হয়তো তারাই হবে সেই উদ্দেশিত সৈন্যদল। কারণ, তাদের দেওয়া হয়েছিল আক্ষরিক অর্থেই শক্তি এবং বিভিন্ন দিকের বীরত্ব। এভাবে সৈন্যদলের মাঝে আলেমদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে এবং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রকৃত জিহাদে তাদেরকে উৎসাহী করতে ব্যাপক সহায়ক হয়েছে।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইউরোপের বসফরাস প্রণালির সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশে রুমলি দুর্গ নির্মাণ করেন। যার অবস্থান ছিল সুলতান বায়েজিদের আমলে সে অঞ্চলের এশিয়ার স্থল ভাগে যে দুর্গ নির্মাণ হয়েছিল তার বিপরীতে। বাইজেন্টাইন সম্রাট সম্পদের বিনিময়ে চুক্তির মাধ্যমে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহকে দুর্গ নির্মাণ থেকে হটানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এই স্থানের সামরিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি দুর্গ-নির্মাণ অব্যহত রাখেন। তিনি বেশ উঁচু এবং সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। তার উচ্চতা পৌঁছে যায় ৮২ মিটারে। দুইটি দুর্গের অবস্থান পাশাপাশি হয়ে যায়। তাদের মাঝে দূরত্ব ছিল মাত্র ৬৬০ মিটার। উভয়টিই বসফরাস প্রণালির উত্তর থেকে পশ্চিমে জাহাজ অতিক্রম করতে বাধাপ্রদান করত। উভয় কেল্লার কামানের আগুন পূর্বদিকের তারাবাজুন প্রভৃতি রাজ্যসমূহ থেকে আগত যে কোনো জাহাজকে কুসতানতিনিয়ায় পৌঁছানো থেকে রুখে দিতে সক্ষম ছিল। যেসব রাজ্য প্রয়োজনের সময়ে কুসতানতিনিয়ার সাহায্য করতে পারত।[১৮১]

(ক) প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের ব্যাপারে সুলতানের গুরুত্ব প্রদান

কনস্টান্টিনোপল জয় করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় অস্ত্র যোগাড়ের ব্যাপারে সুলতান বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষভাবে কামানের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ জন্য তিনি একজন হাঙ্গেরি প্রকৌশলীকে ডাকেন। যার নাম ছিল উরবান। কামান বানানোর ক্ষেত্রে সে দক্ষ ছিল। সুলতান তাকে উত্তমভাবে স্বাগতম জানান এবং তার জন্য সকল সম্পদ, উপকরণ এবং লোকবল দিয়ে সাহায্য করেন। এই প্রকৌশলী কয়েকটি বিশাল বিশাল কামান নির্মাণ করেন। যার মধ্যে সবার ওপরে ছিল প্রসিদ্ধ শাহী

[১৮১] *সালাতিনু আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ২৬।

কামান। যার ওজন ছিল কয়েকশ টন এবং যা নড়ানোর জন্য কয়েকশ ষাঁড়ের প্রয়োজন হতো। সুলতান নিজেই এই কামান নির্মাণ এবং তার চালনার তত্ত্বাবধান করেছেন।[১৮২]

(খ) নৌবহরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

সুলতানের এ সমস্ত প্রস্তুতির সাথে বিশেষভাবে যোগ হয় উসমানি সাম্রাজ্যের নৌ বহরের প্রতি সুলতান যে বিশেষ লক্ষ রেখেছিলেন সে কথা। বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ বৃদ্ধি করে তিনি এ নৌবহরকে শক্তিশালী করেছিলেন, যেন তা কুসতানতিনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যোগ্য হতে পারে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলো নৌবাহিনী ছাড়া পুরোপুরিভাবে অবরোধ করা সম্ভব ছিল না। এতে নৌবাহিনীর ছিল বিরাট ভূমিকা। জানা যায় এ লক্ষ্যে যে-কটি যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করা হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল চারশত।[১৮৩]

(গ) চুক্তি সম্পাদন

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণের পূর্বে তার বিভিন্ন শত্রুরাজ্যের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। যাতে করে তিনি এক শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি কুসতানতিনিয়ার পূর্ব সীমান্তের প্রতিবেশী গাল্টা রাজ্যের সাথে চুক্তি করেন। অনুরূপ তিনি কুসতানতিনিয়ার ইউরোপীয় প্রতিবেশী রাজ্য হাঙ্গেরী এবং ভেনিসের সাথেও চুক্তি করেন; কিন্তু যখন কুসতানতিনিয়ার ওপরে মূল হামলা শুরু হয়, তখন এই সন্ধি স্থির থাকেনি। যুদ্ধ শুরু হলে ওই সমস্ত অঞ্চলের সৈন্যরা কুসতানতিনিয়ার পক্ষে যুদ্ধে নেমে যায়।[১৮৪] খ্রিষ্টানদের সাথে তাদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের কারণে তারা মুসলিমদের সাথে করা চুক্তি ও ওয়াদা ভুলে যায়।

সুলতান মুহাম্মদ যখন এই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন বাইজেন্টাইন সম্রাট নানা উপহার, উপঢৌকন পেশ করার মাধ্যমে সুলতানকে তার লক্ষ্য থেকে সরানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে। সুলতানের কোনো কোনো পরামর্শদাতাকে তারা ঘুষ প্রদান করে, যেন তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়।[১৮৫]

কিন্তু সুলতান তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অটল থাকেন। এ সমস্ত কারণ তাকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বাইজেন্টাইন সম্রাট যখন উসমানি সুলতানের লক্ষ্য পূরণের দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য এবং শহরের

[১৮২] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৬১।
[১৮৩] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* সালিম আররশিদি, পৃষ্ঠা : ৯০।
[১৮৪] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ৫৮।
[১৮৫] *ফাতহুল কুসতানতানিয়্যাহ,* মুহাম্মদ সাফওয়াত, পৃষ্ঠা : ৬৯।

কাছে সাহায্য কামনা করেন। তাদের মধ্যে এগিয়ে থাকে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের পোপ। সে সময় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে কয়েকটি গির্জা ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল কুসতানতিনিয়ার গির্জা। যা ছিল অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের অধীনে। আর ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের মাঝে ছিল তুমুল শত্রুতা। বাইজেন্টাইন সম্রাট ক্যাথলিক পোপকে তোষামোদ করতে বাধ্য হন, যেন তিনি তার নিকটবর্তী হতে পারেন এবং পূর্বাঞ্চলের অর্থোডক্স গির্জাগুলোকে এক করে পোপের অনুগত করার মাধ্যমে তার প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করেন। অথচ তখন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা এ কাজে মোটেই আগ্রহী ছিল না। বাইজেন্টাইন সম্রাটের এ কথার ওপর ভিত্তি করে পোপ কুসতানতিনিয়ায় তার দূত প্রেরণ করেন। সে এসে হাজিয়া সুফিয়া গির্জায় বক্তব্য প্রদান করে, পোপের জন্য প্রার্থনা করে এবং দুই গির্জার এক হওয়ার কথা ঘোষণা করে। তখন শহরের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। ক্যাথলিক সম্রাটের এ কাজ তার বিরুদ্ধে অর্থোডক্সের বিরুদ্ধাচারণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কোনো কোনো অর্থোডক্স খ্রিষ্টান নেতা এ-ও বলেছিল যে, 'আমরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ল্যাটিনদের টুপি দেখার চেয়ে তুর্কিদের পাগড়ি দেখাকেই উত্তম মনে করি'।[১৮৬]

দুই : অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ

কনস্টান্টিনোপল ছিল তিন দিক দিয়ে সামুদ্রিক জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। বসফরাস প্রণালি, মারমারা সমুদ্র এবং গোল্ডেন হর্ন। যা রক্ষিত ছিল বিশাল শিকল দ্বারা, তা কনস্টান্টিনোপলে জাহাজ প্রবেশ করতে বাধাপ্রদান করত। এর পাশাপাশি মারমারা সমুদ্রের স্থল ভাগ থেকে নিয়ে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত দুইটি প্রাচীর ছিল। দুই প্রাচীরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে লায়কুস নদী। দুই প্রাচীরের মাঝে ৬০ কদমের মতো ফাঁকা জায়গা ছিল। এর মধ্য হতে ভিতরের প্রাচীরটি অন্যটির তুলনায় চল্লিশ ফুট উঁচু ছিল। তার ওপরে কিছু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ছিল। যেগুলোর উচ্চতা ছিল ষাট ফুট। আর বাহিরের দিকের প্রাচীরটি উচ্চতায় ছিল পঁচিশ ফুট। তার ওপরেও অনেকগুলো পৃথক পৃথক সৈন্যভর্তি টাওয়ার ছিল।[১৮৭] এর সাথে সাথে কনস্টান্টিনোপলকে সামরিক অবকাঠামোর দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত শহর মনে করা হতো। কারণ, তার প্রাকৃতিক অবস্থানগত অবকাঠামোর সাথে তাতে আরও ছিল এই প্রাচীর, কেল্লা এবং দুর্গসমূহ। তাই এ শহরের ওপর হামলা করা ছিল বেশ কঠিন। এ জন্যই এ শহরের ওপর আগের দশের অধিক আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল। তন্মধ্যে এগারটি আক্রমণই পরিচালিত হয়েছিল পূর্বেকার ইসলামি সাম্রাজ্যগুলো কর্তৃক।

[১৮৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি,* পৃষ্ঠা : ৮৯।
[১৮৭] *সালাতিনু আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ২, *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৯২।

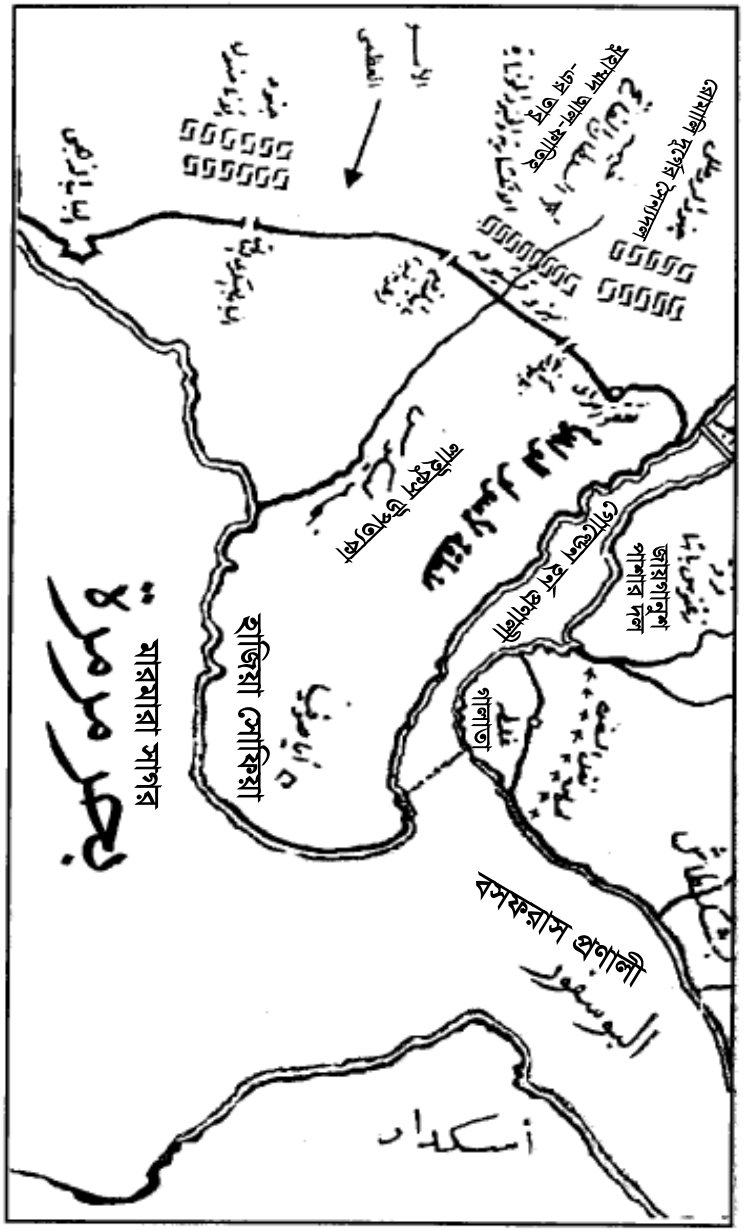

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তার খবরাখবর নিচ্ছিলেন এবং তা অবরোধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুত করছিলেন। অনুরূপ তিনি নিজেই কনস্টান্টিনোপলের দুর্গ প্রাচীরসমূহ পরিদর্শন করেছিলেন।[১৮৮] সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ আদ্রিয়ানোপল এবং কনস্টান্টিনোপলের মাঝে সড়ক নির্মাণ করেছিলেন, যেন তার মাধ্যমে শাহী কামানগুলো কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। দুই মাসে কামানগুলো আদ্রিয়ানোপল থেকে কনস্টান্টিনোপলের নিকটে পৌঁছায়। এর মাঝে উসমানিদের সেনাপ্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে যায়। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ নিজেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করে তাদেরকে নিয়ে ৮৫৭ হিজরির ২৬ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল কনস্টান্টিনোপলের সীমান্তে উপনীত হন। তার সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার। তিনি সেখানে এক শক্তিশালী বক্তব্য প্রদান করেন—যা সৈন্যদেরকে জিহাদের প্রতি এবং আল্লাহ তাআলার কাছে বিজয় অথবা শাহাদাত কামনায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তার বক্তব্যে কুরবানি এবং দু-পক্ষের মুখোমুখি লড়াইয়ের সত্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদের সামনে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কুরআনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন। অনুরূপ তাদেরকে শোনান কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সুসংবাদ প্রদানকারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস এবং এ শহর বিজয়কারী সেনাবাহিনী ও তাদের নেতার মর্যাদার কথা। এ শহর বিজিত হলে ইসলাম এবং মুসলিমদের যে সম্মান অর্জিত হবে তাও তিনি তুলে ধরেন। এ বক্তব্য শোনে মুজাহিদরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।[১৮৯]

মুজাহিদগণের কাতারে কাতারে উলামায়ে কেরাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, যা সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধিতে প্রভাব রেখেছে। ফলে প্রত্যেক সৈনিক অধৈর্য হয়ে লড়াইয়ের অপেক্ষা করছিল, যেন তারা তাদের ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করতে পারে।[১৯০]

পরদিন সুলতান শহরের বাহিরের প্রাচীরের সম্মুখে তার সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। তাদের অগ্রভাগে ছিল তিনটি প্রধান বাহিনী। যারা বিভিন্ন দিক থেকে স্থলভাগ অবরোধ করতে সক্ষম হয়। সুলতান এই প্রধান বাহিনীর পেছনে একটি সতর্কতামূলক বাহিনীও রাখেন। প্রাচীরের সামনে কামান স্থাপন করেন। তার মধ্য হতে সবচেয়ে বড় শাহী কামানকে স্থাপন করা হয় বাবে তিব্বে কাবির সামনে। এভাবে শহরের নিকটের উঁচু জায়গাগুলোতে তিনি পাহারাদার বাহিনী নিযুক্ত করেন। তখনই শহরের জলভাগে উসমানি নৌবহরের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়; কিন্তু তারা সেই বিশাল শিকলের কারণে গোল্ডেন হর্ন অতিক্রম করতে পারেনি। শিকলটি যেকোনো জাহাজকেই

[১৮৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি,* (৮২ পৃষ্ঠা), ফাতহুল কুসতানতিনিয়া, মুহাম্মদ সাফওয়াত, পৃষ্ঠা : ৫৭।
[১৮৯] *সালাতিনু আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ২৪,২৫।
[১৯০] *আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৬৪।

কনস্টান্টিনোপল প্রবেশে বাধা দিত; বরং তাদেরকে শহরের কাছে ঘেঁষতেই দিত না। তবে উসমানি নৌবহর মারমারা সমুদ্রে সেখানকার রাজকীয় নৌবহরের ওপর আধিপত্য লাভে সক্ষম হয়।[১৯১]

বাইজেন্টাইনরা কুসতানতিনিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করে। তারা প্রাচীরের ওপরে সৈন্য মোতায়েন করে। তাদের দুর্গগুলো মজবুত করে। আর উসমানি সৈন্যরাও শহর দখলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকে। আক্রমণকারী উসমানি সেনাবাহিনী আর প্রতিহতকারী বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর মাঝে লড়াই সংঘটিত হওয়ার জন্য আর কোনো প্রতিবন্ধকতা বাকি রইল না। শাহাদাতের দরজা খুলে গেল। উসমানি সৈন্যদের বিরাট একটি অংশ-বিশেষ করে প্রাচীরের নিকটে নিয়োজিত সৈন্যরা প্রাচীর দখলে সফল হয়।

উসমানি সেনাবাহিনীর কামান বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। কামানের গোলার শেল এবং আওয়াজে বাইজেন্টাইনদের পিলে চমকে যায়। উসমানি সৈন্যরা কোনো কোনো দিক দিয়ে প্রাচীর দখলে সক্ষম হয়; কিন্তু প্রতিহতকারীরা খুব দ্রুতই সেখানে পুনরায় প্রতিরোধ স্থাপন করে।

ইউরোপের খ্রিষ্টানদের সহযোগিতা থেকে বাইজেন্টাইনরা বঞ্চিত হয়নি। জেনোয়া থেকে পাঁচ জাহাজ-ভর্তি সাহায্য তাদের নিকটে পৌঁছায়। তাদের নেতৃত্বে ছিল জেনোয়ার সেনাপতি জোস্তানিয়ান। তার সাথে ছিল ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের বাধ্যগত সাতশ সৈন্য। তাদের জাহাজগুলো অবরোধকারী উসমানি জাহাজগুলোর সাথে সামুদ্রিক লড়াইয়ে মুখোমুখি হওয়ার পরেও বাইজেন্টাইনের প্রাচীন রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। তাদের এভাবে পৌঁছানোর ফলে বাইজেন্টাইনদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তারা এ বাহিনীর প্রধান জোস্তানিয়ানকে শহর প্রতিরোধকারী বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে।[১৯২]

এদিকে উসমানি নৌবাহিনী সেই বিশাল শিকল পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যহত রাখে, যা তাদেরকে গোল্ডেন হর্ন অতিক্রম করে কুসতানতিনিয়ার জলভাগে ইসলামি নৌ বহরের প্রবেশে বাধা প্রদান করছিল। তাই তারা ইউরোপীয় এবং বাইজেন্টাইন নৌজাহাজগুলোর ওপরে তির নিক্ষেপ শুরু করে; কিন্তু তারা শুরুভাগে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। ফলে শহর প্রতিরোধকারীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।[১৯৩]

খ্রিষ্টান যাজকরা ক্লান্ত না হয়ে শহরের পথে পথে, বিভিন্ন দুর্গে গিয়ে খ্রিষ্টানদের ধৈর্য ধরতে এবং অটল থাকতে বলে। তারা সাধারণ জনগণকে গির্জায় গিয়ে মসিহের কাছে এবং কুমারী মেরির কাছে শহরের মুক্তির প্রার্থনা করতে উৎসাহ দেয়। এ উদ্দেশ্যে বাইজেন্টাইন সম্রাট নিজেই হাজিয়া সুফিয়া গির্জায় বারবার আসা যাওয়া করতে থাকে।[১৯৪]

[১৯১] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৯৮, আল-উসমানিয়্যুনা ওয়াল বলকান, পৃষ্ঠা : ৮৯।
[১৯২] *আল-উসমানিয়্যুনা ওয়াল বলকান,* ড. আলি হুসুন, পৃষ্ঠা : ৯২।
[১৯৩] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি,* পৃষ্ঠা : ১২০।
[১৯৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি,* পৃষ্ঠা : ১০০।

তিন : মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এবং বাইজেন্টাইনদের মাঝে সংলাপ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের নেতৃত্বে উসমানি মুজাহিদগণ শহরের ওপর আক্রমণ অব্যহত রাখে এবং বাইজেন্টাইনরাও বীরত্বের সাথে তাদের প্রতিরোধে অনড় থাকে। যে কোনো কৌশলেই বাইজেন্টাইন সম্রাট তার শহরকে যুদ্ধমুক্ত করতে তৎপর ছিলেন, তাই সে সুলতানের সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে। যেন তিনি সম্পদ অথবা আনুগত্যের বিনিময়ে পিছু ফিরে যেতে প্রলুব্ধ হন। এমনই আরও কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়; কিন্তু এই প্রস্তাবের বিপরীতে সুলতান ফাতিহ রাহিমাহুল্লাহু পুরোপুরিভাবে শহরকে হস্তান্তর করার কথা বলেন।[১৯৫] তাহলে তিনি শহর এবং গির্জার কোনো অধিবাসীকেই কষ্টের মুখে ফেলবেন না। সুলতানের প্রেরিত চিঠির সারসংক্ষেপ ছিল এমন—

> *'তোমাদের সম্রাট যেন কনস্টান্টিনোপলকে হস্তান্তর করে দেয় এবং আমি শপথ করছি, আমার কোনো সৈন্য কারও জান, মাল এবং সম্পদে হস্তক্ষেপ করবে না। যারা চায় তারা শহরে থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। আর যারা চায় তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখান থেকে চলে যেতে পারবে'।*[১৯৬]

গোল্ডেন হর্ন প্রণালি বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীর হাতে থাকায় অবরোধ অসম্পূর্ণ ছিল। তা সত্ত্বেও উসমানি সেনাবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ অব্যহত ছিল। জেনোসারি সৈন্যরা অতুলনীয় এবং দুর্লভ বীরত্ব প্রদর্শন করে। তারা কোনো ভয়-ডর ছাড়াই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। ১৮ এপ্রিলে[১৯৭] উসমানি বাহিনীর কামান বাইজেন্টাইন প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্তে লাইকুস উপত্যাকার নিকটে একটি ফাটল তৈরিতে সক্ষম হয়। ফলে উসমানি সৈন্যরা বীরত্বের সাথে সেই ফাটল দিয়ে আক্রমণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে তারা সিঁড়ির মাধ্যমে অন্যান্য দিকের প্রাচীর টপকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জোস্তানিয়ানের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইন সৈন্যরা তাদের প্রাচীর এবং ফাটল রক্ষায় অটল থাকে। দু-পক্ষের সংঘর্ষ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কামান কর্তৃক সৃষ্ট সেই ফাটল ছিল খুবই সংকীর্ণ; কিন্তু মুসলিমদের তির-তূণীর এবং শক্তি অধিক হওয়া এবং শত্রুপক্ষের সংকীর্ণতা, দুরাবস্থা এবং চোখে অন্ধকার দেখা সত্ত্বেও মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার আক্রমণকারী সৈন্যদলকে পিছু ফিরে যেতে বলেন। তবে এর আগে তিনি তার শত্রুদের অন্তরে তৈরি করেছিলেন তাদের ভীতি। তারা আক্রমণের আরেকটি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।[১৯৮]

[১৯৫] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান,* পৃষ্ঠা : ৫৮।
[১৯৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* আবদুস সালাম ফাহমি, পৃষ্ঠা : ৯২।
[১৯৭] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৬৭।
[১৯৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* আবদুস সালাম ফাহমি, পৃষ্ঠা : ১২৩।

সেদিনই উসমানি নৌবাহিনীর কয়েকটি জাহাজ প্রতিবন্ধক শিকলকে গুড়িয়ে দিয়ে গোল্ডেন হর্ন প্রণালি অতিক্রমের চেষ্টা করে; কিন্তু বাইজেন্টাইন ও ইউরোপীয়দের সম্মিলিত নৌশক্তি এবং শিকলের পেছনে অবস্থানকারী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা উসমানিদের নৌযানগুলো প্রতিরোধে এবং কয়েকটি জাহাজ গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে বাকি জাহাজগুলো তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।[১৯৯]

চার : নৌবাহিনীর প্রধানকে বরখাস্ত করা এবং সুলতান ফাতিহের বীরত্ব

এ সংঘর্ষের দুই দিন পরেই উসমানি নৌবাহিনী এবং কিছু ইউরোপীয় জাহাজের মাঝে সংঘর্ষ হয়। যারা উপসাগরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। ইসলামি নৌবাহিনী তাদের প্রতিরোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। সুলতান ফাতিহ নিজেই এ সংঘর্ষে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি নৌবাহিনীর প্রধানের কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে বলেন, 'তুমি হয়তো এই জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, নয়তো সেগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। যদি তুমি তা করতে না পারো, তাহলে আমাদের নিকটে আর জীবিত ফিরে এসো না।'[২০০] কিন্তু ইউরোপীয় জাহাজগুলো তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়। উসমানি নৌবাহিনী তাদের অব্যাহত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রতিরোধ করে রাখতে পারেনি। ফলে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং নৌবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করেন।[২০১] সিংহাসনে ফিরে গিয়ে সুলতান নৌবাহিনী প্রধান বালিতাহ আওগালিকে ডেকে তিরস্কার করেন এবং তাকে কাপুরুষ আখ্যা দেন। এতে বালিতাহ আওগালি প্রভাবান্বিত হয়ে বলেন—'নিশ্চয় আমি প্রতিষ্ঠিত জান্নাতের বিনিময়ের আশায় মৃত্যুর মুখোমুখি হই; কিন্তু এ ধরনের অপবাদ মাথায় নিয়ে মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে। আমি এবং আমার বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী লড়াই করেছি। আমাদের সকল চেষ্টা এবং কৌশল অবলম্বন করেছি এবং বিপদের মুখেও আমাদের পাগড়ি সমুন্নত রেখেছি।'[২০২]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ উপলব্ধি করেন, লোকটি যথাযথ ওজর পেশ করেছে। তাই তাকে ছেড়ে দেন এবং তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন। তার স্থানে হামজা পাশাকে নিযুক্ত করেন।[২০৩]

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই সামুদ্রিক যুদ্ধের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি সমুদ্রের দিকে ছুটছিলেন, এমনকি তার ঘোড়া

[১৯৯] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৬৮।
[২০০] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি,* পৃষ্ঠা : ১০১।
[২০১] *মাওয়াকিফুন হাসিমাতুন,* মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান, পৃষ্ঠা : ১৮০।
[২০২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি,* পৃষ্ঠা : ১০৩।
[২০৩] প্রাগুক্ত।

সমুদ্রের বুকে নেমে গিয়েছিল। লড়াইকারী জাহাজগুলো তার থেকে এক পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ দূরত্বে ছিল। তাই সুলতান বালিতাহ আওগালিকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলছিলেন, 'হে ক্যাপ্টেন! হে ক্যাপ্টেন, আর তাকে তার হাত দ্বারা ইশারা করছিলেন। আর উসমানিরা আরও জোরদার আক্রমণের চেষ্টা করেছিল, তবে তারা জাহাজের দিকে ভালোমতো লক্ষ রাখেনি।[২০৪]

উসমানি নৌবাহিনীর পরাজয়ে সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শদাতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাদের শীর্ষে ছিলেন উজির খলিল পাশা। তিনি কনস্টান্টিনোপলের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করে সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তিতেই তুষ্ট থাকার মত ব্যক্ত করেছিলেন। সাথে সাথে সেখান থেকে অবরোধও উঠিয়ে নিতে বলেছিলেন; কিন্তু সুলতান তার বিজয়যাত্রার চেষ্টা অব্যহত রাখেন এবং সকল দিক থেকে কামানের মাধ্যমে শহরের প্রতিরোধ নিরোধের চেষ্টা করতে থাকেন। সে সময়েই সুলতান গোল্ডেন হর্ন প্রণালিতে ইসলামি নৌবাহিনীর অনুপ্রবেশের কথা ভেবেছিলেন। বিশেষ করে গোল্ডেন হর্ন প্রণালি সংশ্লিষ্ট সীমান্ত ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বাইজেন্টাইনরা তাদের প্রতিরোধবাহিনীকে শহরের পশ্চিম সীমান্ত থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হবে। এর ফলে পশ্চিম সীমান্তে প্রতিরোধকারী সৈন্যসংখ্যা কমে যাবে। এভাবে সেদিক দিয়ে আক্রমণ করার একটি বিরাট সুযোগ তৈরি হবে।[২০৫]

পাঁচ : সুলতানের বিরল সামরিক প্রতিভা

সুলতান খুবই চমৎকার একটি বুদ্ধি করলেন। তা হলো, যুদ্ধজাহাজগুলোকে তার চলমান স্থান বেশিকতাশ থেকে নিয়ে গিয়ে গোল্ডেন হর্ন প্রণালিতে নিয়ে যাওয়া। আর সেগুলো নেওয়া হবে গালতা শহর থেকে দূরের দুই বন্দরের মধ্যবর্তী স্থলভাগ দিয়ে। যেন উত্তরের অধিবাসীরা জাহাজের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। বন্দরের মাঝে তিন মাইলের মতো দূরত্ব ছিল। আর সেখানকার ভূমিও সমতল ছিল না, বরং তা ছিল উঁচু, নিচু এবং এবড়োথেবড়ো।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার যুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টাদের ডাকলেন এবং তাদের সামনে তার এই ভাবনা উপস্থাপন করলেন। তাদেরকে তার আগের যুদ্ধের সীমারেখাই নির্ধারণ করে দিলেন। তাদের সকলেই সুলতানকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করল এবং তারা সুলতানের এ বুদ্ধিমত্তায় বিস্ময় প্রকাশ করল।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যায়। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের আদেশে সেখানাকার ভূমি সমতল করার কাজ শুরু হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা সমতল করা সম্পন্ন হয়ে যায়।

[২০৪] প্রাগুক্ত।
[২০৫] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৬৯।

এরপর তেল ও চর্বি ঢেলে দেওয়া কাঠের প্লেট এনে সেগুলোকে সমতল ভূমিতে বসানো হয়, যাতে করে তার মধ্য দিয়ে জাহাজ টেনে নেওয়া যায়। এখানে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল জাহাজগুলোকে পাহাড়ের ঢালু রাস্তায় নিয়ে যাওয়া। কেননা, উসমানি নৌ জাহাজগুলো আয়তনে ছোট এবং ওজনে হালকা ছিল।[২০৬]

জাহাজগুলোকে বসফরাস থেকে স্থল ভাগে টেনে নেওয়া হয়, যেখানে তিন মাইলব্যাপী রাস্তায় তেল ঢেলে দেওয়া কাঠের প্লেট বসানো হয়েছিল। এভাবে জাহাজগুলোকে নিরাপদভাবে গোল্ডেন হর্ন প্রণালিতে অবতরণ করানো হয়। সে রাতে উসমানি বাহিনী শত্রুবাহিনীর অগোচরে সত্তরটিরও অধিক নৌযানকে গোল্ডেন হর্ন প্রণালিতে নিয়ে যেতে এবং অবতরণ করাতে সক্ষম হয়। এটা ছিল এমন এক পদ্ধতি—যা সুলতান ফাতিহের আগে কেউ উদ্ভাবন করতে পারেনি। যে রাতে জাহাজগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে রাতে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এ কাজের তদারকি করেছিলেন। শত্রুরা তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।[২০৭]

সে সময়ের হিসেবে এ কাজটি ছিল খুবই অভাবনীয় এবং অকল্পনীয়। এতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে দ্রুততর পরিকল্পনা এবং দ্রুততর বাস্তবায়নের বিষয়। যা উসমানিদের চমৎকার বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ দক্ষতা এবং তাদের পাহাড়সম সাহসের কথা জানিয়ে দেয়। এ খবর জানার পর রোমীয়রা যারপরনাই হতভম্ব হয়। তিনি যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন শুরুতে কেউ-ই তা বিশ্বাস করতে পারেনি; কিন্তু বাস্তবতা তাদেরকে এই অভূতপূর্ব পরিকল্পনার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করে।

শস্যক্ষেতের মাঝ দিয়ে এই উঁচু উঁচু পাল বিশিষ্ট জাহাজগুলো চলার দৃশ্য ছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে চলার দৃশ্যের মতোই সুন্দর, বরং এটি ছিল তার চেয়ে বেশি হতভম্বকারী এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী। এ জন্য প্রথম কৃতিত্ব আল্লাহ তাআলার, এরপর সুলতানের সাহস, তার মেধা এবং তার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বুদ্ধিমত্তার। এর পাশাপাশি উসমানি প্রকৌশলীদের কর্মদক্ষতার এবং সে সমস্ত কর্মঠ হাতে, যারা উদ্যমতা এবং উদ্দীপনার সাথে এ কাজ বাস্তবায়ন করেছিলেন।

এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এক রাতের মধ্যেই। ২২ এপ্রিল সকালে সেই দুর্ভাগা শহরের অধিবাসীরা জেগে উঠেছিল উসমানিদের আল্লাহু আকবার হুংকারে। তাদের সুউচ্চ জয়ধ্বনি এবং তাদের উন্নত ইমানি সংগীতের আওয়াজে।[২০৮]

গোল্ডেন হর্ন প্রণালিতে উসমানি নৌবহর দেখে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমেই সেই সামুদ্রিক অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ লাভ হয়। সেখানে উসমানি সেনাবাহিনী আর

[২০৬] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* আবদুস সালাম ফাহমি, পৃষ্ঠা : ১০০।
[২০৭] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭০।
[২০৮] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, আবদুস সালাম ফাহমি,* পৃষ্ঠা : ১০২।

প্রতিরোধকারী বাইজেন্টাইনদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক প্রস্তুত ছিল না। একজন বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদ উসমানিদের এ কাজে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন— 'আমরা এর আগে এমন অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক কাজ কখনো দেখিনি এবং শুনিনি।' মুহাম্মদ আল-ফাতিহ জমিনকে সমুদ্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। ঢেউয়ের বদলে তিনি পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে জাহাজ অতিক্রম করিয়েছেন। দ্বিতীয় মুহাম্মদ তার এই কাজের মাধ্যমে আলেকজেন্ডার দ্য গ্রেটকেও ছাড়িয়ে গেছেন।[২০৯]

কুসতানতিনিয়াবাসীদের মাঝে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মাঝে কানাঘুঁষা এবং গুজব বেড়ে যায়। তারা বলাবলি করতে থাকে, 'জাহাজকে শুকনো ভূমি অতিক্রম করতে দেখেই তারা বুঝে গেছে, অচিরেই কুসতানতিনিয়ার পতন হতে যাচ্ছে।'[২১০]

গোল্ডেন হর্ন প্রণালিতে ইসলামি নৌবাহিনীর উপস্থিতি শহরের প্রতিরোধকারী সেনাদের মনোবল ভাঙার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। তারা গোল্ডেন হর্ন প্রণালি সীমান্তে প্রতিরোধ স্থাপনের জন্য অন্যান্য সীমান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসে। কেননা, তখন গোল্ডেন হর্ন সীমান্তই ছিল সবচেয়ে দুর্বল। এর আগে এ অঞ্চলের জলভাগই প্রতিরোধকারী ছিল। এ সীমান্তের ফলে অন্যান্য সীমান্তের প্রতিরোধে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।[২১১]

বাইজেন্টাইন সম্রাট উসমানি নৌবাহিনীর প্রতিরোধেই অধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে তাদের অটল প্রতিরোধের বিপরীতে উসমানি সেনাবাহিনী আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিল। এভাবে তারা তাদের প্রতিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।

উসমানি শাহী কামানগুলো শহরের প্রতিরোধ এবং প্রাচীর ভাঙার জন্য আক্রমণ অব্যহত রাখে। তারা প্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করে। অন্যদিকে প্রতিরোধকারীরা তাদের শহরের প্রাচীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতে লেগে যায়। সাথে সাথে তারা আরোহণকারীদেরও প্রতিরোধের চেষ্টা করে। পূর্বের শুরু হওয়া অবরোধ তো ছিলই। ফলে পরিস্থিতি তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা অধিক পরিমাণে ক্লান্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের দিন রাতের পরিশ্রম সমান হয়ে যায়। নৈরাশ্য তাদেরকে জেঁকে বসে।[২১২]

উসমানি সেনাবাহিনী বসফরাস প্রণালি এবং গোল্ডেন হর্ন প্রণালির পার্শ্ববর্তী মালভূমিতে বিশেষ কামান নিয়োজিত করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বসফরাস প্রণালি এবং গোল্ডেন হর্ন প্রণালির আশপাশের জলভাগে অবস্থান নেওয়া বাইজেন্টাইন ও তাদের

[২০৯] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ, ইয়ালমায উযাস্তনা,* পৃষ্ঠা : ১৩৫।
[২১০] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১০৬।
[২১১] প্রাগুক্ত।
[২১২] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭১।

সহযোগী নৌবহরকে ধ্বংস করা, যা শত্রুপক্ষের জাহাজগুলোকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তাদেরকে পঙ্গু করে ফেলে।[২১৩]

ছয় : বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং তার সহযোগীদের মাঝে বৈঠক

বাইজেন্টাইন সম্রাট ও তার সহযোগী, পরামর্শক এবং খ্রিষ্টধর্মীয় যাজকরা শহরে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। তারা সেখানে স্বয়ং সম্রাটকে শহর থেকে বের হয়ে সমস্ত খ্রিষ্টান জাতির কাছে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দেয়। যদি খ্রিষ্টান বাহিনীগুলো আসে, তাহলে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ শহর থেকে তার অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হবেন; কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাট এ পরামর্শ পরিত্যাগ করে এবং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সে তার এবং তার শত্রুপক্ষের অবস্থান এক হওয়া পর্যন্ত শহরে তার স্থান ছেড়ে কোথাও যায়নি। সে এটাকেই তার পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করত। সে তাদেরকে শহর থেকে সম্রাটের বের হওয়ার পরামর্শ প্রদান করাকে নিষেধ করে দেয়। সে তাদের পরামর্শ রক্ষার্থে বিভিন্ন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে দিয়েই ক্ষ্যন্ত থাকে।[২১৪] সে সমস্ত প্রতিনিধিদল অপদস্থ হয়ে ফিরে আসে। উসমানি সাম্রাজ্যের গোয়েন্দা তৎপরতা কুসতানতিনিয়া এবং তার আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এমনকি উসমানি সাম্রাজ্য তাদের আশপাশে যা ঘটত তার সবই জানত।

সাত : উসমানিদের আত্মোৎসর্গী যুদ্ধ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সীমান্ত প্রাচীরে আক্রমণ বৃদ্ধি করে দেন এবং একে আরও জোরদার এবং বেগবান করেন। এ জন্য সুলতান নিজেই তার শত্রুকে দুর্বল করতে একটি নকশা এঁকেছিলেন। কয়েকবারই উসমানি বাহিনী নিজেদের উৎসর্গ করে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে চূড়ান্ত বীরত্বপূর্ণভাবে প্রাচীরে হামলা করে তাতে আরোহণে সক্ষম হয়। বাইজেন্টাইন সম্রাটের সৈন্যদের সবচেয়ে ভীত করত উসমানি সৈন্যদের আকাশ বাতাস বিদীর্ণকারী শ্লোগান। তারা বলত 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' আর তা শত্রুদের ওপরে বিধ্বংসী বজ্রপাতের ন্যায় পতিত হতো।[২১৫]

এদিকে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ গালতার নিকটস্থ মালভূমিতে কামান স্থাপন শুরু করেন। এই কামানগুলো গালতা বন্দরের দিকে তার ভারী ভারী গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। একটি গোলা এক ব্যবসায়ীক জাহাজে গিয়ে লেগে তা মুহূর্তেই ডুবিয়ে দেয়। ফলে

[২১৩] প্রাগুক্ত।
[২১৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১১৬।
[২১৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১০৬।

অন্যান্য জাহাজগুলো ভয় পেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। পালিয়ে গিয়ে গালতা সীমান্তের প্রাচীরকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যান্য হামলার সাথে সাথে উসমানি সেনাবাহিনীর স্থলপথে হামলাও খুব দ্রুতবেগে চলমান থাকে। অবরোধকারীদের শক্তি যেন খর্ব না হয়—এ লক্ষ্যে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ দিন-রাত কামান হামলা এবং অন্যান্য আক্রমণ অব্যহত রাখেন। তারা একটু বিশ্রাম এবং আরামের সুযোগটুকুও পাননি। ফলে তাদের দৃঢ়তা নড়বড়ে হয়ে যায় এবং তাদের অন্তর তিক্ত এবং ক্লান্ত হয়ে যায়। স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়। তারা এতটাই ক্লান্ত হয়ে যায় যে, মনে হয় যে কোনো কারণে তারা ঢলে পড়বে।

বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি একজন সেনাপতির সাথে উসমানিদের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণের পরামর্শ করছিলেন। কেননা, ওই ফাটল জয়ের পর তাদের জন্য বাইরের পৃথিবীর কাছে পৌঁছানোর পথ খুলে যাবে। তাদের এই পরামর্শের সময়ে এক সৈন্য এসে বিঘ্নতা ঘটায়, সে তাদেরকে জানায় লাইকুস উপত্যাকায় উসমানিরা প্রবল আক্রমণ করেছে। সম্রাট তার পরামর্শসভা ছেড়ে দ্রুতবেগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন। তিনি রিজার্ভ বাহিনীকে ডেকে তাদেরকে যুদ্ধস্থলে পাঠান। রাতের শেষভাগ পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে উসমানিরা সেখান থেকে ফিরে আসে।[২১৬]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ যুদ্ধ এবং অবরোধে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে শত্রুপক্ষকে হতবাক করে দিতেন। তিনি শত্রুপক্ষের অপরিচিত নতুন নতুন উদ্ভাবিত পন্থায় লড়াই করেছেন।[২১৭]

তাই অবরোধের অগ্রগামিতার একপর্যায়ে এসে উসমানিরা শহরের ভিতরে প্রবেশের জন্য এক বিস্ময়কর পন্থা অবলম্বন করে। তারা বিভিন্ন দিক থেকে শহরের অভ্যন্তর অভিমুখে সুড়ঙ্গ খনন করতে থাকে। শহরের অধিবাসীরা তাদের জমিনের নিচে বিকট আওয়াজ শুনতে পায়, যা ক্রমে ক্রমে শহরের নিকটবর্তী হচ্ছিল। তাই জলদি করে সম্রাট তার সেনাপতি এবং পরামর্শকদের নিয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে যান। তারা বুঝতে পারে যে, উসমানিরা শহরে প্রবেশের জন্য জমিনের নিচে সুড়ঙ্গ খনন করছে। তাই প্রতিরোধের জন্য তারাও উসমানিদের অনুরূপ সুড়ঙ্গ খনন করার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন উসমানিরা তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত খ্রিষ্টানদের সুড়ঙ্গে পৌঁছান তারা মনে করেন যে, তারা বিশেষ স্তরে এসে উপনীত হয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই তারা শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি। হঠাৎ করেই রোমীয়রা তাদের সামনে চলে এসে তাদের ওপর আগুনের গোলা এবং

[২১৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১০৮।
[২১৭] প্রাগুক্ত।

অগ্নিপ্রজ্বলনকারী তেল নিক্ষেপ করে। ফলে অনেকেরই শ্বাসরোধ হয়ে যায় আর আরেকদল সৈন্যের শরীর পুড়ে যায়। যারা সেখান থেকে মুক্তি পায় তারা যে পথ দিয়ে গিয়েছিল আবার সে পথ দিয়েই ফিরে আসে।[২১৮]

কিন্তু উসমানিদের কাঁধে এই ব্যর্থতা ঝুলে থাকেনি। তারা 'আক্রা ফাবু' এবং গোল্ডেন হর্ন প্রণালির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরও কয়েকটি সুড়ঙ্গ খনন করে। এ কাজের জন্য এ স্থান ছিল খুবই উপযুক্ত। তারা অবরোধের শেষ দিন পর্যন্ত এ কাজ অব্যহত রাখে। এর ফলে কুসতানতিনিয়ার অধিবাসীদের ভীষণ ভয় এবং অবর্ণনীয় ভীতি গ্রাস করে নেয়। তারা গর্ত খননের অস্পষ্ট আওয়াজকে উসমানিদের পায়ের আওয়াজ মনে করে। তাদের অধিকাংশই ভেবে নেয়, অচিরেই জমিন বিদীর্ণ করে উসমানি সৈন্যরা বের হয়ে শহরময় ছেয়ে যাবে। তাই তারা ভয়ে অস্থির হয়ে ডানে বামে এদিক সেদিক পায়চারী করতে লাগল। তারা বলতে থাকে, 'এই বুঝি তুর্কিরা চলে এল'। তাদেরকে পালানোর ভূত তাড়াতে থাকে। অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যে কোনো গুজব ছড়িয়ে পড়লে তারা সেটাকে সত্য মনে করত। তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল তারা মাতাল হয়ে গেছে। যদিও তারা মাতাল ছিল না। জমিনে চলাফেরা করেও কেউ কেউ জমিনকে আসমান করতে থাকে। আর তারা পরস্পরের দিকে মায়া এবং ব্যাথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

উসমানিদের জন্য এ কাজ মোটেও সহজ ছিল না। কেননা, এ গর্ত খনন করতে গিয়ে তাদের অনেক জীবনের দাবি মেটাতে হয়েছিল। অনেকেই জমিনের নিচে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। আবার অনেকেই রোমকদের হাতে বন্দি হয়। ফলে সেখানে তাদের মাথা কর্তন করে সেগুলো উসমানি সৈন্যবাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করা হয়।[২১৯]

উসমানি সেনাবাহিনীর অভিনব হামলা

এবার উসমানিরা তাদের হামলায় আরও একটি নতুন পদ্ধতি যোগ করে। তারা একটি বিরাট, লম্বা চলমান কাঠের কেল্লা নির্মাণ করে। এটা ছিল প্রাচীরের তুলনায় উঁচু। আগুণ প্রতিরোধের জন্য তা বর্ম এবং পানি দ্বারা ভেজানো চামড়া দিয়ে বেষ্টিত ছিল। কেল্লার প্রতিটি স্তরে সেনা মোতায়েন করা হয়। কেল্লার ওপরের স্তরে থাকা তিরন্দাজ সৈন্যরা প্রাচীরের ওপর থেকে যারাই উঁকি দিত তাদের মাথা লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করত। প্রতিরোধকারী সৈন্যরা এই আক্রমণে ভয় পেয়ে যায়। এই কেল্লার মাধ্যমে আক্রমণ করে তারা প্রাচীরের বাবে রোমানুসের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ফলে বাইজেন্টাইন সম্রাট তার সেনাপতিদের নিয়ে ওই কেল্লার প্রতিরোধে এবং প্রাচীর থেকে তা হটানোর দিকে মনযোগী হন। উসমানিরা সে কেল্লাকে প্রাচীরের সাথে ঘেঁষাতে সক্ষম হয়। কেল্লায় থাকা

[২১৮] *আল-ফুতুহুল ইসলামিইয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭২।
[২১৯] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১১০।

উসমানি এবং প্রাচীরের কাছে থাকা প্রতিরোধকারীদের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। কেল্লায় থাকা কতক মুসলিম সৈন্য প্রাচীর-আরোহণে সফল হয়। বাইজেন্টাইন সম্রাট ধারণা করেন এই বুঝি পরাজয় নেমে এল তার শিয়রে; কিন্তু প্রতিরোধকারীরা কেল্লা উদ্দেশ্য করে ঘন ঘন আগুণ নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে, যা বেশ ফলপ্রসূ হয়। কেল্লায় আগুন লেগে তা পুড়ে যায়। আগুন পার্শ্ববর্তী বাইজেন্টাইনদের প্রাচীরে গিয়ে নিপতিত হয়। সেখানে অবস্থান নেওয়া প্রতিরোধকারী সৈন্যরা এতে নিহত হয়ে যায়। প্রাচীরের কাছে খনন করা গর্তগুলো পাথর এবং মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়।[২২০]

উসমানিরা এতেও তাদের চেষ্টা থেকে দমে যায়নি। সুলতান নিজে এ কাজের তদারকি করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা আগামীকাল আরও চারটি এমন কেল্লা নির্মাণ করব।[২২১]

অবরোধ আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং শক্তিশালী করা হয়। শহরের অধিবাসীরা এতে মাত্রাধিক পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। ফলে শহরের অধিবাসীরা ২৪ মে তারিখে বাইজেন্টাইন দুর্গের ভেতরে সম্রাটের উপস্থিতিতে একটি সভার আয়োজন করে। শহরের কোণে কোণে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা শহর পতনের আগে সম্রাটকে শহর থেকে বের হতে পরামর্শ দেয়। যাতে তারা সবাই মিলে শহররক্ষায় সাহায্য এবং শক্তি একত্র করতে পারে অথবা শহর পতন হয়ে গেলে যেন তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে; কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাট আরেকবার তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি শহরের ভিতরে থেকেই তার অংশের নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং প্রাচীর, দুর্গগুলোর খোঁজ নিতে বেরিয়ে যান।

শহরে নানা সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং প্রতিরোধকারীদের মনোবল দুর্বল করতে থাকে। তার মধ্য হতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৬ জমাদাল উলা মোতাবেক ২৫ মে তারিখে সংঘটিত হয়। সেদিন শহরের বাসিন্দারা মহীয়সী কুমারী মরিয়মের মূর্তি (তাদের ধারণা অনুযায়ী) বহন করে শহরের এ গলি ও গলি ঘুরতে থাকে। তারা এভাবে তাদের কুমারী মাতার কাছে কাকুতি-মিনতি করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। হঠাৎ তাদের হাত থেকে মূর্তি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। তারা এতে অশুভ ইঙ্গিত এবং বিপদের আভাস গ্রহণ করে। এ ঘটনা শহরের অধিবাসীদের মাঝে বিশেষ করে প্রতিরোধকারীদের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলে। এর পরদিনই ২৬ মে তারিখে বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। একটি বজ্র পতিত হয় হাজিয়া সুফিয়া গির্জার ওপর। ফলে তারা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করে এবং সম্রাটের কাছে গিয়ে বলে, আল্লাহ তাআলা তাদের জিম্মা ছেড়ে দিয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই শহর উসমানি মুজাহিদদের হাতে পতন

[২২০] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি*, পৃষ্ঠা : ১৪৪।
[২২১] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১২২।

হতে যাচ্ছে। এ সংবাদ সম্রাটের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এমনকি তিনি বেহুশ হয়ে যান।[২২২]

উসমানি শাহী কামানগুলো বিরামহীনভাবে শহরের প্রাচীর এবং দুর্গ ভেঙে ভেঙে একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছিল। প্রাচীর দুর্গের অনেক অংশ ভেঙে যায়। ভাঙা অংশ দিয়ে গর্তগুলো ভরাট হয়ে যায়। প্রতিরোধকারীরা তা সরাতে ব্যর্থ হয়। যে কোনো মুহূর্তে শহরের ভেতরে আক্রমণ করার সুযোগ হয়ে যায়; কিন্তু এরপরও শহরে আক্রমণের এ সুযোগ লুফে নেওয়া হয়নি।[২২৩]

আট : সুলতান ফাতিহ এবং কুসতানতিনিয়াবাসীদের মাঝে শেষ সমঝোতা

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ নিশ্চিত হয়ে যান যে, শহর এবার পতনের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। তা সত্ত্বেও তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তাই তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছে চিঠি লিখে কোনো রকম রক্তপাত ছাড়াই শহরকে হস্তান্তর করতে বলেন। তিনি তাকে তার পরিবার-পরিজনসহ নিরাপত্তার সাথে শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগের কথা ব্যক্ত করেন। সাথে সাথে শহরের বাসিন্দাদের মধ্য হতে যারা শহর ত্যাগ করতে চায় তারাও নিরাপত্তার সাথে শহর থেকে বের হয়ে যেতে পারার কথা বলেন।[২২৪]

তিনি আরও বলেন, শহরের অধিবাসীদের রক্তপাত এবং কোনো ধরনের কষ্টের সম্মুখীন করা হবে না। তারা শহরে থাকার অথবা সেখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছে চিঠি পৌঁছলে তিনি ব্যাপারটি তার পরামর্শকদের কাছে উত্থাপন করেন। তাদের কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করতে বলে। আবার কেউ কেউ মৃত্যু পর্যন্ত শহর প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সম্রাট শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের মতকেই প্রাধান্য দেন। তিনি সুলতান ফাতিহের কাছে প্রেরিত ফিরতি চিঠিতে বলেন— 'সুলতান সন্ধির প্রস্তাব দেওয়ায় এবং জিজিয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত পেশ করায় তিনি আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছেন। তবে কুসতানতিনিয়া তার

[২২২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি*, পৃষ্ঠা : ১১৮।
[২২৩] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর*, পৃষ্ঠা : ৩৭৫।
[২২৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিররাশিদি*, পৃষ্ঠা : ১১৯।

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধের শপথ নিয়েছে। হয়তো তার সিংহাসন অক্ষত থাকবে নয়তো তার প্রাচীরের নিচে তার সমাধি হবে'।[২২৫]

সুলতান ফাতিহের কাছে এ চিঠি পৌঁছলে তিনি বলেন—'বাহ! বেশ ভালো। অচিরেই কুসতানতিনিয়ার সিংহাসন আমার হবে, নয়তো সেখানে আমার কবর হবে।'[২২৬]

সন্ধির মাধ্যমে শহর হস্তান্তরের আশা থেকে নিরাশ হয়ে সুলতান ফাতিহ এবার আক্রমণ আরও জোরদার করেন। বিশেষ করে শহরে কামানের গোলা নিক্ষেপের ওপর জোর দেন। একপর্যায়ে অধিক চাপের ফলে সুলতানী শাহী কামানটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কামান পরিচালনাকারীরা নিহত হয়। তাদের মাঝে ছিল হাঙ্গেরীর প্রকৌশলী উরবান যে কামান নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সুলতান যাইতুন তেলের মাধ্যমে কামানকে শীতলকরণের মাধ্যমে সচল রাখতে বলেন। এ কাজে প্রকৌশলীরা সফল হয়। কামানগুলো আবার শহরে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। এবার কামানগুলো প্রাচীর আর দুর্গ লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপের পাশাপাশি শহরের মধ্যবর্তী স্থানেও গোলা নিক্ষেপে সক্ষম হয়।[২২৭]

নয় : মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মজলিসে শুরার সাথে বৈঠক

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। তাতে তার পরামর্শক, বড় বড় নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি শায়খ এবং আলেমগণও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদেরকে কোনো রকম দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া তাদের মত ব্যক্ত করতে বলেন। তখন তাদের কেউ কেউ অবরোধ থেকে সরে আসার পরামর্শ দেন। তাদের মধ্যে উজির খলিল পাশা ছিলেন অন্যতম। যিনি এর আগেও রক্তপাত না করে সরে আসতে এবং শহরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে ইউরোপের খ্রিষ্টানদের ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি আগে থেকেই বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পৃক্ততা এবং বাইজেন্টাইনদের অপদস্থতার হাত থেকে বাঁচানোর অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন।[২২৮] আরও কজন উপস্থিত সভাসদ সুলতানকে শহর বিজয় করার আগ পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। তারা ইউরোপ আর তার শক্তিকে কোনো পাত্তা দেননি। এভাবে তারা বিজয় লাভের জন্য সৈন্যদেরকে আরও উদ্যমী হওয়ার পরামর্শ দেন। তাদের মনোবল বাড়াতে বলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন একজন সাহসী সেনাপতি। যার নাম জাওগানুশ পাশা। যিনি আলবেনিয়ার বংশোদ্ভুত ছিলেন। তিনি

[২২৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* আব্দুস সালাম ফাহমি, পৃষ্ঠা : ১১৬।
[২২৬] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭৬।
[২২৭] প্রাগুক্ত।
[২২৮] *ফাতহুল কুসতানতানিয়্যাহ,* মুহাম্মদ সাফওয়াত, পৃষ্ঠা : ১০৩।

খ্রিষ্টান থেকে মুসলিম হয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি সুলতানকে ইউরোপীয়দের শক্তিকে পাত্তা না দিতে বলেন।[২২৯]

ইতিহাসে জাওগানুস পাশার বক্তব্যকে উল্লেখ করা হয়েছে—'সুলতান ফাতিহ যখন তাকে তার মত ব্যক্ত করতে বললেন তিনি তার আসনে নড়েচড়ে বসলেন এবং তুর্কি ভাষায় চিৎকার দিয়ে উঠলেন। যার উৎস হলো, আরনাউতি স্বরাঘাত। তিনি বললেন, জি সুলতান! আমি কখনোই খলিল পাশার বক্তব্যকে সমর্থন করি না। আমরা এখানে ফিরে যেতে আসিনি। মৃত্যুকে বরণ করে নিতেই এসেছি। তার এই বক্তব্য উপস্থিত লোকদের অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। মজলিসে মুহূর্তের জন্য নীরবতা ছেয়ে যায়। জাওগানুস পাশা তার বক্তব্য চালু রাখেন। তিনি বলেন, 'খলিল পাশা তার বক্তব্যের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যকার উদ্দীপনা এবং বীরত্বকে মেরে ফেলতে চায়। তার এ বক্তব্যে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ব্যর্থ প্রতীয়মান হবে। আলেকজেন্ডার দ্য গ্রেটের বাহিনী যারা গ্রিস থেকে এসে হিন্দুস্তানে আক্রমণ করেছিল, এবং বড় এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমির অর্ধেক রাজত্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল তারা আমাদের চেয়ে অধিক ছিল না। তারা যদি সেই বিশাল বিস্তীর্ণ জমিনের ওপরে আধিপত্য লাভ করতে পারে তাহলে আমরা কেন এই পাথুরে ভূমিকে অতিক্রম করতে পারব না। খলিল পাশা বলেছেন পশ্চিমের দেশগুলো আমাদের গতবিধি অনুসরণ করে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে; কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোর ক্ষমতা আর কতটুকু? ওই সমস্ত ল্যাটিন রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মাঝেই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত। সেগুলো হলো ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী ওই সমস্ত দেশ যারা জলদস্যুতা এবং ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই পারে না। যদি সে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো বাইজেন্টাইনদের সাহায্য করতে চায় তাহলে তারা সৈন্য এবং জাহাজ প্রেরণ করতে পারবে। যদি আমরা ধরে নিই আমাদের কুসতানতিনিয়া বিজয়ের পর পশ্চিমারা আক্রমণ করতে পারে, তাহলে কি আমরা তাদের কিছুই করবো না? আমাদের কি এমন এক সেনাবাহিনী নেই যারা আমাদের ইজ্জত-সম্মানের ওপর আক্রমণ হলে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে?

হে রাজত্বের অধিপতি, আপনি আমার কাছে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন, আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি, আমাদের অন্তর পাথরের মতো হওয়া আবশ্যক। আমাদের মাঝে কোনোরকম দুর্বলতার প্রকাশ ছাড়াই আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। আমরা একটি কাজ শুরু করেছি, এখন আমাদের ওপর তা পূর্ণ করা আবশ্যক। আমাদের আক্রমণ আরও জোরদার করা উচিত। আরও ফাটল জয় করা উচিত এবং বীরত্বের সাথে শত্রুদের প্রাচীর ভেঙে ফেলা উচিত। আমি এ ছাড়া আর কিছুই জানি না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই বলার ক্ষমতা রাখি না।'[২৩০]

[২২৯] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭৭।
[২৩০] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ লিরবাশিদি,* পৃষ্ঠা : ১২২।

এ বক্তব্য শুনে মুহাম্মদ আল-ফাতিহের চেহারায় প্রশস্তি এবং সুসংবাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি সেনাপতি তুরখানের দিকে তাকিয়ে তার মতামত জানতে চাইলেন। তুরখান সাথে সাথে জবাব দিলেন—জাওগানুশ পাশা ঠিকই বলেছে। আমি তার কথাকেই সমর্থন করছি সুলতান। এরপর তিনি শায়খ আক শামসুদ্দিন এবং শায়খ কাওরানির কাছে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। সুলতান ফাতিহ তাদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন। তারা দু-জনেই জাওগানুশ পাশার মতের সমর্থন জানান। তারা বলেন, 'যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আবশ্যক। পরিশেষে বিজয় আমাদের হবেই।'[২৩১]

উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান ফাতিহ দুই শায়খের বিজয় এবং সাহায্যের দোয়ায় আনন্দিত হন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বলে ওঠেন—'আমার পূর্বপুরুষদের মধ্য হতে কে শক্তিতে আমার অনুরূপ ছিল?'[২৩২]

উলামায়ে কেরাম যুদ্ধ অব্যাহত রাখার মতকে আরও শক্তিশালী করেন। সুলতান ফাতিহ বিজয়ের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালু রাখার কথা শুনলেই আনন্দিত হতেন। বৈঠক শেষে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। উপযুক্ত সময় দেখে তার নির্দেশনা জারি করা হবে। সেনারা যেন সে লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[২৩৩]

দশ : মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কর্তৃক তার সেনাদের দেওয়া নির্দেশনা

১৮ জুমাদাল উলা মোতাবেক ২৭ মে তারিখে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার সেনাদের নামাজ আদায় করা, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং তার দরবারে কাকুতি-মিনতি করার মাধ্যমে তাদের অন্তরকে পবিত্র করতে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হতে বলেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিজয়ের পথ সহজ করে দেন। সাধারণ মুসলিম প্রজাদের মাঝেও এ কথা ছড়িয়ে যায়। অনুরূপ সেদিন সুলতান ফাতিহ শহরের প্রাচীরের এবং অন্যান্য দিকের খোঁজ-খবরও নেন। বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিরোধকারীদের অবস্থা কোন পর্যায়ে তা জানেন। তিনি কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেন যেখানে উসমানিদের হামলা পরিপূর্ণ হবে। তিনি সেখানে সৈন্যদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো চেষ্টা এবং নিজেকে উৎসর্গ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রদান করেন। এভাবে তিনি গালতায় অবস্থানকারীদের কাছে খবর পৌঁছিয়ে তাদের আরও সতর্ক হতে বলেন। ভবিষ্যতে যাই ঘটুক-না কেন তারা যেন পরিপূর্ণ আস্থাশীল হয় এবং তাদের সম্মুখে শত্রুপক্ষের কেউ যেন আসতে না পারে। তিনি তাদের জানান, তারা যা

[২৩১] প্রাগুক্ত।
[২৩২] প্রাগুক্ত।
[২৩৩] *তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়া,* মুহাম্মদ ফরিদ, পৃষ্ঠা : ১৬৪।

ক্ষতিগ্রস্ত হবে এর ভর্তুকি তিনি দেবেন। সেদিন সন্ধ্যায় উসমানিরা তাদের সামরিক ঘাঁটির পাশে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে এবং তাকবির ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ফেলে।[২৩৪] রোমীয়রা বুঝতে পারে আগুণের সূত্রপাত হয়েছে উসমানিদের সামরিক ঘাঁটি হতেই। তারা এর মাধ্যমে ধরে নেয় উসমানিরা আসন্ন বিজয়ের উদযাপন করছে। এতে তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয়। এর পরদিনই ২৭ মে তারিখে উসমানিরা সবচেয়ে জোরদার প্রস্তুতি নিয়ে হামলা শুরু করে। কামানগুলো বাইজেন্টাইনদের লক্ষ্য করে আগুনের গোলা ছুড়তে থাকে। সুলতান নিজে বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে তাদেরকে একনিষ্ঠতা, দোয়া এবং আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করাতে থাকেন।[২৩৫]

এভাবে সুলতান ফাতিহ যে সৈন্যদলের কাছেই যেতেন তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়ে আসতেন। তাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে আসতেন তারা কুসতানতিনিয়া বিজয় করার মধ্য দিয়ে কী বিরাট সম্মান, চিরস্থায়ী মর্যাদা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অঢেল সওয়াব লাভ করতে যাচ্ছে। আর অচিরেই এ শহরের সকল শত্রু এবং তাদের অনুগতদের কাজের অবসান হতে যাচ্ছে। কুসতানতিনিয়ার প্রাচীরে প্রথম যে সৈন্য ইসলামি সাম্রাজ্যের পতাকা উড়াবে[২৩৬]তার জন্য থাকবে ভরপুর পুরস্কার এবং প্রশস্ত এলাকার জমিদারি।

উলামায়ে কেরাম এবং প্রবীণ শায়খগণ সৈন্যদের মাঝে গিয়ে তাদেরকে জিহাদের আয়াতসমূহ এবং সুরা আনফাল তিলাওয়াত করে শোনাতেন। তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা এবং কুসতানতিনিয়ার প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করা পূর্বেকার মুজাহিদগণের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারা মুজাহিদদের বলতেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের সময় আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে নেমেছিলেন। আর আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ভূখণ্ডে এসে অবতরণ করেছেন।' এ কথা সৈন্যদের অন্তরে স্পৃহা জাগিয়ে দিত। তাদের অন্তরে আরও উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করত।[২৩৭]

সুলতান ফাতিহ তার তাঁবুতে ফিরে এসে তার সেনাবাহিনীর বড় বড় অধিনায়কদের ডাকেন। তাদের কাছে তার শেষ নির্দেশনাগুলো ব্যক্ত করেন। এরপর তাদের উদ্দেশে নিম্নে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন—

[২৩৪] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান,* ইউসুফ আসাফ, পৃষ্ঠা : ৬০।
[২৩৫] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭৮।
[২৩৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১২৫।
[২৩৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১২৬।

> ‘যখন আমাদের মাধ্যমে কুসতানতিনিয়া বিজয় সম্পন্ন হবে তখন আমাদের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস এবং মোজেজা বাস্তবায়িত হবে। এ হাদিসের মধ্যে যে মর্যাদা এবং ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে তার অংশ আমাদেরও হবে। আপনারা আমাদের মুজাহিদদেরকে এক এক করে এ কথা জানিয়ে দিন। আমরা অচিরেই যে বিশাল বিজয় অর্জন করতে যাচ্ছি তা ইসলামের মর্যাদা এবং সম্মান আরও বাড়িয়ে দেবে। প্রত্যেক সৈন্যের জন্য শরিয়তের নির্দেশনাকে তার দু-চোখের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেওয়া আবশ্যক । এর ফলে তাদের কাছ থেকে এ নির্দেশনার বিপরীত কোনো কিছু প্রকাশ পাবে না। তারা যেন গির্জা এবং ইবাদাতগাহগুলোর কোনো ক্ষতিসাধন না করে এবং যুদ্ধে অংশ না নেওয়া যাজক, দুর্বল এবং অক্ষম ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দেয়।[২৩৮]

এ সময় বাইজেন্টাইন সম্রাট শহরের সকল মানুষকে একত্র করে একটি সম্মিলিত প্রার্থনার আয়োজন করেছিলেন। তিনি শহরের সকল নারী, পুরুষ, শিশুদের গির্জায় একত্রিত খ্রিষ্টান ধর্মমত অনুযায়ী প্রার্থনা এবং কান্নাকাটি করতে বলেন। যেন তাদের এ প্রার্থনা কবুল হয় এবং তাদের শহর এই অবরোধ থেকে মুক্ত হয়। এ প্রার্থনায় বাইজেন্টাইন সম্রাট তার জীবনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যটি দিয়েছিলেন। এ বক্তব্যে তিনি মরে গেলেও যেন তারা শহর প্রতিরোধ করে এবং উসমানি মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের প্রতিরক্ষা অব্যাহত রাখে সে কথা জোর দিয়ে বলেন। তার এ বক্তব্য ছিল খুবই চমৎকার। ইতিহাসবিদগণ বলেন, তার এই বক্তব্য উপস্থিত সবাইকে কাঁদিয়েছিল। এখানেই বাইজেন্টাই সম্রাট তার সাথের খ্রিষ্টানদেরকে নিয়ে তাদের সবচেয়ে পবিত্র হাজিয়া সুফিয়া গির্জায় সর্বশেষ প্রার্থনা করেছিলেন।[২৩৯]

এরপর বাইজেন্টাইন সম্রাট শেষবারের মতো দেখার জন্য তার প্রাসাদে যান। উপস্থিত সবাইকে বিদায় জানান তিনি। এটি ছিল খুবই হৃদয়বিগলিতকারী দৃশ্য। খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদগণ এ দৃশ্য সম্পর্কে বলেন, ‘যদি কোনো ব্যক্তির অন্তর কাষ্ঠ নির্মিত অথবা পাথরেরও হতো তবুও এ দৃশ্য দেখে তার দু-চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যেত’।[২৪০]

সম্রাট কনস্টানটিন একটি কামরায় ঝুলন্ত একটি প্রতিকৃতির দিকে তাকান। (তারা সেটিকে মসিহের প্রতিকৃতি মনে করত) তার নিচে অবনত হয়ে কিছু প্রার্থনা করেন। এরপর সেখান থেকে উঠে মাথায় পাগড়ি বেঁধে মধ্য রাতে তার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যান। তার সাথে ছিল তার সহপাঠী, সহচর এবং বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ ফ্রান্তিজতিস। তারা দুজন বাহনে চড়ে খ্রিষ্টান সৈন্যদের খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। তারা উদ্যমী উসমানি

[২৩৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১২৫।
[২৩৯] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১২৯।
[২৪০] প্রাগুক্ত।

সেনাবাহিনীর স্থল এবং সামুদ্রিক হামলার ওপর লক্ষ রেখেছিল। সে রাত অতিবাহিত হওয়ার সামান্য সময় পূর্বে আকাশে ক্ষীণকায় বৃষ্টির ফোঁটা উড়তে থাকে, যেন তা জমিনকে সেঁচে নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান ফাতিহ তার তাঁবু থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকান। তিনি বলেন, ‘অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর রহমত এবং দয়া বর্ষণ করবেন। তাই তিনি এই সময়ে বরকতময় বৃষ্টি অবতীর্ণ করেছেন। এ বৃষ্টি ধুলোবালি নিয়ে গিয়ে আমাদের চলাফেরা সহজ করে দেবে’।[২৪১]

এগারো : আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় এবং আসন্ন সাহায্য

২০ জমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ২৯ মে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সকালে উচ্চস্বরে তাকবির ধ্বনি প্রদানকারী মুজাহিদগণকে নির্দেশ দেওয়ার পর একযোগে শহরের ওপর ব্যাপকভাবে হামলা শুরু হয়। তারা প্রাচীরমুখে এগিয়ে যায়। বাইজেন্টাইনরা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তারা গির্জার দেয়াল ভাঙা শুরু করে। অনেক খ্রিস্টান গির্জায় আশ্রয় নেয়। চূড়ান্ত আক্রমণে একযোগে স্থল এবং সামুদ্রিক আক্রমণ চলছিল, যা ছিল তাদের সুপরিকল্পিত যুদ্ধ-নকশা অনুযায়ী। মুজাহিদরা শাহাদাতলাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই তারা বীরত্বের সাথে নিজেকে উৎসর্গ করে শত্রুবাহিনীর সম্মুখে এগিয়ে যায়। অনেক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ সমানতালে চলছিল; কিন্তু যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র ছিল লাইকুস উপত্যকায়। সেখানে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। উসমানি সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের সেনানীগণ প্রাচীর আর খ্রিষ্টানদের লক্ষ্য করে তাদের প্রতিরোধকারীদের পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য তিরের ঢিল ছুড়ে মারছিলেন। বাইজেন্টাইনদের দৃঢ়তা এবং উসমানিদের বীরত্বে উভয় পক্ষের দুর্গতদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।[২৪২] আক্রমণকারী অগ্রভাগের ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর সুলতান আরেক বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাই অগ্রভাগের বাহিনী পেছনে চলে এসে অপর বাহিনীকে সুযোগ করে দেয়। এদিকে প্রতিরোধকারীদের ক্লান্তি জেঁকে বসেছিল। উসমানি নতুন বাহিনী প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়ে যায়। তারা গুরুতর আক্রমণের জন্য শত শত সিঁড়ি প্রস্তুত করে; কিন্তু খ্রিষ্টানরা সিঁড়ি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। আক্রমণকারীদের প্রচেষ্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে। বাইজেন্টাইনরাও প্রাচীরে আরোহণ থেকে বাঁধাপ্রদানের জন্য তাদের চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। সেই আক্রমণের দুই ঘণ্টা পর সুলতান ফাতিহ তার সৈন্যদলকে খানিক বিশ্রাম নেওয়ার আদেশ দেন। সেদিকের প্রতিরোধকারীরাও তখন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই সুলতান তৃতীয় আরেক বাহিনীকে সেদিক দিয়ে হামলা করার নির্দেশ দেন। প্রতিরোধকারীরা ভেবেছিল—পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে। উসমানিরা ক্লান্ত হয়ে গেছে;

[২৪১] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৩০।
[২৪২] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর*, পৃষ্ঠা : ৩৮০।

কিন্তু এ নতুন আক্রমণে তারা পেরেশান হয়ে যায়। তখন নতুন আক্রমণকারীরা বিশ্রাম আর প্রস্তুতি শেষে তাদের টগবগে রক্ত নিয়ে যুদ্ধে তাদের অংশ বুঝে নেওয়ার জন্য পুরোদমে উদ্যমী হয়েছিল।[২৪৩]

অনুরূপ জলভাগেও চলছিল তুমুল লড়াই, যা প্রতিরোধকারীদের শক্তি বিভক্ত করে দিয়েছিল আর তাদেরকে একই সময়ে কয়েকদিকে ব্যস্ত রেখেছিল। সকালের আলো ফোঁটার সাথে সাথেই আক্রমণকারীরা শত্রুদের আরও কিছু স্থান আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। তারা আক্রমণকে আরও জোরদার করে। মুসলিমগণ তাদের আক্রমণ সফল করার জন্য প্রবল উৎসাহী এবং আগ্রহী ছিলেন। তা সত্ত্বেও সুলতান তার সৈন্যদলকে সরে যেতে বলেছিলেন যেন কামানগুলো খানিকটা বিশ্রাম পায় এরপর আবার তার কাজ শুরু করতে পারে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে কামানগুলো প্রাচীর এবং তার প্রতিরোধকারীদের ওপর গোলাবৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে, যা দীর্ঘ রাত জেগে থাকা প্রতিরোধকারীদের একেবারে ক্লান্ত করে দেয়। কামানবাহিনী শান্ত হওয়ার পর একদল নবোদ্যমী জেনোসারি সৈন্যদল এগিয়ে আসে। যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুলতান নিজে। তিনি তাদের হাতে আক্রমণকারীদের তির-তূণির তুলে দেন, যা কখনোই প্রতিরোধকারীদের দমনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেনি।

জেনোসারি সৈন্যরা আক্রমণে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে। শত্রুদের হতবাক করে দিয়ে তাদের ত্রিশজন প্রাচীর আরোহণে সক্ষম হয়। তাদের সকলেই শাহাদাতবরণকে পাত্তা না দিয়ে তাদের মধ্যকার অধিনায়কের মাধ্যমে তুবে কাবি দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশের পথকে উন্মোচিত করে দেয় এবং সেখানে উসমানিদের পতাকাকে সুউচ্চে উত্তোলিত করে।[২৪৪] যা বাকি সেনাদের জোশ আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা একযোগে শত্রুদের বাহুতে আঘাত করে। ঠিক তখনই প্রতিরোধকারীদের সেনাপতি জুসতানিয়ান মারাত্মকভাবে আহত হয়, যা তাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রস্থানে বাধ্য করে।[২৪৫] বাকি প্রতিরোধকারী সেনাদের মধ্যে এর বেশ প্রভাব পড়ে। বাইজেন্টাইন সম্রাট নিজেই জুসতানিয়ানের স্থলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করেন। ওদিকে জুসতানিয়ান যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গিয়ে একটি জাহাজে করে পলায়ন করে। সম্রাট প্রতিরোধকারীদের অটল রাখতে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। যাদের অন্তরে সম্ভাব্য পরাজয়ের নৈরাশ্য গেঁথে গিয়েছিল। তখন সুলতান ফাতিহের পরিচালনায় তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন আক্রমণ হচ্ছিল, যা প্রতিরোধকারীদের মনোবল ক্রমেই দুর্বল করে দিচ্ছিল।

শহরের অন্যপ্রান্তেও উসমানি সেনাগণ তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তারা প্রাচীর আক্রমণ করে কয়েকটি টাওয়ার অধিকৃত করতে সক্ষম হন। আর বাবে

[২৪৩] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৮১।
[২৪৪] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৮২।
[২৪৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৩৭।

আদ্রিয়ানোপলের প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করে সেখানে উসমানি সাম্রাজ্যের পতাকা উত্তোলন করেন। উসমানি সেনাবাহিনী সেদিক দিয়ে তরঙ্গের মতো শহরে প্রবেশ করতে থাকে। সম্রাট কনস্টান্টিন যখন শহরের দক্ষিণ দিকের টাওয়ারগুলোতে উসমানি সাম্রাজ্যের পতাকার পতপতানি দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে যান আর প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কেউ যাতে না চিনে তাই তিনি তার রাজকীয় পোশাক খুলে ফেলেন। তিনি তার দুর্গ থেকে বেরিয়ে লড়াই করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।[২৪৬]

সম্রাটের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়া উসমানি সেনাবাহিনীর মনোবল আরও বাড়িয়ে দিতে এবং খ্রিষ্টান প্রতিরোধকারীদের দৃঢ় সংকল্প গুড়িয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছিল। উসমানি সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে যায়। নেতৃত্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রতিরোধকারীরা পালিয়ে যায়। এভাবেই মুসলিমগণ শহরের ওপর আধিপত্যলাভে সক্ষম হন। তখন সুলতান ফাতিহ রহিমাহুল্লাহু তাআলা তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্যদলের সাথে বিজয়ের আনন্দ এবং শত্রুদের পরাজিত করার মাধ্যমে সফলতা অর্জনের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকেন। তার সেনাপতিরা তাকে অভিবাদন জানাতে থাকে। তিনি বলছিলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা শহিদগণকে দয়া করুন এবং মুজাহিদগণকে সম্মান ও মর্যাদা দান করুন। গর্ব এবং কৃতজ্ঞতা আমার রাজত্বের জন্য।'[২৪৭]

তখনো শহরের ভেতরে কিছু গোপন প্রতিরোধকারী সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। তারা বেশ কজন মুজাহিদের শাহাদাতের কারণ হয়। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা পালিয়ে গির্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ৮৫৭হিজরির ২০ জমাদাল উলা মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের ২৯ মে। সেদিন তারা আর প্রকাশ্যে বের হয়নি। সুলতান ফাতিহ শহরের মধ্যভাগে তার সেনা এবং সেনাপতিদের নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। তারা বারবার বলছিলেন, মাশাআল্লাহু। সুলতান তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাহ! তোমরা তো কুসতানতিনিয়া বিজেতা হয়ে গেলে, যাদের সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। তাদেরকে সাহায্যের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর তাদেরকে নিষেধ করেছেন হত্যা করতে। আদেশ করেছেন মানুষের প্রতি দয়া এবং কোমল আচরণ করার।' এরপর তিনি তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করেন এবং তার কাছে বিনয় প্রকাশের জন্য জমিনের ওপর সেজদা করেন।[২৪৮]

বারো : পরাজিত খ্রিষ্টানদের সাথে সুলতান ফাতিহের আচরণ

[২৪৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৩৯।
[২৪৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৩১।
[২৪৮] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৮৩।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ হাজিয়া সুফিয়া গির্জার দিকে মনযোগী হলেন। সেখানে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। তাদের সাথে ছিল তাদের যাজকগণ, যারা তাদের সাথে নিয়ে প্রার্থনা করত। সুলতান যখন গির্জার দরজার কাছে এলেন তখন ভেতরের লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। একজন যাজক এসে সুলতানকে দরজা খুলে দেন। তিনি যাজকের কাছে বলেন, লোকেরা যেন শান্ত ও নির্ভয় থাকে এবং নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফিরে যায়। এতে খ্রিষ্টানরা নিশ্চিন্ত হয়। কয়েকজন যাজক গির্জার কুঠুরীতে লুকিয়ে ছিলেন। যখন তারা সুলতানের ক্ষমাসুলভ আচরণ দেখলেন তখন তারা বের হয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। সুলতান ফাতিহ গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করতে বলেন। যেন আগামী জুমআর নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারেন। শ্রমিকরা এ কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা সেখানকার ক্রুশ এবং মূর্তিগুলো সরিয়ে নেয়। চুন দিয়ে গির্জার প্রতিকৃতিগুলো মুছে দেয়। খতিবের জন্য মিম্বার নির্মাণ করে। গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করা জায়েজ আছে। কেননা, শহরকে বিজয় করা হয়েছে। আর ইসলামি শরিয়তে বিজয় ধর্তব্য বলে বিবেচিত।

সুলতান খ্রিষ্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজ পালনের স্বাধীনতা দেন এবং শহরের বিচারকার্যে যাদের অধিকার রয়েছে তাদের সেই ধর্মীয় যাজক নির্বাচনের সুযোগ দেন। অন্যান্য প্রদেশের গির্জার যাজকদেরকেও তিনি এই অধিকার দান করেন। পাশাপাশি তিনি সকলের জিজিয়া নির্ধারণ করে দেন।[২৪৯]

ইংরেজ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড সিব্রডেক্রেসি তার গ্রন্থ 'تاريخ العثمانية الاتراك' এর মধ্যে কুসতানতিনিয়া বিজয়ের ইতিহাস বিকৃতি করতে চেয়েছে। সে ইসলামি বিজয়ের প্রতি হিংসা এবং ঘৃণাবশত সুলতান মুহাম্মদকে নিকৃষ্ট গুণাবলি দ্বারা বর্ণনা করে।[২৫০] ১৯৮০ সালে আমেরিকানদের প্রকাশনা জগতে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুশেডীয় বিদ্বেষপূর্ণ রচনার যাত্রা শুরু হয়। তারা ধারণা করে সুলতান ফাতিহ অধিকাংশ খ্রিষ্টানকেই গোলাম বানিয়েছিলেন। তাদেরকে আদ্রিয়ানোপল শহরের গোলাম-বাঁদির বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।[২৫১]

বাস্তবিক এবং পক্ষপাতবিহীন ইতিহাসে উল্লেখ আছে—সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়ার বাসিন্দাদের সাথে দয়াদ্র আচরণ করেছিলেন। তিনি তার সৈন্যদেরকে বন্দিদের সাথে কোমল এবং সদাচারণের আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তার বিশেষ সম্পদ থেকে তাদের অধিকাংশের ফিদয়া তথা মুক্তিপণ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে গ্রিসের নেতা এবং ধর্মীয় যাজকদের ফিদয়া দিয়েছিলেন। বিশপদের সাথে বৈঠক করে তাদের ভীতি

[২৪৯] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৮৪।
[২৫০] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৬৫।
[২৫১] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৬৭।

দূর করেছিলেন। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি এবং তাদের গির্জা নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। সুলতান খ্রিষ্টানদেরকে তাদের একজন নতুন নেতা নির্বাচন করতে বলেন। তারা আজাদিয়ুসকে নেতা নির্বাচন করে। সে নির্বাচিত হয়ে বিশপদের নিয়ে সুলতানের আবাসস্থলে যায়। সুলতান তাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান এবং তাকে যথাযথ সম্মান করেন। তাদের সাথে খাবার খান এবং ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন। সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ শেষে খ্রিষ্টান নেতার উসমানি এবং তুর্কিদের সম্পর্কে; বরং সমস্ত মুসলিমদের সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যায়। উপলব্ধি করে সে এমন একজন বুদ্ধিদীপ্ত শাসকের সামনে আছে, যিনি একটি মজবুত বিশ্বাসী এবং উন্নত মানবতার অধিকারী। তার ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ। রোমীয়রাও তাদের নেতার চেয়ে কম প্রভাবিত হয়নি। তারা মনে করেছিল তাদেরকে অবশ্যই ব্যাপকভাবে হত্যা করা হবে। এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই শহরে লোকেরা তাদের প্রাত্যহিক জীবন নিরাপত্তার সাথে এবং শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে থাকে।[২৫২]

উসমানিগণ ইসলামি রীতিনীতি আঁকড়ে ধরায় আগ্রহী ছিলেন। তাই তাদের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যা তারা বাস্তবায়ন করেছেন। খ্রিষ্টানদের সাথে তাদের আচরণ কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক এবং দাম্ভিকতা পূর্ণ ছিল না। ধর্মীয় কারণে খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করার ভাবনা উসমানিদের মাথায়ই আসেনি।[২৫৩]

উসমানিদের শাসনামলে খ্রিষ্টানরা তাদের প্রত্যেক ধর্মীয় অধিকার লাভ করেছে। প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তারা সুলতানের রাজত্বের বিপরীত কিছুই বলতেন না। এদের প্রত্যেক জাতির জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইবাদতগাহ এবং মঠ ছিল। কেউ তাদের সম্পদে দখলদারী করত না। তাদের ইচ্ছেমতো ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতাও ছিল।[২৫৪]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়ার খ্রিষ্টানদের সাথে যে ক্ষমাসুলভ আচরণ করেছিলেন তা ছিল ইসলামের মহৎ শিক্ষাকে যথাযথ আঁকড়ে ধরার এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুকরণের ফল। যাদের ইতিহাসের খাতা শত্রুদের সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণের ঘটনা দ্বারা সমৃদ্ধ।[২৫৫]

[২৫২] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৩৪, ১৩৫।
[২৫৩] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৭৪।
[২৫৪] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৮৩।
[২৫৫] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ২৮৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আক্ষরিক অর্থে কনস্টান্টিনোপল বিজেতা

শায়খ আক শামসুদ্দিন

তিনি হলেম মুহাম্মদ ইবনে হামজা আদ-দিমাশকি আর-রুমি। তার পিতার সাথে রোমে আসেন। এখানেই নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এভাবেই তিনি তার সময়ের উসমানিগণের মধ্যে একজন ইসলামি সভ্যতার নক্ষত্রে পরিণত হন।

তিনিই ছিলেন সুলতান ফাতিহের শিক্ষক এবং অভিভাবক। তার বংশধারা খলিফা আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে গিয়ে মিলে। তিনি ৭৯২হিজরি মোতাবেক ১৩৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর আমাসিয়া, হালব, আঙ্কারা প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন।

শায়খ আক শামসুদ্দিন সে সময়ে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহকে কুরআনুল কারিম, সুন্নতে নববি, ইসলামি ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং বিভিন্ন ভাষার (যেমন আরবি, ফার্সি, তুর্কি) মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি তিনি তাকে জাগতিক জ্ঞান, যেমন : শারীরিক শিক্ষা, ইতিহাস এবং যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দিতেন। শায়খ আক শামসুদ্দিন ছিলেন ওই সমস্ত উলামায়ে কেরামের অন্তর্গত—যারা সুলতান মুহাম্মদ ম্যাগনেশিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার সময় তার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন, যেন তারা তাকে প্রশাসনিক এবং শাসনতন্ত্রের নিয়ম-নীতি প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

শায়খ আক শামসুদ্দিন তখন বালক সুলতানকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিস দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, ‘অচিরেই কুসতানতিনিয়া বিজিত হবে। সেই বিজয়ী শাসক কতইনা উত্তম! আর সেই বিজয়ী সেনাবাহিনী কতইনা উত্তম সেনাবাহিনী!’

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ যখন উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন তখন তিনি অল্প বয়স্ক যুবক ছিলেন। তখন তার অভিভাবক শায়খ আক শামসুদ্দিন তাকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে হাদিস বাস্তবায়নের জন্য মনোযোগী হতে বলেন। এর ফলেই উসমানিগণ স্থল এবং জলভাগে কুসতানতিনিয়া অবরোধ করে। ৫৪ দিনব্যাপী তুমুল লড়াই অব্যাহত থাকে।

যখন বাইজেন্টাইনরা তাদের সাময়িক বিজয় লাভ করেছিল এবং তাদের চারটি জাহাজ উসমানি সীমানায় প্রবেশ করাতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছিল তখন তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেসময় খ্রিষ্টান পোপ উসমানিদের কাছে পত্র প্রেরণ করে। উসমানি আমির-উমারা এবং উজিরগণ একত্র হয়ে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা সুলতানকে বলেন, ‘আপনি একজন শায়খের কথা শুনে বিশালসংখ্যক সেনাবাহিনী দিয়ে এই অবরোধ করিয়েছিলেন। এখন আমাদের সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমাদের অনেক শক্তি বিনষ্ট হয়েছে। এ কথা তারা শায়খ আক শামসুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয় যখন দুর্গের ভেতরের কাফেরদের জন্য ফ্রান্সের সাহায্য আসে। তাদের এ বিজয়ের প্রত্যাশা কখনোই ছিল না’।[২৫৬]

এ কথা শুনে সুলতান তার উজির অলি উদ্দিন আহমদ পাশাকে শায়খ শামসুদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে তার কাছে এর প্রতিকার জানতে চান। শায়খ জবাব দেন, ‘আল্লাহ অব্যশ্যই বিজয়ের মাধ্যমে অনুগ্রহ করবেন’।[২৫৭] সুলতান এই উত্তরে সন্তুষ্ট হননি। তিনি আবার তার উজিরকে শায়খের কাছে পাঠান, যেন তিনি আরেকটু স্পষ্ট করে দেন। তাই শায়খ আক শামসুদ্দিন তার ছাত্র সুলতান ফাতিহের কাছে এই চিঠি লিখে পাঠান, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সম্মানদাতা এবং সাহায্যকারী। ওই জাহাজের দুর্ঘটনা আমাদের অন্তর ছোট করে দিয়েছে এবং তিক্ততা এনে দিয়েছে। আর কাফেরদের অন্তরে বইয়েছে আনন্দ এবং উৎফুল্লতা। প্রমাণিত সত্য হলো, বান্দা কাজ পরিচালনা করে এবং আল্লাহ তাআলা সে কাজ পরিচালনার ক্ষমতা দান করেন। আর সকল কাজের সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চেয়েছি এবং কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করেছি। নিশ্চয় তা ঘুম পরবর্তী তন্দ্রাভাবের মতো দূর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ শুরু হওয়ার ফলে এমন কিছু সুসংবাদ প্রকাশ পেয়েছে যা পূর্বে কখনো প্রকাশ পায়নি’।[২৫৮]

শায়খের এই চিঠি আমির-উমারাগণকে প্রশান্তি এবং নিশ্চয়তা দেয়। তৎক্ষণাৎ উসমানি সামরিক বিভাগ কুসতানতিনিয়া বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত স্থির করে

---

[২৫৬] *আল-বুতুলাতু ওয়াল ফিদায়ু ইনদাস সুফিইয়্যাতি,* আসাদ আল-খতিব, পৃষ্ঠা : ১৪৬।
[২৫৭] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৩।
[২৫৮] প্রাগুক্ত।

ফেলে। এরপর সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ শায়খের তাঁবুতে গমন করে তার হাত চুম্বন করেন। আর বলেন, 'হে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিন যার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব, যেন তিনি আমাকে তাওফিক দেন। তিনি সুলতানকে একটি দোয়া শিখিয়ে দেন। সুলতান তার তাঁবু থেকে বের হয়ে ব্যাপকভাবে হামলার ঘোষণা দিয়ে দেন।[২৫৯]

সুলতান চেয়েছিলেন—যুদ্ধের সময় শায়খ যেন তার পাশে থাকেন। তাই তিনি শায়খের কাছে দূত প্রেরণ করেন। আর শায়খ চাইতেন, কেউ যেন তার তাঁবুতে প্রবেশ না করে। তাই তার তাঁবুর প্রহরীরা সুলতানের দূতকে তাঁবুতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করে। এতে সুলতান ফাতিহ রাগান্বিত হয়ে নিজেই শায়খের কাছে গমন করেন। শায়খের আদেশ অনুযায়ী প্রহরীরা তাকেও বাধা দেয়। তাই সুলতান তার খঞ্জর বের করে তাঁবুর এক দিকের দেয়াল ছিড়ে ফেলেন। ভিতরে তাকাতেই দেখেন তার শায়খ আল্লাহ তাআলার কাছে দীর্ঘ সেজদারত। তার পাগড়ি তার মাথা থেকে পড়ে রয়েছে আর তার সফেদ চুলগুলো জমিন স্পর্শ করছে। তার সফেদ দাঁড়িগুলো চুলের সাথে মিলে আলোর মতো চমকাচ্ছে। এরপর সুলতান শায়খকে সেজদা থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেন। তার গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি তার প্রভু আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য এবং বিজয় সন্নিকটে করে দেওয়ার জন্য দোয়া এবং রোনাজারি করছিলেন।[২৬০]

সেখান থেকে সুলতান ফাতিহ যুদ্ধস্থলে ফিরে আসেন। প্রতিবন্ধক প্রাচীরের দিকে তাকান। দেখতে পেলেন উসমানি সৈন্যগণ প্রাচীরের কয়েকজায়গায় ফাটল তৈরি করেছে, তা দিয়ে সৈন্যরা তরঙ্গের মতো কুসতানতিনিয়ায় প্রবেশ করছে।[২৬১] সুলতান এ দৃশ্য দেখে আনন্দিত হয়ে বলেন, 'আমার আনন্দ শহর জয়ের জন্য নয়। আমার সময়ে এমন মানুষের অস্তিত্বের কারণেই আমি এত আনন্দিত।'[২৬২]

শাওকানি তার গ্রন্থ *বদরুত তালি* এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, শায়খ শামসুদ্দিনের বরকত এবং মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছিল। যেদিন কুসতানতিনিয়া বিজয় হয় সেদিন তিনি নিজ হাতে সুলতানকে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[২৬৩]

যখন উসমানি সৈন্যগণ তাদের শক্তি ও উদ্দীপনার সহিত তরঙ্গের ন্যায় শহরে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন শায়খ সুলতান ফাতিহের কাছে আসেন। তাকে যুদ্ধের ব্যাপারে

[২৫৯] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৩।
[২৬০] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৪।
[২৬১] প্রাগুক্ত।
[২৬২] *আল-বদরুত তালি,* ২/১৬৭।
[২৬৩] *আল-বদরুত তালি,* ২/১৬৬।

আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধ স্মরণ করিয়ে দেন। আর ইসলামি শরিয়তে বিজিত জাতির প্রতি যে সমস্ত হক রয়েছে সেগুলোও মনে করিয়ে দেন।[২৬৪]

বিজয়ের পর সুলতান ফাতিহ বিজয়ী সৈন্যগণকে বিভিন্ন পুরস্কার এবং উপঢৌকনের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। তাদের জন্য খাবারের বিশাল আয়োজন করেন। যা ছিল তিন দিনব্যাপী। এতে বেশ সাজসজ্জা করা হয়। সুলতান নিজেই তার সেনাদের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। 'জাতির নেতা তাদের সেবক' এই কথার অনুসরণ করে। এরপর শায়খ আক শামসুদ্দিন দাঁড়িয়ে সৈন্যগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন—'হে ইসলামের সৈন্যরা, জেনে রাখো এবং স্মরণ রাখো, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে বলেছেন—'কুসতানতিনিয়া অচিরেই বিজিত হবে। বিজয়ী শাসক কতইনা উত্তম আর সেই বিজয়ী সৈন্যদল কতইনা উত্তম সৈন্যদল।' আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক এবং ক্ষমা কামনা করি। তোমরা অর্জিত গনিমতের মালের অপচয় করবে না। শহরের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তা খরচ করবে। তোমরা তোমাদের সুলতানকে মান্য করবে, তার অনুসরণ করবে এবং তাকে মহব্বত করবে। এরপর তিনি সুলতান ফাতিহের দিকে তাকিয়ে তাকে উদ্দেশ করে বলেন—'হে সুলতান, আপনি আলে উসমানের চোখের মণি হয়ে গেলেন। তাই সদা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদের ওপর অটল থাকুন। এরপর তিনি উচ্চচস্বরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করেন।[২৬৫]

কুসতানতিনিয়া বিজয়ের পর শায়খ আক শামসুদিন প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমাধিস্থল জিয়ারতে যান, যা কুসতানতিনিয়ার প্রাচীরের নিকটবর্তী এক স্থানে অবস্থিত ছিল।[২৬৬]

শায়খ আক শামসুদ্দিন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদে হাজিয়া সুফিয়ায় জুমার নামাজের খুতবা দিয়েছিলেন।[২৬৭]

শায়খ আক শামসুদ্দিন সুলতানের দাম্ভিকতার আশংকা করতেন

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার অভিভাবক শায়খ শামসুদ্দিনকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তার অন্তরে শায়খ শামসুদ্দিনের বিরাট স্থান ছিল। বিজয়ের পর সুলতান তার আশপাশের লোকদের বলেছিলেন—'তোমরা আমাকে আজ আনন্দিত দেখতে

[২৬৪] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৪।
[২৬৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৪৯।
[২৬৬] প্রাগুক্ত।
[২৬৭] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৪।

পাচ্ছ, আমার আনন্দ শুধু এই শহর বিজয়ের কারণে নয়। আমার আনন্দ আমার সময়ে এমন প্রিয়, সম্মানিত শায়খের বেঁচে থাকার কারণে। তিনি আমার অভিভাবক শায়খ আক শামসুদ্দিন'।

সুলতান ফাতিহ তার উজির মাহমুদ পাশার সাথে এক কথোপোকথনে শায়খের প্রতি তার ভয়ের কথা ব্যক্ত করেন। সুলতান বলেন—'আমার অনিচ্ছাতেও আমি শায়খকে সম্মান জানাতে বাধ্য। আমি তার পাশে কোনো কাজ করতে ভয় পাই'।[২৬৮]

আল-বদরুত তালি গ্রন্থকার উল্লেখ করেন—এরপর একদিন বাদে সুলতান ফাতিহ শায়খ শামসুদ্দিনের কাছে আসেন। তিনি শুয়ে ছিলেন। সুলতানের জন্য উঠে দাঁড়াননি। তখন সুলতান তার হাতে চুম্বন করে তাকে বলেন, আপনার কাছে এক প্রয়োজনে এসেছি। তিনি বললেন, কী প্রয়োজন? সুলতান বললেন, আমি আপনার সাথে নির্জনতা অবলম্বন (নির্জনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত) করতে চাই। শায়খ অস্বীকৃতি জানালে সুলতান বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন; কিন্তু শায়খ বরাবরের মতোই না বলে দেন। তখন সুলতান রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেন, আপনার কাছে এক তুর্কি আসলে আপনি তাকে এক কথায় নির্জন বাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। আর আমার ব্যাপারে অস্বীকার করছেন! তখন শায়খ বললেন, 'তুমি যদি নির্জনতা অবলম্বন করো তাহলে এমন এক স্বাদ পাবে, ফলে রাজত্ব থেকে তোমার মনোযোগ সরে যাবে। ফলে রাজত্ব পরিচালনায় বিঘ্নতা ঘটবে আর আল্লাহ আমাদের এর শাস্তি দেবেন। আর এই নির্জনতার মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যায়পরায়ণতা। সুতরাং তুমি এমন এমন কাজ করো। তাকে কিছু নসিহতমূলক কাজের কথা বলে দেন। এরপর সুলতান শায়খকে এক হাজার দিনার দেন; কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। সেখান থেকে বের হয়ে সুলতান মুহাম্মদ খান তার সাথের লোকদের বলেছিলেন, 'দেখেছ, শায়খ আমার জন্য দাঁড়ালেন না। তারা তাকে বললেন, হয়তো তিনি আপনার মাঝে এ বিজয়ের ফলে দাম্ভিকতার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন, যে বিজয় বড় বড় সুলতানদের জন্য সহজ ছিল না তা আপনি অর্জন করেছেন। তাই তিনি এভাবে আপনার অন্তর থেকে দাম্ভিকতা মুছে ফেলতে চেয়েছেন।[২৬৯]

এমনই ছিলেন এই সম্মানিত আলেম। এভাবেই তিনি সুলতানকে ইমান, ইসলাম এবং ইহসানের অর্থ অনুযায়ী লালনপালন করেছেন। তিনি শুধু ধর্মীয় এবং আত্মশুদ্ধির জ্ঞানেই পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি উদ্ভিদ, চিকিৎসা এবং ঔষধবিদ্যাও জানতেন। তিনি তার সময়ে বিভিন্ন জাগতিক জ্ঞানের পাণ্ডিত্যের জন্য এবং উদ্ভিদের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার এতই প্রসিদ্ধি ছিল যে, তখন

[২৬৮] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৫।
[২৬৯] *আল-বদরুত তালি,* ২/১৬৭।

তিনি মানুষের কাছে উদাহরণ হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বলাবলি করত, 'নিশ্চয় উদ্ভিদগুলো শায়খ আক শামসুদ্দিনের সাথে কথাবার্তা বলে।'[২৭০]

তার সম্পর্কে শাওকানি বলেন, 'তিনি আত্মার চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি শরীরের চিকিৎসকও ছিলেন। কেননা, তখন একটি কথা প্রসিদ্ধ হয়েছিল, গাছেরা তাকে ডেকে ডেকে বলত—আমি অমুক অমুক রোগের ঔষধ। এভাবেই তার বরকত এবং মর্যাদা প্রকাশ পায়।'[২৭১]

শায়খ শামসুদ্দিন আত্মিক রোগের পাশাপাশি দৈহিক রোগের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতেন।

শায়খ শামসুদ্দিন সংক্রামক রোগের ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তার সময়ে এই রোগ হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে 'মাদ্দাতুল হায়াত' শিরোনামে তুর্কি ভাষায় একটি বই লেখেন। তিনি সেই বইয়ে লিখেছেন, 'এ কথা মনে করা ভুল যে, রোগসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক ব্যক্তির শরীরে প্রকাশ পায়। বরং রোগগুলো সংক্রামকভাবে এক ব্যক্তির দেহ থেকে আরেক ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এই সংক্রমণ এতই ছোট এবং সূক্ষ্ম যে, তা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এটা জীবন্ত বীজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।[২৭২]

এর মাধ্যমে শায়খ শামসুদ্দিন খ্রিষ্টীয় পনের শতাব্দীতেই জীবাণুর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এই সংজ্ঞা দেন। এর পরপরই মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হয়নি। শায়খ শামসুদ্দিনের জীবদ্দশার চার শতাব্দী পর কিমাইয়ায়ি এবং ফরাসি বুলুচ্চি লুইস এ বিষয়ে গবেষণা করেন।

শায়খ শামসুদ্দিন ক্যান্সার সম্পর্কেও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার সম্পর্কে লিখেছেন। চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শায়খ শামসুদ্দিন দুটি বই লিখেছিলেন। *মাদ্দাতুল হায়াত* এবং *কিতাবুত তিব*। উভয়টিই লিখিত হয়েছে তুর্কি ভাষায়। শায়খ আরবি ভাষায় সাতটি বই রচনা করেছেন। যথা : *হাল্লুল মুশকিলাত, আররিসালাতুন নুরিয়্যাহ, মাকালাতুল আউলিয়া, রিসালাতুন ফি যিকরিল্লাহ, তালখিসুল মাতায়িন, দাফউল মাতায়িন, রিসালাতুন ফি শরহি বৈরাম ওলি।*[২৭৩]

ইনতেকাল

সুলতান ফাতিহ বারবার ইস্তাম্বুলে থাকার অনুরোধ করা সত্ত্বেও শায়খ তার এলাকায় কোনিয়ুকে থাকার প্রয়োজনবোধ করে সেখানে ফিরে যান। ৮৬৩ হিজরি মোতাবেক

[২৭০] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা ৩৭৫।
[২৭১] *আল-বদরুত তালি,* ২/১৬৬।
[২৭২] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৬।
[২৭৩] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৬।

১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমত, ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির মাধ্যমে অনুগ্রহ করুন।

এমনই ছিল সৃষ্টিজীবের প্রতি আল্লাহ তাআলার রীতি। যখনই কোনো আল্লাহ ওয়ালা নেতা এবং বিজেতার আত্মপ্রকাশ ঘটত তার আশপাশে অনেক আল্লাহ ওয়ালা আলেমগণ থাকতেন। যারা তার তালিম, তারবিয়ত এবং দিকনির্দেশনায় অবদান রাখতেন। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। মুরাবিতিন সাম্রাজ্যে ইয়াহইয়া ইবনে ইবরাহিমের প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিনের অবদানের কথা আমরা জেনেছি। আর আইয়ুবি সাম্রাজ্যে শায়খ সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রতি সম্মানিত কাজির অবদানের কথা জেনেছি। এখন জানলাম উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের প্রতি শায়খ আক শামসুদ্দিনের অবদান সমন্ধে। সকলের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা তাদের সকল কাজ এবং চেষ্টা কবুল করুন। নেককারদের আলোচনায় তাদের স্থান সমুন্নত করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপ এবং ইসলামিবিশ্বে কুসতানতিনিয়া বিজয়ের প্রভাব

বিজয়ের আগে কুসতানতিনিয়া ইউরোপে ইসলাম প্রচারের একটি বৃহত্তম ঘাঁটি ছিল। এ জন্য ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলের পতনে অর্থাৎ এ অঞ্চলে ইসলামের বিজয়ে ইউরোপে মুসলিমদের ক্ষমতা এবং শান্তির বার্তা পৌঁছানোর পথ অধিক সুগম হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কুসতানতিনিয়ার বিজয় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষ করে ইউরোপ অঞ্চলের সাথে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। এমনকি ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ এই বিজয়কে মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং নতুন যুগের সূচনা বলে আখ্যা দেন।[২৭৪]

বিজয়ের পর সুলতান শহরের বিভিন্ন সংস্কারে নিয়োজিত হন। শহরকে পুনরায় সুরক্ষিত করে তিনি এখানেই উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত করেন। শহরের নাম রাখেন 'ইসলাম বুল' অর্থাৎ ইসলামের শহর।[২৭৫]

পশ্চিমা খ্রিষ্টানরা এই বিজয়ে নড়েচড়ে বসে। তাদের মাঝে ভয়, ব্যথা এবং লাঞ্ছনার অনুভূতি উৎপন্ন হয়। তাদের সামনে ইস্তাম্বুলের ইসলামি সেনাবাহিনীর উত্থান গুরুতর রূপে দেখা দেয়। তাদের কবি-সাহিত্যিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অন্তরে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের আগুণ প্রজ্বলিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকে। রাজা এবং মন্ত্রীরা অব্যাহতভাবে বড় বড় বৈঠক ও সমাবেশের আয়োজন করতে থাকে। খ্রিষ্টানরা পরস্পর মুসলিমদের বিরোধিতা এবং শত্রুতার আহ্বান করতে থাকে। পোপ পঞ্চম নিকোলাস কুসতানতিনিয়ার পতনে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। তিনি ইতালীয়

[২৭৪] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালমায উযবুনা,* পৃষ্ঠা : ৩৮৪।
[২৭৫] *তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়া, মুহাম্মদ ফরিদ বেক,* পৃষ্ঠা : ১৬৪।

রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার পেছনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার সময় ব্যয় করেছেন। রোমে একটি চুক্তিসভার আয়োজন করে তাতে তিনি বিভিন্ন রাজত্বকে পরস্পর সাহায্য করে এবং তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে তাদের সকলের শত্রুর বিরোধিতা করার ঘোষণা দেন। এই চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হয়েই যাচ্ছিল এমতাবস্থায় পোপের মৃত্যু ঘনিয়ে যায়। এর পেছনে কারণ ছিল উসমানিদের হাতে কুসতানতিনিয়ার পতনে তার হৃদয়ে সৃষ্ট দুঃখ, যন্ত্রণা এবং ব্যথা। যন্ত্রণায় ভুগে তিনি ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে মারা যান।[২৭৬]

রাজা ফিলিপ স্টিভ ডিউক বোরজুন্ডিয়া উত্তেজিত হয়ে খ্রিষ্টান রাজাদের মুসলিমদের সাথে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যান্য নেতা ও সেনাপতিরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মুসলিমদের সাথে লড়াই করা খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়। যা তাদেরকে মুসলিম দেশগুলোর সাথে লড়াইয়ে প্রলুদ্ধ করত। রোমের পোপরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের যুদ্ধ পরিচালনা করত। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ খ্রিষ্টানদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি তার রাজত্বকে শক্তিশালীকরণে এবং শত্রুর ধ্বংসকল্পে যা সমীচীন মনে করেছেন তাই বাস্তবায়ন করেছেন। এ জন্য সুলতান মুহাম্মদের পার্শ্ববর্তী আমাশিয়া, মুর অঞ্চল এবং তারাবেজের অধিবাসীরা তাদের প্রকৃত অনুভূতি ভেতরেই লুকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং আদ্রিয়ানোপলে সুলতানকে এই বিরাট বিজয়ে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তাদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছে।[২৭৭]

এদিকে পোপ দ্বিতীয় বিউস খ্রিষ্টানদের গোত্র এবং রাজত্বগুলোতে, সেনাপতি এবং সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে ক্রুসেডীয় বিদ্বেষ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য তার সর্বাত্মক ক্ষমতা এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করেছিলেন। তাদের মধ্য হতে কতক রাজ্য পোপের উসমানিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রস্তুতিও নিতে থাকে। যখন তাদের যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসার সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে তা থেকে অক্ষম হয়ে যায়। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে একশ বছর পিছিয়ে যায়। এভাবে ব্রিটেনও তাদের সাংবিধানিক ব্যাপারে এবং গৃহযুদ্ধ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। ওদিকে স্প্যানিশরা আন্দালুসের মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর ইতালীয়রা অনিচ্ছাপূর্বক এবং সম্পদের লোভে উসমানিদের সাথে সম্পর্ক মজবুতকরণে নিয়োজিত ছিল।

ক্রুসেডারদের হামলার চক্রান্ত তাদের নেতা পোপের মৃত্যুর মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যায়। ভেনিস এবং হাঙ্গেরী উভয় সাম্রাজ্যই পৃথক পৃথকভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের দিকে

[২৭৬] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৩৬-১৩৭।
[২৭৭] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৪০।

মনোযোগী হয়। ভেনিস সাম্রাজ্য তাদের উপকারের দিকে লক্ষ্য করে উসমানিদের সাথে বন্ধুত্ব এবং উত্তম প্রতিবেশী হয়ে থাকার চুক্তি করে। আর হাঙ্গেরীয়ানরা উসমানি সেনাবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে পরাজিত হয়। এভাবে উসমানিরা সার্বিয়া, গ্রিস, ওয়ালাচিয়ার, ক্রিমিয়া এবং আজারবাইজান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্বাধীন দ্বীপ তাদের আয়ত্বাধীন করতে সক্ষম হয়। এসবই সম্পন্ন হয়েছিল খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। সুলতান তাদের ওপরে হানা দিয়ে তাদের শক্তি খণ্ডিত করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে পাকড়াও করেছিলেন।[২৭৮]

পোপ দ্বিতীয় বিউস তার সকল দক্ষতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে দুইভাবে তার চেষ্টা ব্যয় করেছিলেন। প্রথমত তিনি তুর্কিদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রলুদ্ধ করেছিলেন। এ জন্য তিনি কোনো সুসংবাদ প্রদানকারী দলকে প্রেরণ করেননি। তিনি সুলতানের কাছে শুধু একটি চিঠি পাঠান। যাতে তিনি সুলতানকে খ্রিষ্টধর্মকে শক্তিশালী করতে বলেন। যেভাবে ইতোপূর্বে কনস্টান্টিন এবং ক্লোফেস খ্রিষ্টান ধর্মকে শক্তিশালী করেছে। তিনি সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন—যদি সুলতান একনিষ্ঠভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তাহলে তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। তাকে আরও প্রতিশ্রুতি দেন তার অনুগ্রহ, বরকত, তার তত্ত্বাবধান এবং জান্নাতলাভের। পোপ যখন তার এই পরিকল্পনায় ব্যর্থ হন তখন তিনি তার দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তা হলো, হুমকি, অভিশাপ এবং ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি। তার এই দ্বিতীয় পরিকল্পনারই ফলাফল ছিল এর আগে হাঙ্গেরীর হুনিয়াদের নেতৃত্বে যে ক্রুসেডবাহিনী পরাজিত হয়েছিল সেটি।

আর প্রাচ্যের ইসলামি রাজত্বগুলোতে এই মহান বিজয়ের প্রভাব সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, এশিয়া এবং আফ্রিকা অঞ্চলে মুসলিমদের মাঝে আনন্দ ছেয়ে গিয়েছিল। এই বিজয় ছিল কয়েক যুগের চেষ্টা এবং আশা। যা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এখন বাস্তবায়িত হলো। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ মিসর, হেজাজ, পারস্য, হিন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যে দূত প্রেরণ করে তাদের ইসলামের এই মহান বিজয়ের সুসংবাদ দেন। মিম্বারে মিম্বারে বিজয়ের সংবাদ প্রচার করা হয়। শুকরিয়ার নামাজ আদায় করা হয়। ঘরবাড়ি, দোকানপাট সজ্জিত করা হয় এবং দেয়ালে দেয়ালে রং-বেরঙের পতাকা এবং কাগজ লাগানো হয়।[২৭৯]

বাদায়িয়ুয যুহুর গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে ইয়াস এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন, এই সংবাদ নিয়ে যখন সুলতান ফাতিহের প্রতিনিধিদল পৌঁছলেন তখন কেল্লায় কেল্লায় ঘণ্টি বাজিয়ে সুসংবাদ দেওয়া এবং কায়েরোর অলিগলি সজ্জিত করতে বলা হয়। এরপর মিসরের

[২৭৮] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৪১।
[২৭৯] প্রাগুক্ত।

সুলতান আমির দ্বিতীয় বারসাবাই আখুরকে দূত নিযুক্ত করে সুলতান ফাতিহকে এই বিজয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে প্রেরণ করেন।[২৮০]

ইতিহাসবিদ আবুল মুহসিন ইবনে তুগরি বারদি কায়রোতে যখন সুলতান ফাতিহের প্রতিনিধিদল তাদের সাথে হাদিয়া এবং রোমের দুই বন্দি নেতাকে নিয়ে হাজির হয় তখন সেখানকার মানুষের অনুভূতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—'আমি বললাম, এই বিজয়ের প্রশংসা এবং অনুগ্রহ আল্লাহ তাআলার জন্যই। এ সময় উল্লিখিত বার্তাবাহক এলেন। তার সাথে ইস্তাম্বুলের দুজন নেতৃস্থানীয় লোক। যারা যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল। তাদেরকে নিয়ে তিনি মিসরের সুলতান ইনালের কাছে যান। তারা দুজন ছিল কুসতানতিনিয়ার অধিবাসী। ইস্তাম্বুলের সেই বিশাল গির্জার যাজক। দূত সুলতানের কাছে এবং সাধারণ জনগণের কাছে এই মহান বিজয়ের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এ সুসংবাদ পৌঁছাতে ঘণ্টি বাজানো হয় এবং কায়েরো বেশ কয়েকদিন সজ্জিত করা হয়। এরপর উল্লিখিত প্রতিনিধিদল দুই বন্দিকে নিয়ে মঙ্গলবার দিন শাওয়ালের ১৫ তারিখে মিসরের সড়কপথ অতিক্রম করে কেল্লায় গিয়ে ওঠেন। লোকেরা তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট বেশ গুরুত্বের সাথে সজ্জিত করেছিল। কেল্লায়ে জাবালে সুলতান তাদের সাথে সুলতানি আভিজাত্য অনুযায়ী আচরণ করেছিলেন।[২৮১]

ইবনে তাগরি বারদি কায়েরোতে মানুষের যে আনন্দ এবং সজ্জার কথা বর্ণনা করেন এটা সমস্ত ইসলামি রাজত্বগুলোরও চিত্র ছিল। সুলতান ফাতিহ মিসরের সম্রাট, পারস্যের শাহ, মক্কার সম্মানিত আমির এবং কিরমানের শাসকের কাছে বিজয় সংবাদের চিঠি দিয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন। অনুরূপ তিনি তার প্রতিবেশী মুর অঞ্চল, ওয়ালাচিয়ার, হাঙ্গেরী, বসনিয়া, সার্বিয়া, আলবেনিয়ার খ্রিষ্টান রাজাদের কাছে এবং তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে দূত প্রেরণ করেছিলেন।[২৮২]

মিসরের সুলতানের কাছে প্রেরিত সুলতান ফাতিহের চিঠি হতে...

মিসরের সুলতান ইনালের কাছে সুলতান ফাতিহের প্রেরিত চিঠির কিছু চুম্বকাংশ উল্লেখ করছি। এটি লিখেছিলেন শায়খ কাওরানি—

> *'আমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তম একটি রীতি হলো, তারা সবাই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মুজাহিদ ছিলেন। তারা কোনো তিরস্কার ভয় পেতেন না। আমরা সে রীতিতেই অটল আছি এবং সর্বদা সে দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকব। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—*

[২৮০] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৪২।
[২৮১] *আন-নুযুমুয যাহিরাতু ফি মুলুকি মিসরা ওয়াল কাহিরাহ,* ১২/৮১।
[২৮২] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ।

قَٰتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ –

{যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনয়ন করে না তাদের সাথে লড়াই করো।} [সুরা তওবা : আয়াত : ২৯]

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'আল্লাহর রাস্তায় যার দুই পা ধূলিমলিন হবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।' তাই আমরা এ বছর এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছি। আল্লাহ তাআলার বরকত এবং অনুগ্রহে, সুমহান এবং সম্মানিত সত্তার রশিকে আঁকড়ে ধরে, সর্বাধিপতি এবং সর্বজ্ঞ সত্তার অনুগ্রহে ইসলামের জন্য যুদ্ধের দায়িত্বপালনে ইচ্ছুক হয়েছি। আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন—

قَٰتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ...

{তোমরা তোমাদের বিরোধী কাফেরদের সাথে লড়াই করো।} [সুরা তাওবা : আয়াত : ১২৩]।

আমরা এমন একটি শহর বিজয়ের জন্য স্থল এবং সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করেছি। যে শহর পাপী এবং কাফেরদের দিয়ে ভর্তি, যারা ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোর মাঝে থেকেও তাদের কুফরি নিয়ে গর্ব করত।

যেন তা শুভ্র গালে গোটার মতো ❁ চাঁদের চেহারায় দাগের মতো

এই শহরের এক পার্শ্ব সমুদ্র তীরবর্তী। আরেক পার্শ্ব স্থলভাগে। তাই আমরা এ শহরের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। যেমন, আল্লাহ তাআলা আমাদের আদেশ দিয়েছেন—

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ...

{তোমরা তাদের জন্য সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নাও।} [সুরা আনফাল : আয়াত : ৬০]

আমরা প্রত্যেক দরকারি পাথেয় এবং সকল নির্ভরযোগ্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছি। যেমন : স্থলপথের জন্য বিজলি, বজ্র, মিনজানিক, কংকর, পাথর ইত্যাদি। আর সমুদ্রে পর্বতসদৃশ জাহাজসমুহ প্রস্তুত করেছি। ৮৫৭ হিজরির ২৬ রবিউল আউয়ালে আমরা সে শহরে অবতরণ করেছি।

আমি আমার নফসকে বললাম—*তুমি দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করো এবং আমাকে সাহায্য করো, এটাই তো আমার কামনা।*

তাদেরকে যতই সত্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে তারা তাদের কথায় অটল থেকেছে এবং অহংকার করেছে। তারা ছিল কাফের। তাই আমরা তাদেরকে অবরোধের মাধ্যমে

বেষ্টন করে নিলাম। আমরা তাদের সাথে লড়াই করলাম, তারাও আমাদের সাথে লড়াই করল। আমরা তাদের মারলাম, তারাও আমাদের মারল। তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে ৫৪ দিন এবং রাতব্যাপী যুদ্ধ চলল।

তখনই এল আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়—*যা সহজ করা দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য বিষয়।*

জুমাদাল উলার ২০ তারিখ মঙ্গলবার সকাল হতেই আমরা তাদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম যেমন করে নক্ষত্র দ্বারা শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। সিদ্দিকি শাসনের বরকতে, ফারুকি ন্যায়ের বদৌলতে এবং হায়দারি তরবারির আঘাতে শহরের নিয়ন্ত্রণ উসমানি বংশধরদের হাতে চলে আসে। সূর্য আরেকবার তার উদয়স্থল থেকে প্রকাশ পাওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা বিজয়দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন—

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ'بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ ـ

{এই দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে, বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত গুরুতর এবং তিক্ততর।}
[সুরা কমার, আয়াত : ৪৫, ৪৬]

প্রথমে তাদের অভিশপ্ত নেতাকে হত্যা করা হয় এবং তার মস্তক ছিন্ন করা হয়। এরপর তারা আদ এবং সামুদ জাতির ন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। আজাবের ফেরেশতাগণ তাদের পাকড়াও করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। তা কতইনা নিকৃষ্টস্থল! তাদের মধ্য হতে অনেকে নিহত হয় আর যারা বেঁচে ছিল তারা বন্দি হয়। উসমানিরা তাদের ধনভাণ্ডারে হামলা করে তাদের খনি এবং মাটির নিচের অলংকার বের করে নিয়ে আসে। তাদের ওপর এমনও সময় এসেছিল যখন তারা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তারাই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের শক্তি কর্তন করে ফেলে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই। সেদিন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে আনন্দিত হবে। আমরা সেই অপবিত্র দুরাচারীদের ওপর বিজয় লাভ করে গির্জাকে যাজক থেকে পবিত্র করেছি। সেখান থেকে ক্রুশ এবং শিঙ্গা বের করেছি। এভাবে আমরা মূর্তিপূজকদের ইবাদতের স্থানকে মুসলিমদের মসজিদ বানিয়েছি। আমরা সে স্থানকে খুতবার মাধ্যমে সম্মানিত করেছি। এভাবেই আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড ধ্বংস হয়েছে।[২৮৩]

সুলতান ফাতিহ মিসরের সুলতানের ন্যায় মক্কার সম্মানিত আমিরের কাছেও চিঠি পাঠিয়েছেন। মিসরের সুলতান সুলতান মুহাম্মদকে সম্বোধন করে ফিরতি চিঠি প্রেরণ

[২৮৩] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৬৩-১৬৭।

করেন এবং তাকে উঁচুমানের সাহিত্যের গদ্য উপহার পাঠান। তার মধ্যে কিছু কবিতার পংক্তিও ছিল। যেমন : কবি বলেন—

'আমি তাকে কুমারী সম্বোধন করেছিলাম
তার মোহর দিয়েছিলাম ঘোড়া এবং শস্যদানা
রাতের আলাপ যার মোহর হবে
আমি তার জন্য দুর্গের শুভ্র কক্ষে বাসর সাজাব
আল্লাহু আকবার, তুমি সে বীজের কতইনা উত্তম ফল
যে বীজ বপণ করেছিলেন তোমার পিতা'।[২৮৪]

মিসরের সুলতানের চিঠিতে এই পংক্তিও ছিল। কবি বলেন—

'আল্লাহু আকবার—এটাই সেই সাহায্য এবং বিজয়
এই সেই বিজয় যা মানুষ ধারণাও করতে পারেনি
মিসরের সুলতানের কবি কুসতানতিনিয়া বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাগুলো যেন আল্লাহর জন্যেই হয়
অন্যথায় ভগ্ন চোখকে ঘৃণা করো না
তোমার দলের অশ্বগুলো ঝড়োগতির
যখন তাকে উত্তাল রণাঙ্গনে ছেড়ে দেওয়া হয়
সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে আপনি অর্জন করেছেন বিজয়ের পতাকা
সাহায্য, অমরত্ব, দাস এবং সেবক কেবল আল্লাহর তরেই
হে ইসলামের সাহায্যকারী, হে মহান সেনাপতি যিনি সময়ের
কালচক্রে কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন
আপনাকে শুভেচ্ছা এমন বিজয়ের—পৃথিবীতে যার চর্চা হয়েছে
মেঘমালা চালিত করে নিয়ে গেছে পূবালি বাতাস এবং নিয়ামত।[২৮৫]

মক্কা শরিফের ইমামের কাছে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের চিঠি

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়া বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে মক্কা শরিফের সম্মানিত ইমামের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। তার কাছে দোয়া চান। গনিমতের সম্পদ হতে তার জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

[২৮৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৭৫।
[২৮৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৭৭।

এখানে চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো—

মক্কা শরিফের ইমামের প্রশংসা সম্বলিত ভূমিকার পর সুলতান বলেন—'আমি এই চিঠিকে প্রেরণ করেছি, এ বছর আল্লাহ তাআলা আমাদের যে বিজয় দিয়েছেন সেই খুশিতে। এমন বিজয় যা কখনো কোনো চক্ষু দর্শন করেনি এবং কারও কর্ণগোচর হয়নি। কুসতানতিনিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই বিজয় দান করেছেন। তাই আপনার সম্মানে সবিনয় নিবেদন—যেন আপনি এই বিরাট সুসংবাদ এবং বিশাল দানের আগমনের কথা প্রচার করেন। হারামাইন শরিফাইনের বাসিন্দাগণের সাথে, সম্মানিত আলেম-উলামা এবং নেতৃবৃন্দের সাথে, সৎ এবং দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গগণের সাথে, সম্মানিত শায়খগণের সাথে, খোদাভীরু সকল সম্মানিত ব্যক্তি এবং ইমামগণের সাথে, ছোট-বড় সবার সাথে, কাবার দেয়ালকে যারা একেবারে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে আছে তাদের সাথে, জমজম এবং মাকামে ইবরাহিমের দায়িত্বশীলগণের সাথে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যের সন্নিকটে বসে ইতিকাফকারীগণের সাথে, আরাফাতের ময়দানে আমাদের রাজত্বের স্থায়ীত্বের জন্য প্রার্থনাকারী, আমাদের সাহয্যের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে রোনাজারিকারীগণের সাথে এই বিজয়ের আলোচনা করবেন। তারা আমাদের ওপরে তাদের বরকত প্রবাহিত করে দিয়েছেন এবং তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। আমরা উদ্দেশিত সংবাদের সাথে সাথে আপনার কাছে হাদিয়া পাঠিয়েছি। বিশেষ করে আপনার জন্য সেই গনিমতের সম্পদ থেকে নেওয়া পরিপূর্ণ ওজন এবং পরিমাপের দুই হাজার ফ্লোরিয়েন খাঁটি স্বর্ণ পাঠিয়েছি। দরিদ্রদের জন্য পাঠিয়েছি সাত হাজার ফ্লোরিয়েন স্বর্ণ। দুই হাজার ফ্লোরিয়েন নেতৃস্থানীয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিগণের জন্য। একহাজার হারামাইনের সেবকগণের জন্য। আর বাকি স্বর্ণ মক্কা ও মদিনার অভাবী দরিদ্র লোকদের জন্য। আল্লাহ এই দুই শহরের সম্মান আরও বৃদ্ধি করুন। আপনার সম্মানে নিবেদন আপনি এগুলো তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজন মাফিক বণ্টনের ব্যবস্থা করবেন। আমাদের কাছে ভ্রমণের অনুভূতি ব্যক্ত করবেন। তাদের কাছ থেকে আমাদের জন্য দোয়ার ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় যেন আমরা সর্বদা তার দয়া এবং স্নেহের ছায়াতলে অবস্থান করি। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে হেফাজত করুন। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী সৌভাগ্য এবং অসীম নেতৃত্বের সহিত আপনাদের অক্ষত রাখুন।[২৮৬]

[২৮৬] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাহ*, ড. জামাল আবদুল হাদি, পৃষ্ঠা : ৪৭।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কর্তৃক প্রেরিত চিঠির জবাবে মক্কা শরিফের ইমাম লেখেন—

'আমরা তা (চিঠি) পরিপূর্ণ আদবের সাথে খুলেছি। সম্মানিত কাবার সম্মুখে হেজাজবাসী এবং আরব তরুণদের সামনে তা পাঠ করেছি। তাতে আমরা দেখেছি কুরআনের আয়াত, যা জগতবাসীর জন্য আরোগ্য এবং রহমতস্বরূপ। তার নির্যাস থেকে আমরা স্বাক্ষী হয়েছি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিজার আত্মপ্রকাশের। নিশ্চয় তা কুসতানতিনিয়ার মহান বিজয় ছাড়া আর কিছু নয়। যে শহরের দুর্গসমূহের দৃঢ়তার কথা সর্বজনবিদিত। তার প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা সাধারণ এবং বিশেষ সকল শ্রেণির লোকের কাছেই প্রসিদ্ধ। এই কঠিন কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জনের তাওফিক দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি। আমরা দূরদূরান্তে এ সংবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্বের সাথে প্রচার করেছি। আপনার সুমহান পূর্বপুরুষগণের রীতি-রেওয়াজ এবং তাদের চলার পথের নীতিমালা পুনুরুজ্জীবিত করায় আমরা যারপরনাই আনন্দিত। আল্লাহ তাদের রূহসমূহে প্রশান্তি দান করুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ কামরাসমূহকে তাদের আবাস হিসেবে নির্বাচিত করুন।[২৮৭]

[২৮৭] প্রাগুক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুসতানতিনিয়া বিজয়ের কারণ এবং উপকরণসমূহ

মুসলিমদের কুসতানতিনিয়া বিজয় এমনি এমনি হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান পরিশ্রমের ফল এই বিজয়। সে প্রজন্ম থেকেই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ বাস্তবায়নে আগ্রহী ছিলেন। উসমানি সাম্রাজ্যের আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে কুসতানতিনিয়া বিজয়ের প্রতি গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো উসমানি সালতানাতের সুলতানগণ উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সেই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যা তার জিহাদি জীবনকথা হতে প্রকাশ পায় এবং আল্লাহ তাআলার এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা থেকে প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ -

{আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে।} [সুরা আনফাল, আয়াত : ৬০]

এই আয়াত থেকে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বুঝে নিয়েছিলেন যে, এই দ্বীনের ক্ষমতার জন্য সকল প্রকারের এবং সকল ধরনের শক্তির প্রয়োজন। তিনি তার বরকতময় জিহাদগুলোতে এই আয়াতের কার্যকরী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাই তিনি কুসতানতিনিয়ার সেই বিরাট অবরোধ দাঁড় করিয়েছিলেন এবং সে সময়কার প্রসিদ্ধ সকল অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহে কার্পণ্য করেননি। যেমন : কামান, অশ্বারোহী, তিরন্দাজ প্রভৃতি।

মুহাম্মদ আল-ফাতিহের নেতৃত্বে যে সেনাবাহিনী কুসতানতিনিয়া অবরোধ করেছিলেন তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের শিক্ষাদীক্ষা

ছিল ইমান এবং তাকওয়ার মমার্থ অনুযায়ী। তারা আমানত এবং তার সাথে নির্ধারিত দায়িত্ব পূরণ করেছিলেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল সহিহ আকিদাবিশ্বাসের ওপর। আলেমে রাব্বানিগণ তাদের এই তারবিয়তের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। তারা তাদের পরিচালনায় কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে নবিকে সংবিধান বানিয়ে নিয়েছিলেন। তারা সৈন্যদের যে নীতিতে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন সেগুলো হলো—

১. আল্লাহ তাআলা এক। তার কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। তার কোনো স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি অসম্পূর্ণতা, অসংগতি হতে পবিত্র। তার গুণাবলি কখনো বলে শেষ করা যাবে না।

২. আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সকল বিষয়ের অধিপতি এবং সকল কাজ পরিচালনাকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন— أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ {সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা তারই কাজ}। *[সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৪]*

৩. বিশ্বের সকল নিয়ামতের উৎস আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা। চাই তা ক্ষুদ্র হোক কিংবা বড় হোক। প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক। وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ {তোমাদের কাছে যা নিয়ামত আছে সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে}। *[সুরা নাহল, আয়াত : ৫৩]*

৪. তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞানী। আকাশ এবং জমিনে কোনো বিষয় তার অগোচরে নেই। وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন'। *[সুরা তালাক, আয়াত : ১২]*

৫. আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার ফেরেশতাগণের মাধ্যমে বান্দার আমল লিপিবদ্ধ করে রাখেন । এমন খাতায় যাতে সকল ছোট বড় আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যা খোলা হবে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মুহূর্তে। مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ {সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে}। *[সুরা কাফ, আয়াত : ১৮]*

৬. আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে তার পছন্দনীয়, চাহিদার বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা নেন। যেন মানুষের অবস্থান জানতে পারেন। তাদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত এবং নির্ধারণে সন্তুষ্ট হবে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে তারাই খিলাফত এবং নেতৃত্বের উপযুক্ত হবে। আর তাদের মধ্য হতে যারা রেগে যাবে এবং ক্রুদ্ধ হবে তাদের জন্য

সুবিচার করা হবে না এবং তাদের মর্যাদা সমুন্নত করা হবে না। الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' *[সুরা মুলক, আয়াত : ২]*

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় নেয়, তার আদেশ পালন করে আল্লাহ তাকে তার সকল কাজে তাওফিক দেন, তাকে শক্তিশালী করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। اِنَّ وَلِيِّ يَ اللّٰهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِتٰبَ' وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِينَ 'আমার সহায় হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করেন।' *[সুরা আরাফ, আয়াত : ১৯৬]*

৮. বান্দার ওপরে আল্লাহ তাআলার হক হলো, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে, তার একাত্মবাদ স্বীকার করে এবং তার সাথে কোনো বস্তু শরিক না করে। بَلِ اللّٰه فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞ হও।' *[সুরা জুমার, আয়াত : ৬৬]*

৯. আল্লাহ তাআলা উবুদিয়্যাতের এবং তাওহিদের সংজ্ঞা কুরআনে আজিমে দিয়েছেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের উলামায়ে কেরামগণ আখেরাতে সফলতা এবং নাজাতলাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি এবং সৈন্যদের শিক্ষায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি অনুসরণ করেছেন। তাদের বয়ানসমূহে যে সমস্ত বিষয় মূল প্রতিপাদ্য ছিল তা হলো—

১. এ জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন, তা একদিন ধ্বংস হবেই। আর জীবনের ভোগবিলাসের বস্তু যতই বড় হোক না কেন তা নিতান্ত তুচ্ছ।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعٰمُ حَتّٰىٓ إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ' كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْءَايٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ـ

{পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনই, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি জমিন যখন

সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠল আর জমিনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার ওপর আমার নির্দেশ এল রাতে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল, যেন কালও এখানে কোনো আবাদ ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি।} [সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৪]

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ـ

{হে নবি, আপনি বলে দিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সামান্য।} [সুরা নিসা, আয়াত : ৭৭]

২. সমস্ত সৃষ্টিজীব আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং হিসেব নেওয়া হবে। এরপর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ـ

{মানুষ কি মনে করে তাকে এমনি এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?} [সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ৩৬]

৩. জান্নাতের নিয়ামত দুনিয়ার সকল ক্লান্তি এবং তিক্ততা ভুলিয়ে দেবে। বিপরীতে জাহান্নামের আজাব দুনিয়ার সকল আরাম এবং স্বাদ ভুলিয়ে দেবে।

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِينَ' ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ'مَآ أَغْنٰى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ـ

{আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দিই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা তাদের কাছে এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ বিলাস তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না।} [সুরা শুয়ারা, আয়াত : ২০৫-২০৭]

৪. মানুষ দুনিয়া ধ্বংসের পর এবং জান্নাত অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার আগে এক দীর্ঘ ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে।

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُم بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ ـ

{হে লোকসকল, তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়, বস্তুত আল্লাহর আজাব অনেক কঠিন।} [সুরা হজ, আয়াত : ১-২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَٰنَ شِيبًا ۝ السَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ـ

{অতএব, তোমরা যদি সেদিনকে অস্বীকার কর, তবে তোমরা কীরূপে আত্মরক্ষা করবে? যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে দেবে? সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।} [সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ১৭-১৮]

৫. আর এই এই বিপদ এবং ভয়াবহতার অনিষ্ট থেকে মুক্তির, জান্নাতলাভের এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার উপায় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা এবং তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য আমল করা।

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ـ

{নিশ্চয় যারা ইমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ। যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তা বিরাট সফলতা।} [সুরা বুরুজ, আয়াত : ১১]

উসমানি সাম্রাজ্যের আলেমে রাব্বানিগণ ব্যক্তি, সৈন্য, নেতা, গোত্রের পরিচালনায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের অবস্থান এবং মর্যাদার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। এমন অবস্থা থাকতে থাকতেই তাদের মস্তিষ্কে আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। এই প্রশংসনীয় শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ লোক সেনা এবং নেতাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ নিজেই এই শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তার কবিতায় এই শিক্ষা নিয়েই গর্ব করতেন। আমরা পেয়েছি তিনি বলেছেন—

আমার নিয়্যত : আল্লাহর আদেশ— وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِه 'তোমরা তার রাস্তায় জিহাদ করো।' [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩৫] পালন করা।

আমার ইচ্ছা : আমার দ্বীন—আল্লাহর দ্বীনের জন্য খেদমত করা। আমার সংকল্প আমার সৈন্যদলের মাধ্যমে কাফেরদের শাস্তি দেওয়া, যারা আল্লাহরই সৈন্যদল।

আমার চিন্তা : আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয়, সাহায্য এবং সফলতায় নিবদ্ধ।

আমার জিহাদ : জান-মাল সব দিয়ে। দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ পালন করা ছাড়া আর কী আছে?

আমার আগ্রহ : আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হাজার হাজার বার জিহাদ করা।

আমার আশা : আল্লাহর সাহায্য এবং আল্লাহর শত্রুদের ওপর রাজত্বের অধিকার।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তোরাবাজান শহর বিজয়ের ইচ্ছা করলেন। সেখানকার শাসক ছিল খ্রিষ্টান। সুলতান হঠাৎ করেই তাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি যথাযথ প্রস্তুতি নেন। তার সাথে অনেক শ্রমিককে নিয়ে যান। যারা গাছ কাটা এবং রাস্তা নির্মাণে দক্ষ ছিল। সেখানে যাওয়ার পথে কয়েকটি উঁচু পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান তখন তার ঘোড়া থেকে নেমে অন্যান্য সৈন্যদের মতো তার হাতে পায়ে ভর দিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করেন। (তখন তার সাথে তুর্কমেনিস্তানের শাসক হাসান আওজুনের মা ছিলেন, যিনি সুলতান ফাতিহের সাথে তার ছেলের চুক্তি করতে এসেছিলেন) তিনি সুলতান ফাতিহকে বললেন—'তুমি কেন এই কষ্ট করতে যাচ্ছ? এই সব ব্যথার আঘাত কেন সইছ? তারাবাজুনের অধিবাসীরা কি এর যোগ্য?'

সুলতান ফাতিহ জবাব দিয়েছিলেন—হে মা, আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য আমার হাতে তরবারি দিয়েছেন। আমি যদি এই কষ্ট না করি এবং এই তরবারির হক আদায় না করি, তাহলে আমি যে গাজি উপাধি বহন করছি কখনোই সেই উপাধির যোগ্য হব না। এর পর আমি কীভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সাথে দেখা করব?[২৮৮] অধিকাংশ সেনা এবং নেতাগণ তাদের সুগভীর ইমানি প্রশিক্ষণের ফলে এমন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

কুসতানতিনিয়া অবরোধের সময়ে উসমানি সেনাগণ সহিহ আকিদাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। অনুরূপ তারা আল্লাহর ইবাদতেও মগ্ন ছিলেন। দ্বীনের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার সামনে অবনত ছিলেন।[২৮৯]

ইতিহাসবিদগণ কুসতানতিনিয়া বিজয়ের অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন : বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যাওয়া, তাদের অভ্যন্তরীণ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে লড়াই এবং

---

[২৮৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ২৬৩।
[২৮৯] *আল-হুব্বাতু ফিল আসারিল মামলুকি*, ড. হায়দার আসসাফিহ, পৃষ্ঠা : ২০৬।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো তাদের মধ্যকার দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ ইত্যাদি কারণসমূহ।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়নের প্রভাব

আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ এবং গোত্র ও জাতির জীবনে চিন্তাফিকির করলে বান্দা আসল পরিচয় অর্জন করতে পারে। এটাই প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বিশ্বব্যাপী আল্লাহ তাআলার চলমান রীতি। সমাজ, রাষ্ট্র, গোত্র পরিচালনার নিয়মনীতি কুরআনে ভরপুর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ـ

{আল্লাহ তোমাদের জন্যে সব কিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদের ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান।} [সুরা নিসা, আয়াত : ২৬]

আর আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশুদ্ধ হাদিস নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহ তাআলার রীতিনীতি স্পষ্ট হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিগণকে কিছু রীতিনীতি বোঝানোর জন্য পূর্ববর্তীদের ঘটনা শোনাতেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হলো, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজবা নামক উষ্ট্রী বসে পড়ল। সামনে এগোচ্ছিল না। তখন এক বেদুইন ব্যক্তি তার এক বাহনে চড়ে সেই উষ্ট্রীকে অতিক্রম করে ফেলে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম খুবই মর্মাহত হন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার রীতিসমূহ হতে একটি রীতি উন্মোচিত করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলার ওপর হক হচ্ছে দুনিয়ায় যে বস্তুই ওপরে উঠে যাবে আল্লাহ তা নিচে নামিয়ে দিবেন।'[২৯০]

[২৯০] *বুখারি,* কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার, বাবু নাকাতি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ৬/৮৬।

আল্লাহ তাআলার তার কিতাবে আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে সফর করে এবং বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস এবং জীবনীগ্রন্থ পড়ে তার নিয়মরীতি তালাশ করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ـ

{তোমাদের আগে অনেক ধরনের রীতি-রেওয়াজ অতিবাহিত হয়েছে। তাই তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে। এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত এবং উপদেশস্বরূপ।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৭-৩৮]

চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে রীতি-রেওয়াজ জানার প্রতিও কুরআন আমাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْءَايَٰتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ـ

{হে নবি, আপনি বলে দিন, তোমরা আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে চিন্তা করো। আর অবিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি এবং ভীতি প্রদর্শন কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং এখন তারা তাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে তাদের দিনগুলোর অপেক্ষার মতোই অপেক্ষা করবে। আপনি বলে দিন, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করব।} [সুরা ইউনুস, আয়াত : ১০১-০২]

কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাআলার নিয়ম-রীতিসমূহের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এক : নিশ্চয় তা অকাট্য এবং অগ্রগামী

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ـ

{আল্লাহ তাআলা নবির ওপর যা নির্ধারণ করেন এতে তার জন্য কোনো কষ্ট নেই। এটা পূর্ববর্তীগণের প্রতিও আল্লাহ তাআলার রীতি। আর আল্লাহ তাআলার আদেশ সুনির্দিষ্ট এবং অকাট্য}। [সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৮]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সিদ্ধান্ত নেন এবং যে বিষয় নির্ধারণ করেন তা আবশ্যিকভাবে হবেই। প্রতিবন্ধকতাহীনভাবেই তা বাস্তবায়িত হবে। তিনি যা ইচ্ছা করেন এতে কোনো পরামর্শক নেই। তা হবেই। তিনি যা চান না তা হবে না।

দুই : তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ـ

{মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে গুজব রয়েছে এবং মদিনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। তারা অভিশপ্ত, যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং তাদেরকে নিহত করা হবে। যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আর আল্লাহ তাআলার রীতিতে আপনি কখনো পরিবর্তন পাবেন না।} [সুরা আহযাব, আয়াত : ৬০-৬২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ـ

{যদি কাফেররা তোমাদের সাথে লড়াই করত তাহলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোনো অভিভাবক এবং সাহায্যকারী পাবে না। এটাই পূর্ব থেকে চালু হয়ে আসা আল্লাহ তাআলার রীতি। আর আল্লাহ তাআলার রীতিতে আপনি কখনো পরিবর্তন পাবেন না।} [সুরা ফাতাহ, আয়াত : ২২-২৩]

তিন : তা অব্যাহত থাকবে। কখনো থেমে যাবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ـ

{হে নবি, আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা কুফর থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা করা হবে আর যদি তারা পুনরায় গোনাহ করে তাহলে পূর্ববর্তীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রীতি অব্যাহতই থাকবে।} [সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৮]

চার : তার বিরোধিতা করা যাবে না এবং তার বিরোধিতায় কোনো লাভ হবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى الْأَرْضِ فَمَآ أَغْنٰى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ـ

{তারা কি জমিনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তাদের পূর্বের লোকদের পরিণাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেত। যারা তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং অধিক পরিমাণে জমিন আবাদ করেছে; কিন্তু তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজে আসেনি। যখন তাদের কাছে তাদের রাসুলগণ স্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছে তখন তারা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আনন্দিত হয়েছে। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করত তা সমূলে ধ্বংস হয়েছে। যখন তারা আমার ক্রোধ দেখল তারা বলল, আমরা এক আল্লাহ তাআলার ওপর ইমান আনলাম এবং তার সাথে যাদেরর শরিক করেছি তাদেরকে অস্বীকার

করলাম। যখন তারা আমার ক্রোধ দেখল তখন ইমান আনয়ন তাদের কোনো উপকারে আসেনি। এটাই আল্লাহ তাআলার রীতি, যা পূর্বের বান্দাদের মধ্যেও অতিবাহিত হয়েছে। কাফেররা এখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।} [সুরা গাফির, আয়াত : ৮২-৮৫]

পাঁচ : এর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীরা উপকৃত হবে না কিন্তু খোদাভীরুগণ তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

{তোমাদের পূর্বে অনেক রীতি-রেওয়াজ অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো এবং দেখ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছিল? এটা মানুষের জন্য বিবরণ আর খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশস্বরূপ।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৭-৩৮]

ছয় : জলে-স্থলে আল্লাহ তাআলার রীতি প্রয়োগ হয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম হচ্ছেন মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান। তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার রীতি প্রয়োগ হয়। আর আল্লাহ তাআলার রীতি বহমান। যারা আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করে অথবা যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের পরিণতির সাথে আল্লাত তাআলার রীতি সম্পৃক্ত। যেহেতু উসমানিগণ তাদের সকল কাজে আল্লাহর শরিয়তকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং সাম্রাজ্যের জীবনে তারা কিছু স্বভাবজাত স্তর অতিক্রম করেছিল, তাই তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্যণীয়।

আল্লাহ তাআলা যে হুকুম অবতীর্ণ করেছেন তার দুনিয়াবী ফল আছে এবং পরকালীন বা আখেরাতের ফলও আছে। সুতরাং উসমানি সাম্রাজ্য নিয়ে গবেষণা করে তাদের মাঝে যে দুনিয়াবী ফল আমি দেখতে পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে—

খিলাফত এবং রাজত্ব

আমরা দেখেছি উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক থেকে শুরু করে মুহাম্মদ আল-ফাতিহ পর্যন্ত এবং তার পরবর্তী শাসক সকলেই তাদের নিজেদের ওপর এবং পরিবারের ওপর আল্লাহ তাআলার আদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা তাদের রাজত্ব পরিচালনায় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার শরিয়তের অনুসরণ করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদের শক্তিশালী করেছেন, তাদের ভিত মজবুত করেছেন এবং জমিনে তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। উসমানি শাসকগণ তাদের অধীন অঞ্চলে আল্লাহ তাআলার শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আল্লাহ তাদের রাজত্ব দৃঢ় করেছেন এবং তাদের সুলতানকে তাদের প্রতি যত্নশীল করেছেন।

এটাই আল্লাহ তাআলার অব্যাহত রীতি। যে জাতি বা গোত্র আল্লাহ তাআলার শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করবে তাদের ক্ষেত্রে এই রীতি পরিবর্তিত হবে না।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের মুমিনগণকে সম্বোধন করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেভাবে তিনি পূর্বের মুমিনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুরা নুরে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۝

{তোমাদের মধ্য হতে যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অচিরেই তাদেরকে জমিনের কর্তৃত্ব দান করবেন যেমনিভাবে তিনি পূর্ববর্তীদের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন।} [সুরা নুর, আয়াত : ৫৫]

তারা হলো বনি ইসরাইল। উসমানিগণ ইমান বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার শরিয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেছেন। তাই তাদের জন্য এর ফল এবং আয়াতের বাকি অংশ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ 'এবং তাদের জন্য তাদের পছন্দনীয় ধর্মকে দৃঢ় করবেন' [সুরা নুর, আয়াত : ৫৫] বাস্তবায়িত হয়েছে। তারা দ্বীনি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন আর তাদের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে ক্ষমতা।

নিরাপত্তা এবং স্থিরতা

এশিয়া মাইনরের রাষ্ট্রগুলো দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং তাদের রাজত্বের মাঝে ঝগড়া বিবাদ বেড়ে গিয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্য এসে সেই রাজ্যগুলোকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রতি মনোযোগী করে। ফলে যে অঞ্চলগুলোতে তারা আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত অঞ্চলে উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য নিরাপত্তা এবং স্থিরতার পথ সুগম করে দেন। ।

আমরা দেখেছি আল্লাহ তাআলা উসমানি সাম্রাজ্যকে রাজত্ব দেওয়ার পর তাদের ক্ষমতায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাদেরকে নিরাপত্তা এবং স্থিরতার উপকরণ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ তাআলার শরিয়ত এবং হুকুম অনুযায়ী আমল করে সে সমস্ত মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ তাআলার অব্যাহত রীতি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তাদের ব্যক্তি এবং বাস্তবজীবনে নিরাপত্তাকে সহজ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলার কাছেই সকল বিষয়ের এবং সকল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। তিনি অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। যে ব্যক্তি তাওহিদের ওপর অটল থাকে এবং সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র হয় আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰٓئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ـ

{যারা ইমান আনে এবং তাদের ইমানের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত করে না তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত।} [সুরা আনআম, আয়াত : ৮২]

সুতরাং যখন তারা সকল ছোট বড় কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য করবে তখন তারা সকল ভয়-ভীতি, শাস্তি এবং দুর্ভাগ্য থেকে নিরাপদ থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর শরিয়তের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। কেননা, তা আল্লাহ তাআলার ইনসাফ, রহমত এবং প্রজ্ঞাকে স্পর্শ করে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে ক্ষমতা এবং রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তাদেরকে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দূরে রেখেছেন।

উসমানিরা যেহেতু আল্লাহ তাআলার জন্য উবুদিয়্যাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সকল প্রকার শিরককে দূরে ঠেলে দিয়েছে, তাই আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রশান্তি এবং নিরাপত্তা দিয়েছেন।

উসমানিগণ তাদের সবটুকু দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে নিবেদিত ছিলেন। তাদের মাঝে 'যারা আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন' এই রীতি বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরিয়তের ওপর অটল থাকে আল্লাহ তাআলা শত্রুর বিপক্ষে তার সাহায্যের, তার শক্তি এবং সম্মানের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ الْأُمُورِ ـ

{যারা আল্লাহকে সাহায্য করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী এবং সর্বশক্তিমান। যাদের আমি জমিনে রাজত্ব দেওয়ার পর নামাজ আদায় করে, জাকাত দেয়, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তাআলার হাতে।} [সুরা হজ, আয়াত : ৪০-৪১]

কোনো একটি দল আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথের ওপর অটল থেকেছে আর আল্লাহ তাআলা তাদের চূড়ান্ত শক্তি, সামর্থ্য আর নেতৃত্ব দেননি—এমনটি মানব-ইতিহাসে কখনো হয়নি। অধিকাংশ লোকেরাই আল্লাহ তাআলার শরিয়তের অনুসরণ এবং তার নির্দেশিত পথে চলতে ভয় করেছে। আল্লাহর শত্রুদের বিরোধিতায় ভয় করেছে। তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে ভয় করেছে। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সংকটের ভয় করেছে। এগুলো ছিল কুরাইশদের ধারণার মতোই কিছু ধারণা। যেদিন কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল—

إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ـ

{যদি আমরা তোমার সাথে সঠিক পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদের কাছ থেকে আমাদের জমিন ছিনিয়ে নেওয়া হবে।} [সুরা কাসাস, আয়াত : ৫৭]

কিন্তু যখন তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছে তখন তারা জমিনের পূর্বপশ্চিমে শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।[২৯১]

আল্লাহ তাআলা উসমানিদের শত্রুদের তুলনায় শক্তিশালী করেছিলেন এবং তাদের বিজয়ের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাদের বিস্তৃত জমিনের বিজয় দিয়ে সেগুলোকে

[২৯১] *ফি জিলালিল কুরআন*, ৪/২৭০৪।

আল্লাহর হুকুমের সামনে অবনত করেছেন। আর ইসলাম ধর্মের প্রতি পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে অন্তরসমূহের বিজয় দিয়েছেন।

উসমানিরা যখনই আল্লাহর শরিয়তের অনুসরণ করেছে এবং তার প্রতি সাড়া দিয়েছে তখনই তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছে।

যে সমস্ত ইসলামি অঞ্চল আল্লাহ তাআলার শরিয়ত থেকে দূরে থাকে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে নিজেদের লাঞ্ছিত করে। আল্লাহর শরিয়ত-প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করা সকল শাসক, বিচারক, আলেম এবং মুবাল্লিগগণের ওপর বিরাট একটি দায়িত্ব। এ সম্পর্কে তাদের কিয়ামতদিবসে প্রশ্ন করা হবে।

'যখন কোনো শাসক আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুমের বাইরে ফায়সালা দেবে তখন তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ পতিত হবে। এটাই রাজত্ব পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ। এ-যুগেও বারে বারে এমনটিই ঘটছে এবং ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা যার সৌভাগ্যের ইচ্ছা করেন তাকে অন্যের তুলনায় অধিক নিয়ামত দান করেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাদের অনুসৃত পথে চলতে হবে এবং যাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন তাদের অনুসৃত পথ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُه إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ الْأُمُورِ۔

{যারা আল্লাহকে সাহায্য করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী এবং সর্বশক্তিমান। যাদের আমি জমিনে রাজত্ব দেওয়ার পর নামাজ আদায় করে, জাকাত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তাআলার হাতে।} [সুরা হজ, আয়াত : ৪০, ৪১]

আল্লাহ তাআলাকে যে সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহকে সাহায্য করা হচ্ছে তার কিতাব, ধর্ম এবং রাসুলকে সাহায্য করা। যারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে শাসন করে এবং যা জানে না সে কথা বলে তাদের সাহায্য করা আল্লাহ তাআলার সাহায্য নয়'।[২৯২]

[২৯২] *মাজমাউল ফাতওয়া লি ইবনে তাইমিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৩৫/৩৮৮।

সম্মান এবং মর্যাদা

ইতিহাসে উসমানিদের যে বিরাট সম্মান এবং মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তার উৎস হচ্ছে তাদের আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার ফলে গর্ব করে এবং এর মাধ্যমে তার জাতিকে সম্মানিত করে এবং তার আলোচনাকে সমুন্নত করে, সে সঠিক রাস্তায় তার পা রেখেছে এবং আল্লাহ তাআলার অব্যাহত রীতি 'যে তার কিতাব এবং তার রাসুলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে তাকে তিনি ইজ্জত-সম্মান দান করেন'। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔

'আমি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি এমন কিতাব—যার মধ্যে তোমাদের আলোচনা রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না?' [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—'এমন কিতাব যার মধ্যে তোমাদের সম্মান রয়েছে।'[২৯৩]

নিশ্চয় উসমানিগণ ইসলামি হুকুম-আহকামকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছেন। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আমরা ছিলাম সবচেয়ে লাঞ্ছিত জাতি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং যখন আমরা আল্লাহ যে বস্তুর মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করব তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের অপদস্ত করবেন'।[২৯৪] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এই কথার মাধ্যমে কোনো জাতির সম্মান এবং লাঞ্ছনার মাঝে যোগসূত্র স্পষ্ট করে বর্ণনা করে গেছেন। শরিয়তের প্রতি অগ্রগামিতা এবং পিছিয়ে থাকার সাথেই এই যোগসূত্র সম্পৃক্ত। সুতরাং কেউ আল্লাহ তাআলার দ্বীন ব্যতীত সম্মানিত হতে পারবে না। আর আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে না এলে লাঞ্ছিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔

[২৯৩] *তাফসিরে ইবনে কাসির,* ৩/১৭০।
[২৯৪] *মুসতাদরাক লিলহাকিম,* কিতাবুল ইমান, ১/৬২।

{যে ব্যক্তি সম্মান চায় সে যেন জেনে রাখে, সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহ তাআলার।} [সুরা ফাতির, আয়াত : ১০]

অর্থাৎ যে সম্মান কামনা করে, সে যেন মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে সম্মান কামনা করে।[২৯৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

{আল্লাহ তাআলা, তার রাসুল এবং মুমিনগণের জন্যই সম্মান, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।} [সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮]

সুলতান প্রথম উসমান, সুলতান মুরাদ এবং সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতো উসমানি সুলতানগণের জীবনী থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তারা ইসলামের মাধ্যমে সম্মান কামনা করেছেন এবং কুরআনকে ভালোবেসেছেন এবং আল্লাহ তাআলার রাহে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তারা বরকতময় এবং প্রাচুর্যপূর্ণ উত্তম জীবনযাপন করেছেন। আর তারা এ জীবন অর্জন করেছিলেন আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

{যদি গ্রামের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান এবং জমিনের প্রভূত বরকত উন্মোচিত করে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে, তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করব।} [সুরা আরাফ, আয়াত : ৯৬]

উত্তম বিষয়ের প্রসার এবং অনিষ্টের অপসারণ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়ে উত্তম কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনিষ্ট দূরীভূত হয়েছে। এমন একটি প্রজন্মের জন্ম হয়েছে যাদের মাঝে ছিল আভিজাত্য, সম্মানবোধ, বীরত্ব, দানশীলতা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মানসিকতা। এসবই ছিল সঠিক বিশ্বাস এবং শরিয়তের প্রভাব। তারা জানত আল্লাহর কাছে এর জন্য সাওয়াব রয়েছে। তারা

[২৯৫] *ইবনে কাসির*, ২/৫২৬।

আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করত। ওই প্রজন্ম তাদের গোত্র, রাষ্ট্র এবং শাসকগণকে নিয়ে আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেদিকে এবং ইসলামের শিক্ষার দিকে সাড়া দিয়েছেন।

ইতিহাস অধ্যয়নকারীরা চোখ মেললেই সে সমস্ত গোত্র এবং রাষ্ট্রে আল্লাহ তাআলার শরিয়ত প্রতিষ্ঠা, সৎকাজের প্রতি আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতি নিষেধ করার প্রভাব দেখতে পাবেন। উসমানি সাম্রাজ্য যে সমস্ত উত্তম ফল পেয়েছিল তা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার অব্যাহত রীতি, যা কখনো পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হবে না। সুতরাং যে গোত্রই এই মহৎ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যে কাজ করবে তা খানিক বিলম্বে হলেও তাদের কাছে পৌঁছবেই। তারা তাদের ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং শাসকদের মাঝে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ফল দেখতে পাবে।

ইসলামি ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সমস্ত লোকদের থেকে শিক্ষা নেওয়া—যারা ইমান, জিহাদ, জ্ঞান এবং শিক্ষায় আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন। আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচেষ্টা, ক্ষমতালাভের রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরা, প্রজ্ঞা এবং ক্রমবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা, জাতির প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি এবং পরিচ্ছন্নতা এবং তাদেরকে ইসলামের প্রশংসনীয় পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করা।

যারা তার প্রভু এবং প্রভুর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়েছে, তার শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করেছে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে এমন লোকদের হাতেই আল্লাহ তাআলা আমাদের জাতির ইতিহাসের বিজয়সমূহ অব্যাহত রেখেছিলেন। এ জন্যই যার মাঝে কুরআনে বর্ণিত ক্ষমতালাভের গুণাবলি থাকবে, তার জন্যই হবে বিজয় এবং প্রকাশ্য সাহায্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের বিশেষ গুণাবলি

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের জীবন নিয়ে পড়তে এবং আলোচনা করতে গিয়ে তার কিছু নেতৃত্বসুলভ গুণ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

[১] সহনশীলতা

কুসতানতিনিয়া অবরোধের সময় যখন তিনি জানতে পারেন নৌবাহিনীর প্রধান বালিতাহ আওগালি তার দায়িত্ব পালনে পরিশ্রমে কমতি এবং অবহেলা প্রদর্শন করেছে তখন তার এই গুণ প্রকাশ পায়। তিনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে জানান—'হয়তো তুমি এই জাহাজগুলোর ওপর বিজয় লাভ করবে নয়তো সেগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। তুমি যদি তা না পার, তাহলে আমাদের কাছে আর জীবিত ফিরে এসো না।'[২৯৬]

বালিতাহ যখন তার দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হলো তখন সুলতান তাকে বরখাস্ত করেই ক্ষান্ত থাকলেন, তার স্থলে হামজা পাশাকে নিযুক্ত করলেন।

[২] বীরত্ব

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ নিজে যুদ্ধের ময়দানে নামতেন এবং তার তরবারি দ্বারা শত্রুর সাথে লড়াই করতেন। বলকান অঞ্চলে এক যুদ্ধে উসমানি সেনাবাহিনী বোগদানের শাসক স্টিফেনের নেতৃত্বে এক সেনাদলের মুখোমুখি হন। তিনি ঘন গাছের সারির পেছনে তার সেনাবাহিনী নিয়ে লুকিয়ে ছিল। মুসলিমগণ যখন সেই গাছের সারির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন তারা কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করে। উসমানি

[২৯৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১০১।

সৈন্যরা তাদের চেহারা লুকিয়ে বসে পড়ে। তাদের এই হামলা মুজাহিদগণের কাতারকে গ্রাস করে ফেলত; কিন্তু সুলতান ফাতিহ দ্রুতবেগে এগিয়ে এসেছিলেন এবং জেনোসারি সেনাদলের প্রধান মুহাম্মদ আততারাবুজুনিকে তার সৈন্যদলের অপদস্থতার ফলে হিংস্র হতে বলেছিলেন। তিনি চিৎকার করে তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন—'হে মুজাহিদগণ, তোমরা আল্লাহর সেনা হও, তোমাদের মাঝে যেন ইসলামি উদ্দীপনা জাগ্রত হয়।'[২৯৭]

তিনি ঢাল আঁকড়ে ধরে তার তরবারি উন্মোচিত করেন এবং তার ঘোড়াকে অগ্রগামী করেন। কোনো কিছুর পরোয়া না করে সম্মুখে এগিয়ে যান। এমনি করে তিনি তার সেনাদের অন্তরে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। তারা সুলতানের পেছনে পেছনে গিয়ে বনে লুকিয়ে থাকা শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। বৃক্ষবীথিকার ছায়াতলে এক তুমুল লড়াই শুরু হয়, যা সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যায় গড়ায়।

উসমানি সেনারা বোগদানী সেনাদের নাস্তানাবুদ করে ফেলে। স্টিফেন তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ভূপাতিত হয়ে যান। এরপর সেখান থেকে খুব কষ্টে পালাতে সক্ষম হন। উসমানিরা বিজয়ী হয় এবং অনেক গনিমতের মাল লাভ করে।[২৯৮]

[৩] মেধা

তার মেধার প্রকাশ পেয়েছিল তার অভিনব চিন্তাধারায়। বেসিকতাশ থেকে গোল্ডেন হর্ন প্রণালি অঞ্চলে জাহাজ নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেই কৌশলে। উত্তরাঞ্চলের জাহাজের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে তিনি তার জাহাজগুলোকে গালতা থেকে দূরে দুই বন্দরের মধ্যকার স্থল পথ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। এই দুই বন্দরের মাঝে তিন মাইলের দূরত্ব ছিল। আর রাস্তা সমতল ও সহজ ছিল না; বরং তা ছিল এবড়োথেবড়ো এবং দুর্গম। এ জন্য তিনি তার ছক বাস্তবায়ন শুরু করেন। অল্প সময়ের মাঝেই জমিনকে সমতল্‌ভাবে ভরাট করেন। তেল চর্বি মেশানো কাঠের প্লেট এনে রাস্তার ওপর বসানো হয়, যেন তা দিয়ে জাহাজ টেনে নেওয়া এবং চালিত করা যায়। সে সময়ের দিকে লক্ষ্য করে এ কাজটি ছিল খুবই অভাবনীয় এবং বিশাল। এতে প্রতিফলিত হয়েছে তার বুদ্ধিমত্তা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুতগামিতা, যা মুহাম্মদ আল-ফাতিহের অসাধারণ মেধা এবং প্রতিভার কথাই জানিয়ে দেয়।[২৯৯]

[৪] দৃঢ়তা এবং অবিচলতা

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছে চিঠি প্রেরণ করে তাকে শহর হস্তান্তরের কথা বলেছিলেন, যাতে শহরের মানুষের রক্তপাত না হয় এবং তারা

[২৯৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২৪৬।
[২৯৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২৪৭।
[২৯৯] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১০২।

কোনো কষ্টের সম্মুখীন না হয়। তারা শহরে থেকে যাওয়া এবং সেখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে; কিন্তু সম্রাট যখন তার শহরকে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন তখন মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বলেছিলেন—'ভালো অচিরেই কুসতানতিনিয়ায় আমার সিংহাসন হবে অথবা সেখানে আমার সমাধি হবে।'[৩০০]

বাইজেন্টাইনরা যখন উসমানিদের কাঠের কেল্লা পুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন—'আগামীকাল আমরা আরও চারটি বানাব।'[৩০১]

এই ঘটনাগুলো লক্ষ্যপূরণে তার দৃঢ়তা এবং অবিচলতার কথা জানিয়ে দেয়।

[৫] ন্যায়পরায়ণতা

তিনি আহলে কিতাবদের সাথে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী আচরণ করেছিলেন। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় অধিকার দিয়েছিলেন। কোনো খ্রিষ্টানকেই তিনি জুলুম-অত্যাচার করেননি; বরং তিনি তাদের নেতা এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছিলেন। তার রাজত্বের মূল ভিত্তি ছিল—ইনসাফ তথা ন্যায়পরায়ণতা।[৩০২]

[৬] দৈহিক বল, অধিকসংখ্যক সৈন্যদল এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্য সত্ত্বেও গর্ব না করা

আমরা দেখেছি কুসতানতিনিয়া প্রবেশের সময় সুলতান বলেছিলেন—'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলা যেন শহিদগণকে দয়া করেন এবং মুজাহিদগণকে সম্মান এবং মর্যাদা দান করেন। কৃতজ্ঞতা এবং গর্ব আমার অঞ্চলের জন্য।'[৩০৩]

তিনি সকল অনুগ্রহকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পর্ক যুক্ত করেছেন। এ জন্যই তিনি তার বিজয়দাতা এবং সাহায্যকারী প্রভুর শোকর, হামদ ও ছানা পাঠ করেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার প্রতি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ইমানের গভীরতার নিদর্শন।

[৭] ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হওয়া অনেক ঘটনাই আমাদের সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের একনিষ্ঠতার কথা জানিয়ে দেয়। জানিয়ে দেয় দ্বীন, বিশ্বাস এবং তার নিয়ম-রীতির প্রতি তিনি কতটা একনিষ্ঠ ছিলেন। কতটা একনিষ্ঠ ছিলেন তার প্রভুর কাছে মোনাজাতে। তিনি বলতেন—

[৩০০] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর,* পৃষ্ঠা : ৩৭৬।
[৩০১] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১২২।
[৩০২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৫২।
[৩০৩] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৩১।

আমার নিয়ত : আল্লাহর আদেশ— وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ {তোমরা তার রাস্তায় জিহাদ করো} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩৫] পালন করা।

আমার ইচ্ছা : আমার দ্বীন, আল্লাহর দ্বীনের জন্য খেদমত করা।
আমার সংকল্প : আমার সৈন্যদলের মাধ্যমে কাফেরদের শাস্তি দেওয়া, যারা আল্লাহরই সৈন্যদল।

আমার চিন্তা : আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয়, সাহায্য এবং সফলতায় নিবদ্ধ।

আমার জিহাদ : জান মাল সব দিয়ে। দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ পালন করা ছাড়া আর কী আছে?

আমার আগ্রহ : আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হাজার হাজার বার জিহাদ করা।

আমার আশা : আল্লাহর সাহায্য এবং আল্লাহর শত্রুদের ওপর রাজত্বের অধিকার।[৩০৪]

[৮] ইলম তথা জ্ঞান

সুলতানের শৈশবকাল থেকেই তার পিতা এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ জন্যই সুলতান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তার সময়ের সকল প্রসিদ্ধ আলেমগণকে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করেছিলেন। তারা কুরআন, হাদিস, ফিকহ এবং সমসাময়িক শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন : শারীরিক শিক্ষা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সামরিক জ্ঞান। আর তার সময়ের সকল বিদ্বান আলেমগণকে তার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করে সুলতান ফাতিহের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন। যাদের অগ্রভাগে ছিলেন শায়খ আক শামসুদ্দিন, মোল্লা কাওরানি (সুলতানের পূর্বের সময়ের আলেমে দ্বীন, যিনি সমসাময়িক বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন)। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার শায়খগণের শিক্ষার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার সামরিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রমগুলোতে সেই শিক্ষার ফল প্রকাশ পেয়েছে।[৩০৫]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তিনটি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। সে সময়ে কোনো বিদ্বান ব্যক্তি এই তিন ভাষা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারতেন না। সেগুলো হলো—আরবি, ফার্সি, তুর্কি। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ একজন কবি ছিলেন। তিনি তুর্কি ভাষায় লিখিত একটি কবিতার খাতা লিখে গিয়েছিলেন।[৩০৬]

[৩০৪] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখ।*
[৩০৫] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৩১।
[৩০৬] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ২৫৪-২৫৯।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কিছু ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রম

মাদরাসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তার গুরুত্ব প্রদান

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইলম এবং আলেমগণকে ভালোবাসতেন, তাই তিনি তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন। উসমানি সালতানাতে সুলতান উরখান প্রথম এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাদরাসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এরপর সালতানাতের অন্যান্য সুলতানগণ তার অনুসরণ করেন। এভাবে বুরুসা, আদ্রিয়ানোপল এবং অন্যান্য শহরে মাদরাসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে।

এদিক দিয়ে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার পূর্বপুরুষগণকে ছাড়িয়ে যান। তিনি ইলমের প্রসারে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে বিরাট শ্রম ব্যয় করেছেন। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার করেছেন এবং শিক্ষাসিলেবাস পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি প্রত্যেক ছোট বড় শহর এবং পল্লীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্রতী হন এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি এই মাদরাসাগুলোকে সুবিন্যস্ত করেন, কয়েক ভাগ এবং স্তরে শ্রেণিবিন্যাস করেন। সেগুলোর জন্য সিলেবাস প্রণয়ন করেন। প্রত্যেক স্তরে অধ্যয়নের জন্য কিছু নির্দিষ্ট শাস্ত্র এবং বিষয় নির্ধারণ করে দেন। তিনি পরীক্ষার নিয়ম প্রণয়ন করেন। যেন কোনো ছাত্র এক স্তরের পড়াশোনায় উত্তীর্ণ এবং সুষ্ঠু পরীক্ষায় কৃতকার্য না হয়ে আরেক স্তরে যেতে না পারে। সুলতান ফাতিহ এ সমস্ত নিয়মনীতির অনুসরণ করতেন এবং এর দেখাশোনা করতেন। কখনো কখনো তিনি ছাত্রদের পরীক্ষার মাঝে উপস্থিত হয়ে যেতেন। মাঝে মাঝেই তিনি মাদরাসাগুলো পরিদর্শনে বের হতেন এবং সেখানকার শিক্ষকগণ যে সবক দিতেন তা শুনতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি ছাত্রদের প্রতি চেষ্টা এবং পরিশ্রমের উপদেশ দিতেন। মেধাবী ছাত্র এবং শিক্ষকগণকে পুরস্কারপ্রদানে কৃপণতা করতেন না। সাম্রাজ্যের সকল মাদরাসায়

বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন। মাদরাসাগুলোতে যে বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হতো তা হলো, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আদব, বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র, ইলমে মাআনি, ইলমে বদী, ভাষাবিদ্যা এবং প্রকৌশলবিদ্যা প্রভৃতি।

তিনি কুসতানতিনিয়ায় নির্মিত মসজিদের পাশে আটটি মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের প্রত্যেক পাশে চারটি করে মাদরাসা ছিল। এর মাঝে ছিল বিস্তৃত এক প্রাঙ্গণ। এখানে ছাত্ররা শেষবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারত। এ সকল মাদরাসায় ছাত্রদের জন্য থাকার স্থান সংযুক্ত করা হয়। সেখানে তারা ঘুমাত এবং খাবার খেত। তাদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সকল মাদরাসায় পুরো বছরব্যাপী শিক্ষা দেওয়া হতো। মাদরাসাগুলোর পাশে তিনি একটি বিশেষ লাইব্রেরি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি এ লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল হবে, তিনি যেন আলেম এবং মুত্তাকি হন। কিতাবসমূহ এবং লেখকগণের নাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। লাইব্রেরির দায়িত্বশীল খুব সুগঠিত এবং সুশৃঙ্খলভাবে ছাত্র এবং শিক্ষকগণকে তাদের প্রয়োজনীয় কিতাব ধার দিতেন। একটি নির্দিষ্ট খাতায় ধার দেওয়া কিতাবের নাম রেজিস্ট্রি করে রাখতেন। এই দায়িত্বশীলকে তার জিম্মার কিতাবসমূহ এবং কিতাবের পাতার নিরাপত্তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হতো।[৩০৭]

এই লাইব্রেরিকে নিম্নপক্ষে তিনমাস গবেষণার জন্য খুলে দেওয়া হতো। আর এ সকল মাদরাসার সিলেবাসে বিশেষ বিশেষ স্তরবিন্যাস ছিল। ইলমে নকলি এবং নজরির জন্য বিশেষ বিভাগ ছিল। আর ইলমে তাতবিকির জন্য বিশেষ বিভাগ ছিল। ধনাঢ্য উজির এবং আলেমগণ মাদরাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন।[৩০৮]

উলামায়ে কেরামের প্রতি সুলতানের গুরুত্বারোপ

মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কাছে উলামায়ে কেরাম এবং সাহিত্যিকগণের বিশেষ অবস্থান ছিল। উলামায়ে কেরাম তার নিকটবর্তী হয়েছেন, তিনি তাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন এবং তাদের আমলের প্রতি উৎসাহী করেছেন। তিনি তাদের জন্য সম্পদ খরচ করেছেন। তারা যেন ইলম অন্বেষণ এবং শেখানোর জন্য পুরোপুরি মনযোগী হতে পারেন সেজন্য তাদের হাদিয়া, ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তাদের অনেক সম্মান করতেন। যদি কেউ তার বিরোধী হতো তবুও। কিরমান অঞ্চলকে সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পর সুলতান সকল কার্যালয় এবং কেন্দ্র কুসতানতিনিয়ায় স্থানান্তর করার আদেশ দেন। তখন তার রোমীয় উজির মুহাম্মদ পাশা লোকদের ওপর অত্যাচার করে। তাদের মাঝে কতক আলেম এবং সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন আলেম

[৩০৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৩৮৪-৩৮৫।
[৩০৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৩৮৪।

আহমদ জালবি ইবনে সুলতান আমির আলি। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ যখন তার ব্যাপারে জানলেন তার কাছে ক্ষমা চান এবং তাকে ও তার সহচরদের সম্মানের সাথে তাদের বাসস্থানে ফিরিয়ে আনেন।

তুর্কমেনিস্তানের শাসক আওজুন হাসান কোনো চুক্তি পূর্ণ করতেন না। উসমানিদের শত্রুদের তিনি সাহায্য করতেন। চাই তারা যে জাতির হোক না কেন। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তাকে পরাজিত করলে অনেক মানুষ বন্দি হয়। সুলতান ফাতিহ তাদেরকে হত্যার আদেশ দেন। (তবে তাদের মাঝে যারা আলেম এবং সুফি ছিলেন তাদের বাদ দিয়ে। যেমন কাজি শুরাইহ। তিনি সে সময়ের অনেক সম্মানিত একজন আলেম ছিলেন। সুলতান তাকে যথাযথ সম্মান করেছিলেন)।

সুলতান ফাতিহ আলেম-উলামা, খোদাভীরু ও মুত্তাকিগণের সমাদর করতেন। কখনো কখনো তাদের বিরুদ্ধে রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধ হতেন; কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না। তিনি তার গাম্ভীর্য এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি তার সম্মানবোধ ফিরিয়ে আনতেন।

ইতিহাস সাক্ষী, একবার সুলতান মুহাম্মদ তার এক খাদেমকে একটি সিদ্ধান্তের জন্য শায়খ কাওরানির কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন সামরিক বিচারক ছিলেন। তিনি দেখলেন—সিদ্ধান্তটি শরিয়তবিরোধী। তাই তিনি তা নাকচ করলেন এবং খাদেমকে প্রহার করলেন। এতে সুলতান বিরূপ হন। শায়খের এ কাজে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাকে তার পদ থেকে অব্যহতি দেন। তাদের দুজনের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। শায়খ কাওরানি মিসরে চলে যান। সেখানকার সুলতান তাকে স্বাগতম জানান, তাকে যথাযথ সম্মান করেন এবং তার কাছে অনেকটা সময় অবস্থান করেন। ইতিমধ্যেই সুলতান ফাতিহ তার এ কাজে লজ্জিত হন। তাই তিনি মিসরের সুলতানের কাছে চিঠি প্রেরণ করে তাকে বলেন, তিনি যেন শায়খ কাওরানিকে পাঠিয়ে দেন। তখন মিসরের সুলতান শায়খ কাওরানিকে সুলতান মুহাম্মদ খানের প্রেরিত চিঠির কথা জানান। এরপর তাকে বলেন—আপনি তার কাছে যাবেন না। আমি আপনাকে তারচেয়ে বেশি সম্মান করব। শায়খ বললেন—ঠিক আছে। সে এমনই। তবে আমার আর তার মাঝে বিশাল এক ভালোবাসার বাঁধন আছে যেমন পিতা-পুত্রের মাঝে থাকে। এখন আমাদের মাঝে যা চলছে তা ভিন্ন ব্যাপার। সে জানে, আমি স্বভাবগতভাবেই তার কাছে ছুটে যাব। যদি আমি না যাই তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, তুমি আমাকে নিষেধ করেছ। তখন তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হবে। মিসরের সুলতান কিতাবাই এ কথা খুবই পছন্দ করেন এবং তাকে অনেক সম্পদ উপহার দেন। তার জন্য সফরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দেন। তার সাথে সুলতান মুহাম্মদ খানের জন্য বিরাট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সুলতান ফাতিহ শায়খে কাওরানিকে বিচারবিভাগে অধিষ্ঠ করেন। তার জন্য সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন।[৩০৯]

[৩০৯] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৮৯।

শায়খ কাওরানি সম্পর্কে শাওকানি বলেন—'তাকে সামরিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগে স্থানান্তর করা হয়। অনেক বড় বড় আলেমগণের তার কাছে সমাগম হতো। তিনি *জামউল জাওয়ামি* নামে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন। তিনি শায়খ জালালুদ্দিন মহল্লিকে অধিক অনুসরণ করতেন এবং তার সাথে তাফসিরের কাজ করেছেন। তিনি বুখারির একটি শরাহ লিপিবদ্ধ করেন এবং ইলমে আরুজের একটি কাসিদা লেখেন, যার মধ্যে প্রায় ছয়শত পংক্তি ছিল। তিনি ইস্তাম্বুলে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। তার নাম দেন দারুল হাদিস। দুনিয়াবি নানাবিধ জ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতি হয়েছে। বড় বড় মনীষীগণ তার সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছে। ৭৬১ হিজরিতে তিনি হজ সম্পন্ন করেন। তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে থেকেই ৭৯৩ হিজরির শেষের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সুলতানের প্রশংসায় যে কাসিদা লিখেছিলেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ—

'তিনি সূর্য, দ্বীনের বীরদর্পী সিংহও বটে
তিনি সমুদ্র যদিও তার রাজত্ব জমিনের তটে'

শাকায়েকুন নোমানিয়্যাহ গ্রন্থকার তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিখেছেন—'তিনি সুলতানকে নাম ধরে ডাকতেন। তার জন্য অবনত হতেন না। তার হাতে চুম্বন করতেন না, বরং মুসাফাহা করতেন। সংবাদ পাঠানো না হলে তিনি কখনো অপ্রয়োজনে সুলতানের কাছে আসতেন না। তিনি সুলতানকে বলতেন—তোমার খাবার হারাম, তোমার পোশাক হারাম। তাই তুমি সতর্ক হও। তিনি তার আরও কিছু মহান গুণাবলির বিবরণ দিয়েছেন যা থেকে বোঝা যায় তিনি একজন নেককার আলেম ছিলেন।[৩১০]

সুলতান ফাতিহ যখনই কোনো আলেমের সমস্যা এবং প্রয়োজনের কথা শুনতেন তখনই তার সাহায্যে এগিয়ে যেতেন। তার পার্থিব জীবনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতেন।

সুলতান ফাতিহের অভ্যাস ছিল, প্রতি রমজান জোহর নামাজের পর তার প্রাসাদে জ্ঞানীগুণী আলেমগণকে নিয়ে তাফসিরুল কুরআনের মজলিসে বসতেন। একবার একেকজন আলেম কুরআনের আয়াতে কারিমার তাফসির পেশ করতেন। সমস্ত আলেমগণ এ জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। সুলতান নিজেও তাদের প্রতিযোগিতায় শরিক হতেন এবং তাদেরকে উপহার, উপঢৌকন এবং প্রচুর সম্পদ দিয়ে এ কাজে আরও উৎসাহী করতেন।

কবি, সাহিত্যিকগণের প্রতি তার গুরুত্বারোপ

উসমানি সাহিত্যের ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন—'সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সাহিত্যজাগরণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত কবি। তার ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে বরকত, সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের জয়জয়কার ছিল। তিনি আবুল

[৩১০] *আল-বদরুত তালি,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১।

ফাতাহ নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। কারণ, তিনি দুইটি সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেন। সাতটি রাজ্য জয় করেন। আর দুইশত শহরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইবাদতগাহ নির্মাণ করেন। এ জন্য তিনি আবুল খাইরাত নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩১১]

সুলতান ফাতিহ ব্যাপকভাবে সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। বিশেষ করে শের তথা কবিতার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি কবিদের সান্নিধ্যে থাকতেন এবং তাদের আলাদা মর্যাদা দান করতেন। অনেক কবিকে তিনি উজির নিযুক্ত করেছেন। যেমন, আহমদ পাশা মাহমুদ, মাহমুদ পাশা, কাসেম আল-জাজারি পাশা। তারা সকলেই কবি ছিলেন।

তার দরবারে ত্রিশজন কবি ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের জন্যই মাসিক এক হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারিত ছিল। তাই এটাই স্বাভাবিক যে, এমন সমাদর লাভের পর কবি সাহিত্যিকগণ সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। কেননা, তিনি জ্ঞান এবং সাহিত্যের প্রসারে চমৎকারভাবে দেখভাল করেছেন এবং তাদের উত্তমরূপে উৎসাহিত করেছেন।

তিনি কবিদের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিতেন না। যারা এমন করত তাকে কারারুদ্ধ করে শাস্তি দিতেন, নইলে তাকে দরবার থেকে বের করে দিতেন।[৩১২]

অনুবাদের প্রতি তার গুরুত্বারোপ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ রোমীয় ভাষার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি তার প্রজাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁ সৃষ্টির জন্য প্রচুর ইউনানি, লাতিন, আরবি এবং ফার্সি রচনাকে তুর্কি ভাষায় রূপান্তরের আদেশ দেন। তন্মধ্য হতে একটি হলো ব্লুতার্কের *মাশাহিরুর রিজাল* গ্রন্থ। আন্দালুসের চিকিৎসাবিদ আবুল কাসেম জাহরাওয়ির *কিতাবুত তাসরিফ ফিত তিব্ব* কে তুর্কি ভাষায় রূপান্তর করা হয়। তাতে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসার সময়ে অসুখবিসুখের পরিবেশের চিত্র বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

যখন তিনি ভূগোল সম্পর্কে বিতলিমুসের গ্রন্থটি এবং তার মানচিত্র পেলেন তখন তিনি রোমীয় পণ্ডিত জর্জ এস্রোটাজোশের সাথে তা অধ্যয়নে লেগে যান। এরপর সুলতান ফাতিহ সেই রোমীয় পণ্ডিত এবং তার ছেলের কাছে বইটিকে আরবিতে রূপান্তর করতে বলেন। রোমীয় পণ্ডিতের ছেলে আরবি এবং রোমীয় উভয় ভাষায় দক্ষ ছিলেন। সুলতান ফাতিহ শহরের নামগুলো সম্পর্কে আরও গবেষণা করে মানচিত্রটিকে আরবি এবং রোমীয় ভাষায় পুনরায় অংকন করতে বলেন। একাজের জন্য তিনি তাদের দুজনকে যথেষ্ট সম্পদ প্রদান করেন। আল্লামা কুশাজি সুলতানের সময়ের সবচেয়ে বড় গণিতবিদ

[৩১১] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ।*
[৩১২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৯৩।

এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি ফার্সিতে কিতাব লিখে তা আরবিতে রূপান্তর করেছেন। এরপর সুলতানকে হাদিয়া পাঠিয়েছেন।

সুলতান ফাতিহ আরবি ভাষার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। কেননা, তা কুরআনের ভাষা। এভাবে তৎকালীন বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল আরবি ভাষা। তিনি মাদারেসে সুমানী অর্থাৎ কুসতানতিনিয়ার মসজিদ ঘেঁষে নির্মাণ করা মাদরাসাগুলোর শিক্ষকগণকে বলেন, তারা যেন ভাষা শাস্ত্রের ছয় কিতাবকে একত্রিত করেন। যেমন, সিহাহ, তাকমিলা, কামুস প্রভৃতি কিতাব। আরবি ভাষার প্রতি গুরুত্ব প্রদানে এরচেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে?

সুলতান ফাতিহ অনুবাদ এবং রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার প্রজাদের মাঝে জ্ঞানের প্রসারের জন্য অধিক পরিমাণে সাধারণ লাইব্রেরি নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এ জন্য তার প্রাসাদে বিশেষ অর্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেন। যেগুলোতে দুর্লভ কিতাব এবং শাস্ত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শায়খ লুতফিকে এ কাজের দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পুড়িয়ে ফেলার আগে সেখানে ১২হাজার কিতাব ছিল। উস্তাদ দিজমান এই লাইব্রেরির সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি পূর্বে পশ্চিমের জন্য জ্ঞানের সমাবেশস্থল।[৩১৩]

ভবন এবং হাসপাতাল নির্মাণের প্রতি তার গুরুত্বারোপ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ-অট্টালিকা, হাসপাতাল, দোকানপাট, সরাইখানা এবং পার্ক নির্মাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাঁধ নির্মাণ করে শহরে পানি প্রবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি উজির, সাম্রাজ্যের বড় বড় ব্যক্তি, ধনীগণকে দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি বিভিন্ন ভবন নির্মাণের জন্য উৎসাহিত করতেন, যার মাধ্যমে শহরের সৌন্দর্য এবং আভিজাত্য বৃদ্ধি পাবে। তিনি ইস্তাম্বুল শহরের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এ শহরকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর রাজধানী এবং জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ বানাতে চেয়েছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের আমলে শহর ব্যাপকভাবে আবাদ হয়। তিনি হাসপাতাল নির্মাণেও গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং তার জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক সূক্ষ্ম এবং সুন্দর বিধান প্রণয়ন করেন। তিনি প্রতিটি ঘরের জন্য একজন চিকিৎসকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এরপর তা বৃদ্ধি করে দুইজন করেন। তারা ছিলেন সকল রোগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাদের সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিলেন ফার্মাসিস্ট, সেবক এবং দারোয়ান। তিনি হাসপাতালের প্রত্যেক কর্মজীবীকে অল্পে তুষ্ট, কোমলতা এবং মানবতার অধিকারী হতে বলতেন। চিকিৎসকদের জন্য দিনে দুইবার রোগীকে দেখতে যাওয়া আবশ্যক ছিল। আর

[৩১৩] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৪২৪।

ভালোভাবে রোগীকে না দেখে ঔষধ দিতে বারণ করেন তিনি। হাসপাতালের বাবুর্চিরা যেন রোগীদের উপযোগী খাবার রান্নায় দক্ষ হয় সে শর্ত আরোপ করেছিলেন। এই হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা এবং ঔষধ ছিল বিনামূল্যে। জাতি আর ধর্ম ভেদ না করে প্রতিটি মানুষ সেখান থেকে সেবা নিতে পারত।[৩১৪]

ব্যবসা এবং শিল্পের প্রতি তার গুরুত্বারোপ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ব্যবসা এবং শিল্পের ব্যাপারেও গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে এ দুটির সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখে তার পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করেছেন। তারা সর্বদা প্রজাদের মাঝে ব্যবসা এবং শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন। অনেক বড় বড় শহর উসমানিগণের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর সমৃদ্ধ এবং প্রস্ফুটিত হয়েছে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থাকাকালীন রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এই শহরগুলোর সভ্যতা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল এবং শহরগুলোকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। 'নিকিয়া' এ শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। উসমানিগণ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বাজার এবং সড়কপথ আর জলপথ নির্মাণেও অবদান রেখেছেন। তারা পুরাতন সড়কগুলো উন্নত করেন এবং আরও নতুন সড়ক নির্মাণ করেন; যা সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ব্যবসায়িক সফরকে সহজ করে। অন্যান্য রাজ্যগুলো উসমানিগণের জন্য তাদের বন্দর খুলে দিতে বাধ্য হয়। যেন তারাও উসমানিগণের ছায়ায় ব্যবসার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। সাম্রাজ্যের ব্যবসা এবং শিল্পে একটি ব্যাপক নীতির ফলে সাম্রাজ্যের প্রতিটি কোণে কোণে স্বচ্ছলতা, প্রাচুর্য এবং ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। এ সময়টা তাদের রাজত্বের জন্য স্বর্ণযুগে পরিণত হয়। শিল্প-কারখানা, স্টোরেজ এবং অস্ত্র-কারখানা নির্মাণে তারা কখনো অবহেলা করেনি। এমনিভাবে তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা এবং দুর্গ নির্মাণ থেকেও বিরত থাকেনি।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রতি তার গুরুত্বারোপ

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার সাম্রাজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেছেন। এ জন্য এমন কতক নিয়ম প্রণয়ন করেন—যার মাধ্যমে তিনি তার সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারবেন। সেই নিয়ম-কানুনগুলোর উৎস ছিল প্রজ্ঞাবান সত্তা আল্লাহ তাআলার শরিয়ত। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ অভিজ্ঞ আলেমগণের একটি কমিটি গঠন করেন এবং তাদেরকে শরিয়ত অনুযায়ী একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে বলেন। সেটিকেই তিনি তার প্রশাসনের ভিত্তি বানান। এই নিয়মগুলো তিন স্তরে বিন্যস্ত ছিল, যা কর্মচারীদের কর্মসংস্থান এবং তার নিয়মকানুন এবং তাদের যে সমস্ত রাজকীয় দায়িত্ব

[৩১৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৪১০।

নেওয়া আবশ্যক সে সম্পর্কিত। অনুরূপ তিনি শাস্তি এবং জরিমানাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে তার সাম্রাজ্যকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত সাম্রাজ্য বানানোর ঘোষণা দিয়েছেন।[৩১৫]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার সাম্রাজ্যের অমুসলিম বাসিন্দাগণের জন্য তাদের প্রতিবেশী মুসলিমদের সাথে এবং তাদের শাসনকারী প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি তার প্রজাদের মাঝে ইনসাফের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। চোর এবং ডাকাতদের ধরার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং তাদের ওপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ করেছেন। এতে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা লাভ হয়েছে এবং উসমানি সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডে প্রশান্তি ছেয়ে গিয়েছিল।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার পূর্বপুরুষদের আমলের প্রশাসনিক নীতিমালাও অক্ষত রাখেন। আর তাতে তার সমসাময়িক এবং সাম্রাজ্যের উপযোগী কিছু সংশোধনী যোগ করেন। সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত ছিল। বড় প্রদেশগুলোতে আর্মির মেজর জেনারেলগণ শাসন করতেন, যার নাম ছিল 'বাকলার বেক'। আর ছোট প্রদেশগুলোতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলগণ পরিচালনা করতেন, যার নাম ছিল 'সানজাক বেক'। উভয় প্রশাসন একই সাথে শহরের সাধারণ এবং সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তিনি সিসিলির কয়েকটি প্রদেশকে প্রথমে তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। স্থানীয় প্রশাসকগণ সেগুলো শাসন করতেন; কিন্তু তারা সাম্রাজ্যের অনুগত ছিলেন এবং স্বচ্ছতার সাথে তারা সুলতানের আদেশ মান্য করতেন। তারা যদি সুলতানের আদেশের বিরোধিতা করত অথবা উসমানি সাম্রাজ্যের অবাধ্যতার কথা চিন্তা করত সুলতান তাদের শাস্তি দিতেন অথবা বরখাস্ত করতেন।

যখন জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হতো এবং বড় ও ছোট প্রদেশের প্রশাসকগণকে আহ্বান করা হতো তখন তাদের জন্য সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং পরিপূর্ণ প্রস্তুতিগ্রহণকারী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে শরিক হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তারা অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত এবং লড়াইয়ে সক্ষম পাঁচ হাজার করে সৈন্য প্রস্তুত করতেন। সেই ছোট প্রদেশগুলোর সৈন্যদল পদাতিক এবং অশ্বারোহী সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত হতো। পদাতিক বাহিনীরা অধীন থাকতেন।[৩১৬]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ পুরনো অনুপযুক্ত কর্মচারীদের ছাটাই করে তাদের স্থলে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করেন। তিনি তার কর্মচারী, সহযোগী এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার যাচাই করতেন এবং তার মানদণ্ড নির্ণয় করেছিলেন। তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। সাম্রাজ্যের অর্থ সংরক্ষণে তিনি

[৩১৫] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৫৪।
[৩১৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

বেশ শক্তিশালী কিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলগণ অবহেলা এবং উদাসীনতা প্রদর্শন করলে তিনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাদের এ অবহেলায় সাম্রাজ্যের বিশাল পরিমাণ অর্থ বিনষ্ট হতো।

সুলতান রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে যেমন যোগ্যতা এবং সক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এর সমান যোগ্যতা এবং সক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন।[৩১৭]

সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনীর প্রতি তার গুরুত্ব

সুলতান উরখানের সময় থেকেই নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর গোড়াপত্তন হয়েছিল। তার পরবর্তী সুলতানগণ এসে সেনাবাহিনীর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বিশেষভাবে সুলতান মুহাম্মদ সেনাবাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিতে সেনাবাহিনী হলো সাম্রাজ্যের অন্যতম ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। তাই তিনি সেনাবাহিনীকে পুনরায় বিন্যস্ত করেন এবং ঢেলে সাজান। প্রত্যেক ইউনিটের পরিচালনার জন্য একজন 'আগা' নিযুক্ত করেন। আর জেনোসারি সেনাপতিকে অন্য সকল সেনাপতিদের তুলনায় অগ্রগামী করেন। তিনি সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে প্রাপ্ত আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করতেন।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়কাল এদিক দিয়ে বিশেষত্ব লাভ করেছে। তিনি সেনাবাহিনীর শক্তি এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর জন্য প্রভূত সামরিক নীতি প্রণয়ন করেন। তিনি সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় উপকরণ—যেমন : পোশাক, ঢাল, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের সামরিক কারখানা নির্মাণ করেন। সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে কেল্লা এবং দুর্গ নির্মাণ করেন। সেনাবাহিনী সুবিন্যস্তকরণের লক্ষ্যে অশ্বারোহী, পদাতিক, কামান এবং সহযোগী বাহিনীর জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ গঠন করেন। তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানী, খাবার, পশুদের খাবার এবং ট্রাঙ্ক সামরিক বিভাগ থেকে সরবরাহ করা হতো। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও এ কাজ চালু থাকত। তাদের আরেকদল সেনাবাহিনী ছিল, যাদের নাম ছিল 'লাগমাজিয়্যাহ'। তাদের কাজ ছিল অবরোধের সময় গর্ত খনন করা। তারা সুলতান মুরাদ কর্তৃক বিজিত কেল্লা অবরোধের সময় দুর্গ খনন করেছিলেন। এভাবে আরেকদল পানি সরবরাহকারী বাহিনী ছিল, যারা সৈন্যদের কাছে পানি সরবরাহ করত। সুলতান ফাতিহের সময়ে সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নত করা হয়। ফলে সেখান থেকে প্রকৌশলী, চিকিৎসক, পশু চিকিৎসক, মনোবিদ এবং ভূমি জরিপকারী বের হতেন। তিনি সেনাবাহিনীতে দুইটি বিশেষ বিষয় সরবরাহ করতেন। উসমানি সেনাগণ স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলার দিক দিয়ে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৩১৮]

[৩১৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৪০৬, ৪০৭।
[৩১৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৬২।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনীর উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। কুসতানতিনিয়া বিজয়ের সময় থেকে এর গুরুত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করে। কুসতানতিনিয়া বিজয়ের সময় অবরোধ মজবুতকরণে এবং শহরকে স্থলভাগ এবং জলভাগ উভয় দিক দিয়ে আটকে রাখতে নৌবাহিনীর স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। কুসতানতিনিয়া বিজয়ের পর বিভিন্ন সামুদ্রিক অস্ত্র দিয়ে তাদের শক্তি দ্বিগুণ করা হয়। এর ফলে কিছু সময়ের ব্যবধানে উসমানি নৌবাহিনী কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্য সাগরে আধিপত্য লাভ করে। ইসমাইল সারহাঙ্কের *হাকায়িকুল আখবার আন দোওয়ালিল বিহার* বইটি পড়লে আমরা উসমানি নৌবাহিনীর প্রতি সুলতান ফাতিহের গুরুত্ব প্রদানের কথা জানতে পারব। তিনি এতটাই পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, ইতিহাসবিদগণ তাকে উসমানি নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা আখ্যা দেওয়ার উপযুক্ত মনে করতেন। তিনি নৌবাহিনীর মাধ্যমে কতক সমৃদ্ধ রাজ্য থেকে উপকার লাভ করেছেন। যেমন ইতালি রাষ্ট্র, বিশেষ করে ভেনিস এবং জেনোয়া থেকে, যারা তৎকালীন বৃহত্তম সামরিকশক্তি ছিল।[৩১৯] সিউবে যখন তিনি বিশাল এবং বিরল একটি জাহাজ দেখলেন তখন তিনি এটিকে জব্দ করতে এবং এর অনুরূপ আরেকটি জাহাজ নির্মাণ করার আদেশ দেন।[৩২০]

উসমানি নৌবাহিনীর প্রশাসনেও শ্রেণিবিন্যাস ছিল। তাদের একটি বিশেষ বিভাগ ছিল। নাম ছিল 'বিতাফাতুল আজব'। তাদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার নৌসেনা ছিল। তাদের মাঝে ক্যাপ্টেন, জাহাজ পরিচালক নাবিক এবং অফিসার ছিলেন।[৩২১]

ন্যায়-ইনসাফের প্রতি তার গুরুত্বারোপ

লোকদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা উসমানি সুলতানগণের অন্যতম আবশ্যক দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে সুলতান মুহাম্মদ তার পূর্বপুরুষদের মতোই ছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের নানা কাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অধিক পরিমাণে আগ্রহী ছিলেন। এ বিষয়টি জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিষ্টানদের কাছে মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমাণ আদালত পাঠাতেন। তাদের কাছে লিখিত নীতিমালা পৌঁছে দিতেন। যেন তারা কীভাবে রাজত্বের বিষয়াদি পরিচালনা করা হয় এবং কীভাবে বিচারকার্যে মানুষের মাঝে ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হয়—তা জানতে পারে। এতে করে তদন্ত, অন্বেষণ এবং পর্যবেক্ষণে তাদের গুরুত্ব এবং ক্ষমতার কথা স্পষ্টভাবে জানা যায়।

খ্রিষ্টানদের কাছে প্রেরিত ওই সকল লোকদেরকে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সুলতান পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা সেখানকার পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন।

[৩১৯] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৪১১।
[৩২০] প্রাগুক্ত।
[৩২১] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ১৬২।

তবে রিপোর্টে কোনোরকম ভুল তথ্য তুলে ধরার সুযোগ ছিল না। রিপোর্টকারীরাও ঠিক এভাবেই রিপোর্ট করতেন এবং তা সুলতানের কাছে পেশ করতেন।

খ্রিষ্টানদের কাছে প্রেরিত ওই সমস্ত ব্যক্তিগণের রিপোর্ট সবসময় সেখানে নিয়োজিত প্রশাসকদের উত্তম আচরণ এবং মানুষের মাঝে কোনোরকম ভয়-ভীতি দেখানো ছাড়াই স্বচ্ছতা ও সততার সাথে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা দিয়েই পূর্ণ থাকত। সুলতান ফাতিহ যুদ্ধে যাওয়ায় সময় বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করতেন। তিনি সেখানে মজলুমদের অভিযোগ শোনার জন্য তার তাঁবু স্থাপন করতেন। যে চাইত সে সুলতানের কাছে তার অভিযোগ উত্থাপন করত।

তিনি ভালোভাবে জানতেন যে, শরিয়ত এবং শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকগণ ন্যায় সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞাত এবং এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে অভিজ্ঞ। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। তিনি মনে করতেন, দেহের মধ্যে অন্তরের যেমন গুরুত্ব, সাম্রাজ্যের মধ্যে উলামায়ে কেরামের গুরুত্ব ঠিক তেমনই। তারা যদি ভালো হয় তাহলে সাম্রাজ্যও ভালো হবে। এ জন্য সুলতান ফাতিহ ইলম এবং আলেমদের দেখাশোনা করেছেন। ইলম অন্বেষণকারীদের পথ মসৃণ করেছেন। ইলম অর্জনে পূর্ণ মনোযোগী হতে তাদের জীবিকা এবং উপার্জনের যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি উলামায়ে কেরামের সম্মান করেছেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষভাবে লোকদের মাঝে বিচার এবং ফায়সালা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকগণের দেখভাল করতেন। তাদের জন্য শরিয়ত এবং তার বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া, পবিত্রতা এবং দৃঢ়তার অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট ছিল না, এর পাশাপাশি তাদের জন্য লোকদের ভালোবাসা এবং গ্রহণযোগ্যতারও প্রয়োজন ছিল। আর তারা যেন রাষ্ট্রের সার্বিক প্রয়োজনের দায়িত্ব নেয়, এবং অন্যায় ও ঘুষের পথ রুদ্ধ করে, তাই সুলতান তাদের জীবিকার পথ প্রশস্ত করে দেন আর তাদের অবস্থানকে সম্মান, মর্যাদার দিক দিয়ে একটি প্রভাবশালী অবস্থানে উন্নীত করেন।[৩২২]

ইতিহাস আমাদের শুনিয়েছে—একবার আদ্রিয়ানোপলে সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহের এক ছেলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সেখানকার বিচারক কয়েকজন খাদেমকে পাঠিয়ে তাকে নিষেধ করলে সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ফলে বিচারক নিজেই তার কাছে যান; কিন্তু সুলতানের ছেলে বিচারকের ওপর সীমালঙ্ঘন করে এবং তাকে বেদম প্রহার করে। এ কথা শোনামাত্র সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি শরিয়তের প্রতিনিধিকে অপমান করার কারণে সেই ছেলেকে হত্যার আদেশ দেন। উজিরগণ সুলতানের কাছে ছেলের জন্য সুপারিশ করেন। সুলতান তাদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। তাই উজিরগণ শায়খ মুহিউদ্দিনের কাছে আবেদন করেন, তিনি যেন সুলতানের কাছে গিয়ে এ বিষয়টি সমাধান করেন; কিন্তু সুলতান তার কথাকেও প্রত্যাখ্যান করেন। তখন শায়খ মুহিউদ্দিন

[৩২২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৪০৯।

তাকে বলেন, 'শরিয়তের প্রতিনিধি বিচারক তার ক্রোধের ফলে বিচারক মজলিস থেকে নেমে যাওয়ায় তিনি বিচারকের মর্যাদা থেকে নেমে গেছেন, তাই তাকে প্রহার করার মাধ্যমে শরিয়তের অপমান করা হয়নি। যার ফলে আপনি আপনার ছেলেকে হত্যা করবেন।' তখন সুলতান এ কথা শুনে থেমে যান। এরপর সেই ছেলে কুসতানতিনিয়ায় এলে উজিরগণ তাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যান, যেন সে ক্ষমার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার হাতে চুম্বন করে। তখন সুলতান এক বিরাট বেত এনে নিজ হাতে তাকে বেদম প্রহার করেন। এর ফলে সে চার মাস অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। পরে চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করা হয়। এরপর সেই ছেলে সুলতান বায়েজিদ খানের উজির নিয়োজিত হয়। তার নাম দাউদ পাশা। সে সুলতান মুহাম্মদ খানের জন্য দোয়া করে বলত, 'আমার এ সুপথলাভ তার প্রহারের কারণেই অর্জিত হয়েছে।'[৩২৩] আর ঘুষখোর বিচারকের জন্য সুলতান ফাতিহের কাছে একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যু।

সুলতান ফাতিহ তার জিহাদ এবং বিজয় অভিযানের পাশাপাশি তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং গুরুত্বশীল ছিলেন। এতে তাকে সাহায্য করেছে তার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিশালী মেধা, পর্যবেক্ষণশক্তি, মুখস্থশক্তি এবং সুঠাম দেহ। তিনি অধিকাংশ সময় জনগণের অবস্থা জানার জন্য এবং তাদের অভিযোগ শোনার জন্য রাতে শহরের অলিগলিতে হেঁটে বেড়াতেন।[৩২৪] প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য তাকে সহায়তা করেছে গোয়েন্দাগণ। যারা বিভিন্ন তথ্য এবং খবর সরবরাহ করতেন। সাম্রাজ্যের সাথে তাদের ছিল গভীর যোগসূত্র। তারা জনগণের প্রতি সদা নিবেদিত, তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখা এবং তাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সমস্যার কথা জানতে আগ্রহী সুলতানের কাছে তাদের রিপোর্ট পৌঁছাতেন। প্রজাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার অর্থ তিনি উদ্ঘাটন করেছিলেন সুলাইমান আলাইহিস সালামের অবস্থা থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—'সুলাইমান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন।' তিনি এ কাজ করতেন তার রাজত্বের চাহিদা অনুপাতে। তিনি এর প্রতিটি অংশে গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং প্রত্যেক অবস্থায় এর দেখভাল করতেন। বিশেষ করে দুর্বলদের দেখভাল করতেন।[৩২৫]

[৩২৩] প্রাগুক্ত।
[৩২৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, পৃষ্ঠা : ৪১০।
[৩২৫] *তাফসিরে কুরতুবি*, (১৭৭/১৩।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলের প্রতি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের উপদেশ

মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার ছেলেকে অসিয়ত করেছিলেন, যা তার জীবন চলার পথে অনুসৃত নীতির কথা পরিপূর্ণ সততার সাথে জানিয়ে দেয়। আরও জানিয়ে দেয় তিনি বিশ্বস্ততার সাথে যে মূলনীতিগুলো পালন করেছিলেন সেগুলোর কথা। তিনি তার পরবর্তী খলিফাগণের কাছ থেকে যে সমস্ত নীতির ওপরে চলা প্রত্যাশা করতেন তা হচ্ছে—

'আমি আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত; কিন্তু আমি মোটেই দুঃখিত নই। কারণ, আমি তোমার মতো এক উত্তরসূরি রেখে যাচ্ছি। তুমি হও সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং দয়াবান। তোমার সকল প্রজাদের দেখাশোনায় নিয়োজিত হবে। কোনো ভেদাভেদ করবে না। ইসলাম ধর্মের প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করবে। কেননা, পৃথিবীর সমস্ত শাসকের দায়িত্ব এটিই। ধর্মীয় বিষয়কে সবকিছুর ওপর গুরুত্ব দিবে। এ ক্ষেত্রে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। কোনো বিচ্ছিন্নতা যাতে না হয়। যে সমস্ত লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে না, কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে না এবং পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিদআত থেকে দূরে থাকবে। যারা তোমাকে বিদআতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। তুমি জিহাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের মান বৃদ্ধি করবে। বিনষ্টতার হাত থেকে বাইতুল মালের সম্পদ রক্ষা করবে। ইসলামের হক ব্যতীত কোনো নাগরিকের সম্পদের দিকে হাত বাড়ানো থেকে বেঁচে থাকবে । আশ্রয়প্রার্থিদের সহায়তা করবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বদা সম্মান করবে।

যেহেতু সাম্রাজ্যের দেহের জন্য উলামায়ে কেরাম শক্ত খুঁটিস্বরূপ, তাই তাদেরকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং তাদের উৎসাহিত করবে। যখন অন্য কোনো শহরে কোনো আলেম সম্পর্কে জানবে, তাকে তোমার কাছে আমন্ত্রণ জানাবে এবং তাকে সম্পদ উপহার দেওয়ার মাধ্যমে সম্মান জানাবে।

সাবধান! সাবধান! সম্পদ এবং সৈন্য যেন তোমাকে ধোঁকায় নিপতিত না করে। তোমার দরবার থেকে আহলে শরিয়তগণকে দূরে রাখবে না। শরিয়তবিরোধী কোনো কাজের প্রতি মনোযোগী হবে না। কেননা, দ্বীনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। হেদায়াত আমাদের মূলনীতি এবং এর মাধ্যমেই আমরা বিজয়ী হয়েছি।

আমার থেকে এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ কর—আমি এই শহরে একটি ছোট পিঁপড়া হয়ে এসেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বিরাট নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং আমার পথ আঁকড়ে ধর এবং আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো। এই দ্বীনকে শক্তিশালীকরণে এবং তার অনুসারীগণের প্রাচুর্যের লক্ষ্যে কাজ করো। কোনো অহেতুক খেল-তামাশায় সাম্রাজ্যের সম্পদ অপচয় করবে না। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খরচ করবে না। কেননা, ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ এটি।[৩২৬]

[১] তুমি হও সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং দয়াবান

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন ওই সমস্ত খ্রিষ্টানদের সাথে—যারা তার সাম্রাজ্যের নাগরিক হয়েছিল। তিনি যখন কুসতানতিনিয়া দখল করেন তখন তাতে ইসলামি যুদ্ধনীতি অবলম্বন করেছিলেন (যাতে সম্মানহানি করা হয় না, কোনো শিশু, বৃদ্ধ, নারীকে হত্যা করা হয় না, কোনো ফসল পোড়ানো হয় না, কোনো গবাদিপশু নষ্ট করা হয় না, কোনো মানুষের বিকৃতি করা হয় না, যে সমস্ত যোদ্ধারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে তারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।[৩২৭]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ রোমীয়দের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুরূপ ইসলাম, আকিদা এবং যুদ্ধনীতির অবলম্বন করতেন, তা হলো, (তোমরা খিয়ানত করবে না, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে না, গাদ্দারি করবে না, বিকৃতি করবে না, কোনো ছোট্ট শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো নারীকে হত্যা করবে না, কোনো খেজুরগাছ উপড়ে ফেলবে না, পুড়িয়ে দেবে না, কোনো ফলদার বৃক্ষ কর্তন করবে না, কোনো বকরি বা উট জবাই করবে না, তবে খাবারের জন্য করতে পার। তোমরা অচিরেই এক জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা নিজেদের ধ্বংসে নিপতিত করেছে। তাদেরকে এবং তারা যেদিকে নিপতিত হয়েছে তা পরিত্যাগ করো। বিসমিল্লাহ বলে কাজ কর)।[৩২৮]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বাইজেন্টাইন রাজধানীর অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং পশ্চিমের খ্রিষ্টানবিশ্বকে ন্যায় এবং দয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি উসমানি ইতিহাসের

---

[৩২৬] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৬১,১৬২।
[৩২৭] *আল-মাসয়ালাতুশ শিরকিয়্যাহ,* মাহমুদ সাবের আশশাযিলি, পৃষ্ঠা : ১০৪।
[৩২৮] *আল-মাসয়ালাতুশ শিরকিয়্যাহ,* মাহমুদ সাবের আশশাযিলি, পৃষ্ঠা : ১০৬।

শিক্ষকগণের মধ্য হতে একজন শিক্ষকে পরিণত হয়ে যান। নিশ্চয় উসমানি সাম্রাজ্য চালিত হয়েছে ইসলামি নীতিমালায়। সেখান থেকে তারা জনগণের প্রতি ন্যায়-ইনসাফ এবং দয়াকে গ্রহণ করেছেন। আবদুর রহমান আজজাম অধীন অঞ্চলগুলোতে উসমানিদের দয়া ও ইনসাফ প্রসঙ্গে বলেন—(কেউ কেউ উসমানি সাম্রাজ্যের কোনো কোনো সময়ের কথা উল্লেখ করে এই রটনা ছড়ায় যে, উসমানি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল, কিন্তু দয়া তাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি একটি প্রচলিত ভুল। ভালোভাবে গবেষণা করে দেখলে এটি কোনো নির্ভরযোগ্য কথা নয়। আমি রোমানিয়ার 'বাসরাবিয়া' শহরে 'দানিস্তাজ' নদীর পাড়ে নিজের কানে তাদের দয়ার কথা শুনেছি। আমাকে বলা হলো, এই দূর অঞ্চলের কৃষকরাও উসমানি সাম্রাজ্যের দয়া, বদান্যতা আর ন্যায়ের কথা বলে প্রতিক্ষণ। এই ঘটনা ইঙ্গিত করে যে, তুর্কিদের নিকট থেকেই জমিনে ন্যায়-ইনসাফের বিস্তৃতি হয়েছে। আমি বুলুনিয়া, রোমানিয়া, বলকান অঞ্চলে আমার বিভিন্ন সফরে অনেক ঘটনা আর গল্প শুনেছি—যা নিরলসভাবে জানিয়ে দেয়, এ অঞ্চলের খ্রিষ্টান লোকদের অন্তরে তুর্কি মুসলিমদের অবস্থান ছিল দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ হিসেবে।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে আমি ভিয়েনাতে ছিলাম। সেখানকার পুলিশরা আমাকে সুসংবাদ শুনিয়েছে যে, উসমানি সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়ানদের সাহায্যের জন্য গালিথিয়া অঞ্চলে পৌঁছে গেছে।)[৩২৯]

এটা এ জন্যই সম্ভব হয়েছে যে, (ইসলামের ন্যায় এবং দয়া—এ দুটি গুণই উসমানিগণকে ইউরোপে সমাসীন করেছে। ন্যায়-ইনসাফ এবং দয়ার মাধ্যমে এ অঞ্চলের লোকেরা তাদের বর্বরতা এবং রুক্ষতা ভুলে সাম্য এবং ন্যায়ের পথ চিনেছে। জানা যায়, উসমানিদের বিজয়ের আগ পর্যন্ত উত্তর এবং মধ্য ইউরোপে কয়েকটি সম্প্রদায়কে হেয়করভাবে গোলাম বানানোর রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল এবং এতে তারা চুক্তিবদ্ধ ছিল। মালডোভা, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরীর মাঝে রাষ্ট্রীয় চুক্তি হয়েছিল যে, যে সমস্ত কৃষক তাদের নেতা 'বুইয়ার' এর শস্যক্ষেত্র থেকে তাদের কারও এলাকায় চলে গেলে তাদের প্রত্যেককে বুইয়ার এর কাছে হস্তান্তর করা হবে। তখন ফসলের ক্ষেত তার ওপরের প্রাণী এবং কৃষকসহ বিক্রি করা হতো।

উসমানিগণ তাদের হৃদয়ে দয়ার অনুভূতি বহন করে ইউরোপে আসেন। যেমনটি উদ্দেশ্য ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তুর্কিরা ইউরোপের নেতৃত্ব দেওয়া সাম্রাজ্যগুলো থেকে অধিক শক্তি এবং সৈন্যের অধিকারী ছিল না। তারা প্রথমে

[৩২৯] *আররিসালাতুল খালিদাহ,* পৃষ্ঠা : ২২,২৪।

ভিয়েনায় পৌঁছে। তাদের পাহাড়, সমুদ্র পরিমাণ সমস্যাময় জীবনে দয়া ছড়িয়ে দেন। যেভাবে ইতোপূর্বে তারা আরব, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় দয়া কার্যকর করেছিলেন।[৩৩০]

নিশ্চয় সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ দয়া এবং ন্যায়-ইনসাফের নীতির ওপর চলেছেন এবং তার পরবর্তী উত্তরসূরিদেরকে তার অনুসৃত নীতি আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন—যা ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী গঠিত।

[২] তোমার সকল নাগরিকের দেখাশোনায় নিয়োজিত হবে। কোনো ভেদাভেদ করবে না

সুলতান মুহাম্মদ নিজেও এ নীতি মেনে চলেছেন। তিনি মুসলিম খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সাম্রাজ্যের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমানভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণিত আছে। খিয়ুস দ্বীপের অধিবাসীরা গালতার ফ্রান্সিকো দ্রাবিরিউ নামক এক ব্যবসায়ীর কাছে চল্লিশ হাজার দোকা পরিমাণ ঋণী ছিল। যখন ব্যবসায়ী দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলো তখন সে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কাছে এর সমাধান চায়। সে দাবি জানায়, এই দ্বীপবাসী সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই সুলতানের জন্য আবশ্যক হলো তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাদের হক আদায় করা। সুলতান তাদের কাছে হামজা পাশার নেতৃত্বে কয়েকটি জাহাজ পাঠান। কিন্তু খিয়ুস দ্বীপবাসী কয়েকজন উসমানি সৈন্যকে হত্যা করে। আর উসমানি সাম্রাজ্যের অনুগত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের নিকট পাঠানো হক ফিরিয়ে দেয়। তখন সুলতান ব্যবসায়ী দ্রাবিরিউকে বলেন—'আমিই দ্বীপবাসীদের পক্ষ থেকে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব। আর তোমার কাছে আমার নিহত সৈন্যদের রক্তের মূল্যস্বরূপ তার আরও কয়েকগুণ সম্পদের দাবি জানাব।'[৩৩১]

সুলতান এই দ্বীপের দিকে একটি নৌজাহাজ নিয়ে অভিযান শুরু করেন। তিনি নিজেই ছিলেন সেই সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায়। তিনি ওই দ্বীপের নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে জাহাজ নোঙ্গর করেন। কোনো রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই আইনুস দ্বীপ জয় করেন। এমব্রোস এবং সামোতরাস দ্বীপ দুটি আত্মসমর্পণ করে। তারা তাদের পালোয়ান থাকা সত্ত্বেও উসমানিদের জন্য তাদের দরজা খুলে দেয়। ফলে খিয়ুস দ্বীপবাসী তাদের ওপর জেনোয়ার ওই ব্যবসায়ীর যা ঋণ ছিল তা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। সুলতানের জন্য বাৎসরিক ছয়হাজার দোকা জিজিয়া প্রেরণ করে। এর পাশাপাশি তারা উসমানিদের যে জাহাজ ডুবিয়েছিল তার পরিবর্তে আরেকটি জাহাজ ক্ষতিপূরণ দেয়।[৩৩২]

[৩৩০] *আল-মাসয়ালাতুশ শিরকিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ১০৭।
[৩৩১] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২১৭।
[৩৩২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২১৮।

নিশ্চয় প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের হকের হেফাজত করা ইসলামি সাম্রাজ্যের আবশ্যক দায়িত্ব।

[৩] ইসলামের প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করবে। কেননা, পৃথিবীর সমস্ত শাসকের দায়িত্ব এটিই

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ যুদ্ধের সময়ে কখনোই এ কথা ভুলতেন না যে, তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদানকারী। তাই তিনি তার সেনাপতি এবং সৈন্যদের ইসলাম ধর্ম এবং আকিদার প্রচারে উৎসাহিত করতেন। যে সেনাপতিদের হাতে শহর বিজিত হতো তিনি তাদের প্রশংসা করতেন। একবার সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সেনাপতি উমর ইবনে তুরখানকে সেনাবাহিনী নিয়ে এথেন্স অভিমুখে রওনা করার এবং সে অঞ্চলে আধিপত্য লাভ করে তাকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। উমর সৈন্যদল নিয়ে এথেন্স অভিমুখে রওনা হলে সেখানকার অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সুলতান ফাতিহ দুই বছর পর এথেন্স শহর পরিদর্শন করেন। তিনি তখন বলেন, 'ইবনে তুরখান কত বিশাল এক অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম পৌঁছালেন।'

উসমানি সালতানাত আল্লাহ তাআলার পথের দিকে দাওয়াত দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। তারা ইউরোপ অঞ্চলে দাওয়াত প্রচারের জন্য যে শক্তি ব্যয় করেছেন তা স্পষ্ট। তাই যুগ, কাল সময়ের পালা পরিবর্তনে সবসময় সেখানে একটি ইসলামি দল ছিল, যারা মুসলিমদের খ্রিষ্টান ধর্মে রূপান্তরের চেষ্টা প্রতিরোধ করেছে। সেই অল্প সংখ্যক লোকগণ এখনো বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়ায় বসবাস করেন, যাদের সংখ্যা আনুমানিক দুই মিলিয়ন।[৩৩৩]

এর কৃতিত্ব প্রথমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের, এরপর উসমানি সুলতানগণের নীতিমালার, যারা মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানোর জন্য আগ্রহী ছিলেন।

[৪] ধর্মীয় বিষয়কে সবকিছুর ওপর গুরুত্ব দেবে। এ ক্ষেত্রে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে, কোনো বিচ্ছিন্নতা যাতে না হয়

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল উসমানি সুলতানগণ ইসলামের উত্থান ঘটিয়েছিলেন; যা ছিল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য, গভীর ইমানের মাধ্যমে সজ্জিত, ধর্মীয় স্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে মনোযোগী। এ জন্য তারা কঠিন কঠিন দ্বীনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। জিহাদ এবং বিজয় অভিযানের জন্য আহ্বানের

[৩৩৩] *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন,* ড. আবদুল আজিজ আশশানাউয়ি, (২৯,৩০/১)

সময় উসমানিদের মুখে সর্বোত্তম শব্দ ছিল—'হয়তো গাজি নয়তো শহিদ। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তাদের প্রতিষ্ঠাতার উপাধি ছিল গাজি। অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। এই সুউচ্চ উপাধিটি সুলতানদের সকল উপাধির ঊর্ধ্বে ছিল। আর উসমানি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল 'ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা এবং জগতবাসীর ওপরে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করা।'

এ জন্য উসমানি সাম্রাজ্য তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তাদের সাম্রাজ্য এবং সম্প্রদায়ে, প্রশাসন এবং সামরিক বিভাগে, সভ্যতা এবং বিধিবিধানে, নীতি এবং বিবেক-বুদ্ধিতে, লক্ষ্যে এবং বার্তাপ্রেরণে ইসলামের রঙ দিয়ে রাঙানো ছিল। সাত শতাব্দীব্যাপী সময়ে তাদের প্রত্যেক সুলতান ধর্মীয় বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত তারা এর ওপর সদা অটল থেকেছেন। তারা নিশ্চিতভাবে মনস্থ করেছিলেন, তারা ইসলাম এবং তার ঐতিহ্য সভ্যতা প্রচারের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করবেন। জমিনের যেখানেই মুসলিমরা বাস করত সে অঞ্চলকেই তারা নিজেদের বাড়ি ভাবতেন। মিল্লাত শব্দটি দ্বীন এবং উম্মত উভয় অর্থই বোঝায়। সমস্ত মাদরাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উসমানিদের এটাই ছিল মূল লক্ষ্য। দ্বীন এবং জাতির মাঝে একত্রিকরণ, যাতে করে কিতাবি শিক্ষার শুরুলগ্ন থেকেই তাদের অন্তরে এ কথা গেঁথে যায়। সমস্ত মুসলিম তাদের রেজিস্ট্রিখাতা সমূহে, যেমন, জন্ম রেজিস্টার, উসমানি সাম্রাজ্যের টিকেট এবং আইডি কার্ডে নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকতেন। তুর্কি, আরব, ককেশাসীয়, আলবেনিয়ান, কুর্দি—এমন পরিচয় দিতেন না। সাম্রাজ্য তাদের কেবল মুসলিম পরিচয়ে যথেষ্ট রাখাকেই গুরুত্ব দিত। যে সমস্ত মুসলিম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন উসমানিগণ তাদের মহানায়ক এবং ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের কাতারে স্থান দিতেন। তাদের বংশধারা যতই পৃথক আর তাদের সময়কাল যত দূরেরই হোক না কেন। যেমন তাদের মধ্য হতে একজন হলেন মুজাহিদ 'আবদুল্লাহ আল-বাত্তাল' রাহিমাহুল্লাহু তাআলা। যিনি বনু উমাইয়া সাম্রাজ্যের সময়ে ১২২ হিজরিতে ছোট এশিয়া অঞ্চলে আক্রিনিউসের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ১২২ হিজরির ঘটনাসমূহের আলোচনায় ইমাম তাবারি তার সম্পর্কে বলেন—'এ বছর আবদুল্লাহ আল-বাত্তাল একদল মুসলিমদের সাথে রোমের ভূখণ্ডে শহিদ হন'।[৩৩৪] উসমানিগণ আবদুল্লাহ আল-বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহুকে তাদের জাতীয় নায়ক মনে করেন। আরব বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ আল-বাত্তালের সময় আর উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ের মাঝে সাতশত বছরের ব্যবধান। উসমানিগণের ইতিহাস ছিল ইসলামের ইতিহাস এবং তাদের মহানায়কগণ ছিলেন ইসলামের মুজাহিদ।[৩৩৫]

[৩৩৪] *তারিখুত তবারি,* দ্বিতীয় খণ্ড, ১২২হিজরির ঘটনাবলি।
[৩৩৫] *আল-মাসয়ালাতুশ শিরকিইয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৫৭।

উসমানি সালতানাতের সুলতানগণ অনেক প্রশংসা এবং উপাধিতে ভূষিত হতেন। যেগুলো বর্ণনা করে যে, তাদের সবচেয়ে বড় এবং প্রধানতম লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সেবা করা। তাদের উপাধিগুলো ছিল। যথা—সুলতানুল গোজাত, সুলতানুল মুজাহিদিন, খাদিমুল হারামাইনিশ শরিফাইন। খলিফাতুল মুসলিমিন।[৩৩৬]

[৫] যে সমস্ত লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে না, কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে না এবং পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদেরকে সেবায় নিয়োগ করবে না

এ জন্যই উসমানি সালতানাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন। যাতে সেখান থেকে সেনাবাহিনীর পরিচালক এবং সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ অফিসারগণ বের হয়ে আসে। তারা সেনাবাহিনীর পরিচালক প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জন্য একটি শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করেন। সাম্রাজ্যের পদসমূহের জন্য বিশ্বস্ত, সামর্থবান, বুদ্ধিমান এবং খোদাভীরু লোক নির্বাচন করতেন। তাদের হাতে সামরিক ভার, পরিচালনা এবং বিচারবিভাগের পদ তুলে দিতেন। যে সমস্ত লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে না, কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে না এবং পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদেরকে এ সকল কাজ থেকে দূরে রাখতেন। পূর্ববর্তী সুলতানগণও এমনই ছিলেন।

[৬] বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিদআত থেকে দূরে থাকবে। যারা তোমাকে বিদআতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে।

উসমানি সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী সুলতানগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতিমালা অনুযায়ী চলেছিলেন। তারা বিদআতের এবং বিদআতিদের সংস্পর্শে থাকার ক্ষতি অনুধাবন করেছিলেন। তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ, উম্মতের ঐকমত্য এবং অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণের ইজতেহাদকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

উসমানি সুলতানগণ যে অভিজাত ইসলামি শরিয়ত মেনে চলেছেন তা বিদআতকে নিন্দনীয় ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنَّ هٰذَا صِرٰطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ

[৩৩৬] প্রাগুক্ত।

{নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথকেই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।} [সুরা আনআম, আয়াত : ১৫৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ـ

{নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।} [সুরা আনআম, আয়াত : ১৫৯]

ইবনু আতিয়্যাহ বলেন—

'উক্ত আয়াতটি প্রবৃত্তির অনুসরণকারী, বিদআত সৃষ্টিকারী, বিভিন্ন শাখাগত বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী এবং অন্যান্যদের শামিল করেছে। যারা তর্ক-বিতর্কে খুবই বাড়াবাড়ি করে। এ সবই পদস্খলনের মাধ্যম এবং নিকৃষ্ট বিশ্বাসের স্থল'।[৩৩৭]

হাদিস শরিফে বর্ণিত রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে—যা আমাদের ধর্ম সমর্থিত নয় তাহলে তা বাতিল'।[৩৩৮]

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই কল্যাণের (যে কল্যাণের ওপর আমরা আছি) পরবর্তী সময়ে কি কোনো অকল্যাণ আছে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ। এমন এক জাতি আসবে যারা আমার নীতি ছেড়ে দিয়ে অন্য নীতি মনে চলবে এবং আমার দিক-নির্দেশনা ছেড়ে দিয়ে অন্য দিক-নির্দেশনায় পথ চলবে।'

আমি বললাম, এই অনিষ্টের পরেও কি কোনো অনিষ্ট আছে?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। জাহান্নামের আগুনের দিকে আহ্বানকারীরা। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তারা তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'।

[৩৩৭] *বদরুত তামাম ফি ইখতিসারিল ইতিসাম,* মুহাম্মদ আল-জাজায়িরি, পৃষ্ঠা : ৩২।
[৩৩৮] মুসলিম (১৩৪৪/৩)

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কাছে তাদের বর্ণনা দিন।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তাদের গাত্রবর্ণ আমাদের মতোই। আমাদের মতোই তারা কথা বলে।

আমি বললাম, যদি সে সময়টা আমি পেয়ে যাই তাহলে আমার কী করণীয়?

তিনি বললেন, 'তুমি মুসলিমদের দল এবং তাদের নেতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।'

আমি বললাম, যদি কোনো নেতা এবং দল না থাকে?

তিনি বললেন—'তাহলে তুমি বৃক্ষের শিকড় আঁকড়ে হলেও সে দল থেকে দূরে থাকবে। এমনকি যদি এ অবস্থায় তোমার মৃত্যুও এসে যায়, তবু তুমি তাদের সাথে মিশবে না'।[৩৩৯]

আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা যা করেছেন তার কোনোটিই আমি পরিত্যাগ করব না। যদি আমি তার কোনো একটি পরিত্যাগ করি তাহলে আমি বিপথগামী হয়ে যাওয়ার ভয় করি।'[৩৪০]

নিশ্চয় বিদআত সৃষ্টিকারীদের কাছ থেকে দূরে থাকা এবং তাদের প্রতিরোধ করা দ্বীনের মূলনির্যাস। কেননা, বিদআতিদের কোনো আমল কবুল করা হয় না। তাদের কাছ থেকে তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শরিয়তের ভাষ্যমতে—তারা অভিশপ্ত। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তাদের দূরত্ব কেবল বাড়তেই থাকবে। কেয়ামত দিবসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তারা মুসলিমদের মাঝে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টিতে বেশ প্রভাব রেখেছে। তারা সুন্নাহ বর্জনকারী। দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের প্রতি লাঞ্ছনা এবং অপদস্ততা নিক্ষেপ করা হবে। তাদের পরিণাম মন্দ হওয়ার আশংকা রয়েছে। আখিরাতে তাদের চেহারাকে কালো করে দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর আরও পরীক্ষার আশংকা রয়েছে।[৩৪১]

এ জন্যই সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ রহিমাহুল্লাহু তাআলা তার উত্তরসূরিদের অসিয়ত করেছেন—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিদআত থেকে দূরে থাকবে। যারা তোমাকে বিদআতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে।

[৩৩৯] *মুসলিম শরিফ, কিতাবুল ইমারাত,* হাদিস নং-১৮৪৭।
[৩৪০] *বদরুত তামাম ফি ইখতিসারিল ইতিসাম,* মুহাম্মদ আল-জাজায়িরি, পৃষ্ঠা : ৩৫।
[৩৪১] *বদরুত তামাম ফি ইখতিসারিল ইতিসাম,* মুহাম্মদ আল-জাজায়িরি, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭।

[৭] তুমি জিহাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের মান বৃদ্ধি করবে।

পূর্ববর্তী উসমানি সুলতানগণ জিহাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের মান বৃদ্ধি করেছেন। তারা সাম্রাজ্যে নিরাপত্তা ছড়িয়েছেন এবং তাদের সাম্রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক ক্ষতিকর বস্তুসমূহ মিটিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরোধ শক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের ফাটল মুছে দিয়েছেন। যেন শত্রুরা কোনো ফাটলকে কেন্দ্র করে বিজয়ী হতে না পারে অথবা কোনো সম্মানিত লোককে লাঞ্ছিত করতে না পারে অথবা কোনো মুসলিম এবং সন্ধিচুক্তির আওতাধীন লোকের রক্তপাত করতে না পারে। সুলতান মুহাম্মদ প্রথমে তার জাতিকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন । এরপর কাফের এবং ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয় নইলে মুসলিমদের জিম্মায় প্রবেশ করে নেয়।

উসমানি সমাজ ইসলাম এবং জিহাদের দিকে আহ্বানের রঙে নিজেদের রাঙিয়েছিল। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সেনা তাদের বিজয়ের আগ পর্যন্ত একটি জিহাদি জীবনের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করত। আর উসমানি সেনাবাহিনী ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কয়েকটি বিরাট এবং বিশাল বিজয় বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে।[৩৪২]

'উসমানি সাম্রাজ্য সুলায়মান আল-কানুনির শাসনকাল পর্যন্ত এমন কিছু কাজ বাস্তবায়ন করেছে, যা দীর্ঘ নয় শতাব্দী ধরে মুসলিমদের জন্য পরম আরাধ্য ছিল। তারা ইউরোপের বড় বড় রাজধানীগুলোর বহু কেল্লায় উম্মতে মুহাম্মদীর পতাকা উত্তোলন করেছে। বহু রাজত্ব এবং সাম্রাজ্যকে ইসলামি হুকুমতের সামনে অবনত করেছে। ইসলামের ছায়া ক্রমেই বিস্তার লাভ করছিল। এমনকি মুসলিম সেনাবাহিনী ইউরোপের পূর্ব এবং পশ্চিমপ্রান্তে বিরাট একটি ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছিল।'[৩৪৩]

ইসলামি সাম্রাজ্যের বাইরের উজিরদের নিয়ে ইস্তাম্বুলে আয়োজিত সপ্তম পরামর্শসভায় মুজাহিদ প্রফেসর নাজুমদ্দিন আরবাকান একটি বক্তব্য পেশ করেন। এ বক্তব্যে তিনি উসমানি সাম্রাজ্য কর্তৃক অঙ্কিত ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন—'নিশ্চয় এই প্রাসাদ যেখানে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই বৃহৎ ইসলামি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার দরজায় লিপিবদ্ধ রয়েছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ...। এটা সেই প্রাসাদ—যা সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর নির্মাণ করেছিলেন।

এই স্থান কেন ঐতিহাসিক হবে না? এখান থেকেই কি কালক্রমে ইসলামি বিশ্বের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা হতো না? কেনইবা এ স্থান ঐতিহাসিক হবে না? এখান

[৩৪২] *আল-মাসআলাতুশ শিরকিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৬০।
[৩৪৩] *আল-মাসয়ালাতুশ শিরকিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৬৩।

থেকেই মুসলিম সেনাবাহিনীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য দুনিয়ার কোণে কোণে পাঠানো হতো। তারা যেখানে অবতরণ করত এবং যেখানেই আঘাত করত সেখানে দ্বীনের আলো, সঠিক পথের দিশা এবং ন্যায়ের বাণী ছড়িয়ে পড়ত। কেনইবা এ স্থান ঐতিহাসিক হবে না? আজকে যে পাথরের ওপর মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে সেখানে ইসলামি সেনাবাহিনীর পতাকাসমূহ স্থাপন করা হতো, যা সমস্ত মুসলিমদের দরজায় দরজায় শোভা পেত। সীমাবদ্ধভাবে স্মরণ না করে দৃষ্টান্তরূপে স্মরণ করো। ইসলামি নৌবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনকে ডাচ উপনিবেশের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছে। এমনিভাবে ইসলামি সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তগুলো লোভী যোদ্ধাদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকাকে রক্ষা করেছে।

সবকিছুর ঊর্ধ্বে কথা হলো, এই ঐতিহাসিক স্থাপনা তার দেয়ালগুলোর মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝান্ডা এবং তার পবিত্র চাদর, তার তরবারিসমূহ এবং তার অনেক মহৎ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়েছে।[৩৪৪]

এই সাম্রাজ্য জিহাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। তার সম্প্রদায়সমূহ এবং সেনাবাহিনীকে এ মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নেই প্রস্তুত করেছে। এর মাধ্যমে ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপকার লাভ হয়েছে। তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

- মুসলিমদের সম্মান, সমৃদ্ধি এবং কাফেরদের অপমান, লাঞ্ছনা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা।
- মানুষ দলে দলে আল্লাহ তাআলার দ্বীনে প্রবেশ করা।[৩৪৫]
- ইসলামের আলো, ইনসাফ এবং বরকতের মাধ্যমে মানুষ সৌভাগ্যশালী হওয়া।

উসমানি সাম্রাজ্য জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত ছিল এবং তারা কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—

- জমিনে আল্লাহ তাআলার শাসন এবং ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করা।
- কাফেরদের শত্রুতা প্রতিহত করা।
- লোকদের ওপরে অত্যাচার বন্ধ করা।
- লোকদের মাঝে ইসলামি দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ঘটানো।[৩৪৬]

[৩৪৪] *আল-মাসয়ালাতুশ শিরকিয়্যাহ,* পৃষ্ঠা : ৬৩-৬৫।
[৩৪৫] *ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম,* আলি মুহাম্মদ আসসাল্লাবি, পৃষ্ঠা : ৩৬৯-৩৭৫।
[৩৪৬] *ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম,* আলি মুহাম্মদ আসসাল্লাবি, পৃষ্ঠা : ৩৬৬-৩৬৭।

[৮] বিনষ্টতার হাত থেকে বাইতুল মালের সম্পদ রক্ষা করবে

উসমানি সুলতানগণ মনে করতেন, সাম্রাজ্য হচ্ছে এমন একটি সংস্থা—যা জনগণের কথা বলে এবং তাদের কথা বাস্তবায়ন করে। পাশাপাশি তারা জনগণের কল্যাণের ব্যাপারে নিয়োজিত হয়। সুতরাং নিরাপত্তা দেওয়া এবং প্রতিরোধ করার মাঝেই সাম্রাজ্যের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাম্রাজ্যের দায়িত্ব হলো সামাজিক কল্যাণের বিষয় দেখাশোনা করা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে অপচয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উৎসসমূহের সংরক্ষণ করা। রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বাইতুল মালের উল্লেখযোগ্য উৎসগুলো হচ্ছে—

- ফরজ জাকাত একত্র করা এবং সেগুলোকে শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রে বণ্টিত করা।
- সাম্রাজ্যের অধীন রাজত্বগুলোর রাজাদের ওপরে ট্যাক্স আরোপিত করা এবং সেগুলোকে সেনাবাহিনীর ওপর এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।
- মুসলিমদের সাথে লড়াই থেকে নিষ্কৃতিলাভের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তিকারীদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেওয়া।
- উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরের যে সমস্ত ব্যবসায়িক কাফেলা আসত তাদের কাছ থেকে এক দশমাংশ আদায় করা।
- প্রয়োজনের সময়ে সকল প্রজাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অথবা ইচ্ছামূলকভাবে চাঁদা আদায় করা, যেন তা জিহাদের ময়দানে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যায়।
- সম্পদের উৎসগুলো কাজে লাগানো এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেমন বিভিন্ন খনি সচল করা এবং অনাবাদী জমিগুলো আবাদ করা। আর সেখান থেকে সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট একটি অংশ আদায় করা, যেন তা দিয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করে সেবা নেওয়া যায়।[৩৪৭]

অর্থনৈতিক জাগরণ এবং এ ক্ষেত্রে শরিয়তের নিয়ম-কানুনের প্রয়োগ করাও সাম্রাজ্যের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—

- বাজারের প্রয়োজনীয় পরিমাপ এবং ওজনকারী বস্তুসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন, দাঁড়িপাল্লা, বিভিন্ন পরিমাপক বস্তু এবং বিভিন্ন উৎকৃষ্ট পণ্য।
- প্রতারণা প্রতিহত করা এবং বেচাকেনা ও সকল কাজে ফাসেদ চুক্তিগুলোকে বাতিল ঘোষণা করা।

[৩৪৭] *ইকতিসাদিয়্যাতুল হারব ফিল ইসলাম,* ড. গাজি আততামাম, পৃষ্ঠা : ১৩৭।

- পারস্পরিক মুআমালাসমূহে সৎকাজের প্রতি আদেশ দেওয়া—যেমন : সততা, ন্যায়-ইনসাফ এবং বেচা-কেনার মতো লেনদেনসমূহে বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা। এমন বেচাকেনার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের ওপর মিথ্যে শপথ করার মতো মন্দ-কর্ম থেকে নিষেধ করা।
- মানুষকে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পোষণে উদ্বুদ্ধকারী বিভিন্ন ব্যবসায়িক কৌশল অবলম্বন করা থেকে বাঁধা দেওয়া। যেমন তালাকিয়ে রোক্কবান (শহরের বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে আগে আগে সাক্ষাৎ করে তাদের কাছ থেকে কমমূল্যে পণ্য ক্রয় করে শহরে এসে বেশি দামে বিক্রি করা), মোনাজাশা (ক্রয় করার ইচ্ছা ছাড়া শুধু অন্যকে প্ররোচিত করার জন্য দামাদামি করা এবং পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে বলা), তাদলিস (বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের এমন দোষ গোপন করা যা বিক্রেতার বর্ণনা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়) এবং গবনে ফাহেশ (কোনো পণ্য থেকে মাত্রাতিরিক্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করা) ইত্যাদি।
- হারাম বস্তুসমূহের প্রচলন বন্ধ করা। যেমন, মদ, শূকর, তাস, জুয়ার যন্ত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন খেলাধুলার বস্তুসমূহ। যেগুলো মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে।
- সম্পদ বিনষ্ট করা এবং অপচয় থেকে নিষেধ করা এবং অপচয় বর্জন করার ক্ষেত্রে লোকদেরকে সচেতন করা।[৩৪৮]

[৯] ইসলামের হক ব্যতীত কোনো নাগরিকের সম্পদের দিকে হাত বাড়ানো থেকে বেঁচে থাকবে

একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে শরিয়তের আদেশসমূহ কার্যকর করা। আর শরিয়ত এসেছে মানুষের জীবন চলার পথের অবলম্বন তাদের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে। শরিয়তের কোনো হক ব্যতীত অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার সকল পন্থাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبٰطِلِ ـ

{তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না।} [সুরা বাকারাহ, আয়াত : ১৮৮]

চুরি নিষিদ্ধ করে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপরে শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[৩৪৮] *ইকতিসাদিয়্যাতুল হারব ফিল ইসলাম,* ড. গাজি আততামাম, পৃষ্ঠা : ১৩৮।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكٰلًا مِّنَ اللَّـ

{পুরুষ এবং নারীদের মধ্য থেকে যারা চোর তাদের উভয় হাত কেটে দাও। এটা তাদের উপার্জনের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি।} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩৮]

এমনিভাবে ইসলাম ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ক্ষতিসাধনকারী সুদকে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا أَضْعٰفًا مُّضٰعَفَةً ـ

{হে ঈমানদারগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।} [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩০]

এমনিভাবে প্রতারণা, স্টক করা, ছিনতাই, আত্মসাৎ এবং ধোঁকার মতো সম্পদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী উপায়গুলো নিষিদ্ধ করেছে। এগুলোর প্রত্যেকটিই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যা নিষেধ করা হয়েছে।

একজন শাসকের কর্তব্য হচ্ছে চুরি এবং ছিনতাইয়ের হাত থেকে প্রজাদের সম্পদ রক্ষা করা। কোনো কারণ ছাড়াই প্রজাদের সম্পদের দিকে তার হস্ত প্রসারণ করা এবং অন্যের সম্পদে সীমালঙ্ঘন করা কোনো শাসকের কর্তব্য নয়।

[১০] আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা করবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বদা সম্মান করবে

দরিদ্র, অসহায় এবং পথশিশু এবং প্রত্যেক দয়াপ্রার্থী এবং ন্যায়প্রার্থীর প্রতি মায়া-মমতা এবং দয়ায় উসমানি শাসকগণ প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। এ ক্ষেত্রে উসমানি সাম্রাজ্য বিরাট অবদান রেখেছে। সুলতানগণ এবং উজিরগণ তালেবে ইলম, দরিদ্র, অসহায় এবং এতিমদের জন্য বিরাট অংকের সম্পদ ওয়াকফ করেছেন। সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে ওয়াকফ ছিল একটি মূলখুঁটি। উস্তাদ মুহাম্মদ হারব বলতেন—'ইস্তাম্বুলের জামিয়াগুলোতে[৩৪৯] সভ্যতা এবং জ্ঞানের আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ পাশা ছিলেন এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি ইস্তাম্বুলের সভ্যতা এবং জ্ঞানের আন্দোলনের ওপর চেকোস্লোভাকিয়ার দুই হাজার গ্রামের ওয়াকফকৃত সম্পদ থেকে ব্যয় করতেন (তখন চেকোস্লোভাকিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের অনুগত ছিল)। রুমলির (বলকানের) সামরিক বিচারক আসাদ আফেন্দি বিবাহযোগ্য পরিত্যাক্তা যুবতীদের

[৩৪৯] উসমানি সংবিধানমতে, জামিয়া হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ দ্বীনি এবং ইলমি প্রতিষ্ঠান, যাতে মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় থাকত। সেখানে আরও থাকত লাইব্রেরি, ছাত্রদের থাকার জায়গা, ছাত্রদের জন্য বিশেষ খাবার হোটেল এবং দাতব্য হোটেল (লিল্লাহ বোর্ডিং), বাথরুম, মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল।

উপঢৌকন দেওয়ার জন্য দুইবার বিশাল অংকের সম্পদ ওয়াকফ করেছিলেন। উসমানি সাম্রাজ্যে এমন বহুসংখ্যক বিভিন্ন ধরনের ওয়াকফ সংস্থা ছিল। যেমন : একধরনের ওয়াকফ সংস্থার সম্পদ ব্যয় করা হতো শরণার্থীদের খাতে ব্যয় করার জন্য, তবে খাবারের জন্য নয়। কেননা, বিনামূল্যে খাবার প্রদানের জন্য আরেকটি প্রশাসনিক ওয়াকফ সংস্থা ছিল, যার নাম ছিল ইমারাতু ওয়াকফি অর্থাৎ স্বেচ্ছায় খাবারের জন্য নিয়োজিত ওয়াকফ সংস্থা। এ সংস্থাগুলো প্রতিদিন প্রায় বিশ হাজার লোককে বিনামূল্যে খাবার দিত। প্রতিটি প্রদেশেই এমন নিয়ম চালু ছিল।'[৩৫০]

১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া সুলাইমানিয়ায় অবস্থিত দাতব্য হোটেল (লিল্লাহ বোর্ডিং) এর বাজেট প্রায় দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল।[৩৫১]

এমনিভাবে সুলতান, উজির এবং আমির-উমারাদের ব্যাপারে সাম্রাজ্যের একই নীতি ছিল। তারা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে যথাযথ সম্মান করতেন।

[১১] যেহেতু সাম্রাজ্যের দেহের জন্য উলামায়ে কেরাম শক্ত খুঁটিস্বরূপ, তাই তাদেরকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করবে। যখন অন্য কোনো শহরে কোনো আলেম সম্পর্কে জানবে, তাকে তোমার কাছে আমন্ত্রণ জানাবে এবং তাকে সম্পদ উপহার দেওয়ার মাধ্যমে সম্মান জানাবে

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ গুরুত্বের সাথে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলেমগণকে নিয়োজিত করেন এবং তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। এ জন্য তিনি বিশেষ নীতি প্রণয়ন করেন। বড় বড় মসজিদগুলোতে খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং দায়িত্বশীল এর পদগুলোকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। এ সকল পদের জন্য আগ্রহী প্রার্থীগণ বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভ করতেন। দেখা যেত অধিকাংশ সুলতান এবং উজিরগণ এ সমস্ত মাদরাসা নির্মাণের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। রাজধানীর ধর্মীয় দায়িত্বশীলগণ সরাসরি শহরের মুফতিয়ে আজমের অনুগত থাকতেন এবং বড় বড় প্রদেশগুলোতে মুফতিয়ে আজমের প্রতিনিধিত্ব করতেন সামরিক বিচারকগণ। আর ছোট ছোট প্রদেশগুলোতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ইমামগণই সকল দ্বীনি বিষয়ে ফায়সালা দিতেন।

দ্বীনি দায়িত্বশীলগণকে প্রস্তুতকারী মাদরাসাগুলোতে তিন ধরণের তালিবে ইলম তথা ছাত্র ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ের ছিল 'আসসুফতা'। তাদের সাথে ছিল একদল শিক্ষা সহকারী, যারা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার সময় ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করত।

[৩৫০] [৩৪২] *আল-উসমানিয়্যুনা ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ,* পৃষ্ঠা : ৪২২।

আরেকদলের উপাধি ছিল 'দানেশমান্দ' অথবা আলিম তথা জ্ঞানী। আর সবচেয়ে উর্ধ্বে ছিল শিক্ষকের পদ। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সময়ে সুফতাদের সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার। অধিকাংশ সময়েই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের প্রভাব থাকত।[৩৫২]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ 'শাইখুল ইসলাম' উপাধি উদ্ভাবন করেন। শাইখুল ইসলাম হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। গুরুত্বের দিক দিয়ে তিনি সুলতানের সমপর্যায়ে বিবেচিত হতেন। সাম্রাজ্যের শরিয়াহ বিভাগ, বিচারকগণ, মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত মাদরাসাসমূহ এবং বড় বড় ওয়াকফ এস্টেটের দায়িত্বশীলগণ তার অনুগত ছিলেন। এমনিভাবে শরয়ি বিচারকগণ, সামরিক বিচারকগণ এবং মুফতিগণও তার অনুগত ছিলেন।

উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রথম দিকে যুদ্ধের ময়দানে নামা সেনাবাহিনীর সহচর সামরিক বিচারক প্রাধান্য পেতেন। এরপর সুলাইমান আল-কানুনির আমলে এসে মুফতি পদ হয়ে যায় উলামা এবং ফুকাহায়ে কেরামের শীর্ষস্থানীয় পদ। তখন মুফতি নিজেই ছিলেন শাইখুল ইসলাম। সুলতানগণ শাইখুল ইসলামের ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাই যখনই কোনো বিপদ বা সঙ্কট আসত তারা শাইখুল ইসলামের ক্ষমতার আশ্রয় নিত এবং তার মাধ্যমে উপকার লাভ করত। শাইখুল ইসলামের ক্ষমতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি সুলতানকে বহিষ্কার করার ফতোয়া জারির অধিকার রাখতেন।[৩৫৩]

এভাবে শাইখুল ইসলামের ফতোয়া ব্যতীত সাম্রাজ্য কোনো যুদ্ধে বের হতো না। যতক্ষণ না তিনি ঘোষণা করতেন এ যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মুফতির সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর কোনো অন্যথাকারী ছিল না। সাম্রাজ্যের শরীরে বেড়ে ওঠা ইসলামি সংস্কৃতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশোদ্ভূত সম্মানীত ব্যক্তিবর্গকেও তাদের যথাযথ সম্মান করত। তাদের মধ্যকার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সমাজের উচ্চপদে আসীন ছিলেন।

উসমানি সালতানাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, সেগুলো যেন এক একটি হাতিয়ার। তারা চাইতেন এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শিকড় যেন মুসলিমদের সাম্রাজ্যের প্রতিটি সম্প্রদায়, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে যায়। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একদল ছাত্র বিচারকার্য, ফাতওয়া, ভাষা এবং ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সম্মানজনক কাজে নিয়োজিত হতেন। এমনিভাবে তারা দাতব্য ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিভিন্ন নিদর্শন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করতেন। তারা মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অনাথ-আশ্রম, এতিমখানার মতো দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

[৩৫২] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ,* ড. আলি হাসুন, পৃষ্ঠা : ৪০৫।
[৩৫৩] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস,* পৃষ্ঠা : ৮৯।

আরেকদল ছাত্র যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের মধ্যে দলে দলে ছড়িয়ে পড়তেন। যুদ্ধের পূর্বে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা সৈন্যদের শানিত করতেন। তারা সৈন্যদলের কাছে উপস্থাপন করতেন প্রথমযুগের মুসলিম সেনাদের বীরত্ব এবং খোদাভীরুতার দৃষ্টান্ত। যখন তারা আরবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র থেকে বের হয়ে অভিমুখী হয়েছিল মানুষের ঢলের প্রতি। পূর্বে ইরাক আর পারস্য। দক্ষিণে শাম দেশ। এরপর মিসর পাড়ি দিয়ে উত্তর আফ্রিকায়। আর ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে তারা পৌঁছেছিল আন্দালুসে। তারা সৈন্যদের স্মরণ করিয়ে দিতেন দ্বীনি জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতে কারিমা এবং হাদিসে নববিগুলো। আরও স্মরণ করিয়ে দিতেন দুইটি উত্তম বস্তুর মাধ্যমেই সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য নয়তো শাহাদাতবরণ। তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিতেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান এবং তারা যে মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করতেন সে কথা। এমনকি তখনকার ইসলামি সেনাবাহিনী পারস্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কেল্লা গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এমনিভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তিত্বগণ যুদ্ধের ময়দানে সালাতুল খাওফে সৈন্যদের ইমামতি করতেন।[৩৫৪]

দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্ব দেওয়া উলামায়ে কেরামগণ সুলতানকে মুসলিমদের নেতা মনে করতেন। সুলতানের 'ওলিয়্যুল আমর' তথা বিচারক অথবা শাসক হওয়ার গুণের কারণে সকলের জন্য সুলতানের আনুগত্য করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তার পবিত্র গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন—

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ـ

{হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ, তার রাসুল এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা জ্ঞানী, শাসক এবং বিচারক তাদের আনুগত্য করো। যদি কোনো বিষয়ে তোমরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ তাআলা এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।}
[সুরা নিসা, আয়াত : ৫৯]

তারা বিশ্বাস করতেন শরিয়তের গণ্ডির বাইরে শাসকের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা শাসকগণের আনুগত্য মৌলিক নয়। বরং তাদের আনুগত্য মৌলিক আনুগত্য থেকে উদ্ভূত, যা মূলত মৌলিক নয়। খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলীফা আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করানোর সময়ে প্রথম যে বক্তব্য

[৩৫৪] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন* (৪৫৫,৪৫৬/১)

দিয়েছিলেন তাতে তিনি এই অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এ বক্তব্যে তিনি তার শাসননীতিসমূহ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ বক্তব্যে তিনি একটি কথা বলেছিলেন—

> 'হে লোকসকল, নিশ্চয় আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, তবে আমি আপনাদের মাঝে উত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। আর যদি আমি মন্দ কাজ করি তাহলে আমাকে প্রতিহত করবেন। আমি যে কাজে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করব সেখানে আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের নাফরমানি করি তাহলে আমার আনুগত্য করা আপনাদের দায়িত্ব নয়।'[৩৫৫]

এভাবেই হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত মুসলিমদের কাছে তার আনুগত্যের কথা বলেছেন। যত দিন তিনি আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশিত পথে চলবেন তত দিন যেন তারা তার আনুগত্য করে। সুতরাং যদি কোনো কাজে স্রষ্টার অবাধ্যতা এবং নাফরমানি হয় তাহলে সে কাজে সৃষ্টিজীবের কোনো আনুগত্য নেই।

উলামায়ে কেরাম এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় শাইখুল ইসলাম সুলতান এবং প্রধান উজিরের সাথে তাদের বিরোধ হলে শরিয়তের ওপর নির্ভরশীল থাকতেন। শরিয়তের মূলনীতি থেকে পিছিয়ে তাদের প্রতি কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন না। এ সময় সাধারণ জনগণ উলামায়ে কেরামের সাথে অবস্থান করতেন এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তের সমর্থন করতেন। কেননা, উলামায়ে কেরাম আধ্যাত্মিক এবং শিষ্টাচার এই উভয় শক্তির অধিকারী ছিলেন। বিচারকার্য, ফতওয়া প্রদান, ইমামত, মসজিদসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মীয় নিদর্শন প্রতিষ্ঠা এবং দাতব্য সংস্থাগুলো নির্মাণের সময়ে তাদের এই দুই শক্তি প্রতিফলিত হতো। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন উদ্যমী। এর শীর্ষে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে শিক্ষা প্রদান করা। তারা সেখানে ইসলামি শরিয়াহর জ্ঞান এবং দ্বীনের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিতেন। এ জন্যই শরয়ি ব্যক্তিত্ব হিসেবে লোকেরা তাদের দিকে অধিক মনোযোগী হতেন এবং তারা ছিলেন লোকদের প্রতি অধিক দয়াদ্র এবং তাদের ডাকে সাড়া দিতেন।[৩৫৬]

[৩৫৫] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন* (৪৬০/১)
[৩৫৬] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন* (৪৬৬/১)

[১২] সাবধান! সাবধান! সম্পদ এবং সৈন্য যেন তোমাকে ধোঁকায় নিপতিত না করে। তোমার দরবার থেকে আহলে শরিয়তগণকে দূরে রাখবে না। শরিয়তবিরোধী কোনো কাজের প্রতি মনোযোগী হবে না। কেননা, দ্বীনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। হেদায়াত আমাদের মূলনীতি এবং এর মাধ্যমেই আমরা বিজয়ী হয়েছি

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার পরবর্তী শাসকগণকে সৈন্য এবং সম্পদ নিয়ে গর্ব করা থেকে সতর্ক করেছেন। তাদের কাছে বর্ণনা করে দিয়েছেন শাসকদের কাছ থেকে উলামা এবং ফুকাহায়ে কেরামের দূরত্বের ক্ষতির কথা। এমনিভাবে শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতা থেকেও সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে করে জাতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হবে। আর আখেরাতে ধ্বংস এবং শাস্তির মুখোমুখি হবে। উম্মাহর জীবনের দ্বীনি, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরিয়াহ তথা বিধান থেকে, দূরে থাকার প্রভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বিপদাপদ মানুষের পিছু নিতেই থাকে এমনকি একসময় তাদের জীবনের প্রত্যেক বিষয়কেই গ্রাস করে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ـ

{অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।} [সুরা নুর, আয়াত : ৬৩]

শরিয়তের বিধান থেকে দূরে থাকার ফলে যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্য থেকে হচ্ছে উম্মাহ নির্বোধ হয়ে যাওয়া, তাদের অনুভূতি শক্তি হারিয়ে যাওয়া এবং তাদের মনোবলের মৃত্যু। ফলে তারা কোনো সৎকাজের প্রতি আদেশ করতে পারবে না এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে পারবে না। বনি ইসরাইল যখন সৎকাজের প্রতি আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা বর্জন করেছিল তখন তাদের যে অবস্থা হয়েছিল এই উম্মাহরও ঠিক একই অবস্থা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ـ

{বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ আলাইহিস সালাম এবং মরিয়ম তনয় ইসা আলাইহিস সালামের জবানে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা যে মন্দ কাজ করত তাতে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা কতইনা নিকৃষ্ট!} [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৭৮, ৭৯]

সুতরাং যে জাতি শরিয়তের আদেশ এবং নিষেধসমূহের প্রতি গুরুত্ব দেবে না, বনি ইসরাইলের মতো তাদেরও অধঃপতন হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের প্রতি আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। এরপর তোমরা অত্যাচারীর হাত ধরে তাকে হকের মাঝে সীমাবদ্ধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরস্পরের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন এবং তোমাদের অভিসম্পাত করবেন, যেভাবে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন'।[৩৫৭]

যখন অন্তরসমূহ আল্লাহ তাআলার হুকুমের আনুগত্য থেকে পরিবর্তিত হয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিরোধিতা এবং অবাধ্যতায় মনযোগী হয় তখন তাদের এই অন্তর পরিবর্তনের ফলে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অব্যাহত রীতি প্রয়োগ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ـ

{তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা কখনোই কোনো জাতিকে প্রদত্ত নিয়ামত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা পরিবর্তন করে নেয়।} [সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৩]

এর ফলে ইসলামি বিজয়ের আন্দোলন থেমে যায়। অনেক সম্প্রদায় শরিয়তের আদেশ বিনষ্ট করা এবং শরিয়তবিরোধী নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হওয়ায় দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর ফলেই মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নিজেদের ওপর এবং সম্পদ ও সম্মানের ওপর সীমালঙ্ঘন অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনিভাবে শত্রু এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলাম এবং মুসলিমদের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলার সাহায্য অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে ভয়-ভীতি এবং ক্ষুধায় দিনাতিপাত করতে শুরু করে। শহর, গ্রাম ধ্বংস হয়ে তার ওপর শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করে এবং লোকদের বিপদাপদ ঘিরে নেয়। উসমানি সাম্রাজ্যের শেষভাগে এসে এমনটিই ঘটেছিল।

দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা এবং ইতিহাসের ঘটনাগুলো থেকে আল্লাহ তাআলার একটি রীতির কথা জানা যায়। যখন আল্লাহর পরিচয় লাভকারী কেউ আল্লাহ তাআলার নাফরমানি

[৩৫৭] *সুনানে আবু দাউদ,* কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমরি বিল মারুফ, হাদিস নং- ২৭০।

করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর এমন কাউকে চাপিয়ে দেন যারা আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানে না। যেমনটি ঘটেছে আন্দালুসে। আল্লাহ তাআলা সেখানে মুসলিমদের ওপরে খ্রিষ্টানদের চাপিয়ে দিয়েছেন।[৩৫৮] উসমানি খিলাফত ধ্বংসে ইহুদি, ব্রিটিশ এবং রুশদেরকে এভাবেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উসমানি সাম্রাজ্যের শক্তি, সম্মান ও মর্যাদার রহস্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং তার বিধান প্রয়োগের শক্তি। আল্লাহ তাআলার শরিয়ত আঁকড়ে ধরা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করা এবং সেদিকে আহ্বান করা। এ জন্যই মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার ছেলেকে বলেছিলেন—নিশ্চয় ধর্মই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। হেদায়াত আমাদের মূলনীতি এবং এর মাধ্যমেই আমরা বিজয়ী হয়েছি।

[১৩] এই দ্বীন শক্তিশালীকরণে এবং তার অনুসারীগণের প্রাচুর্যের লক্ষ্যে কাজ কর

জমিনে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করার মাধ্যমেই রাষ্ট্র এবং জাতির জীবনে উত্তম ফলাফল বাস্তবায়িত হবে। এই ফলাফলগুলোর মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, অন্তরকে গুনাহ এবং মন্দ কাজ থেকে পবিত্র রাখা এবং কল্যাণের কাজে তাকে নিয়োজিত করা। এ জন্যই এ দ্বীনকে শক্তিশালী করার ফল হচ্ছে দ্বীনের অংশীদারত্ব। এটা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করবে এবং গোনাহের জন্য নফসের হিসেব নেওয়ার কথা জানাবে।

চোখের সামনে এমন উদাহরণ তুলে ধরবে—যা অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় জাগ্রত করবে এবং অন্তরকে সদা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত করবে। এমনিভাবে দ্বীনকে শক্তিশালী করা এবং শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ফলে রাজা এবং প্রজার হক ও অধিকারে সমতা বিধান হবে। সাম্রাজ্যের সকল বাসিন্দার জন্য ন্যায়ের পথ সুগম হবে। এভাবে শরিয়তের অনুসরণে প্রভূত বরকত এবং নিয়ামত অবতীর্ণ হবে। কেননা, আখেরাতের জীবনে উত্তম প্রতিদান এবং পার্থিব জীবনের কল্যাণের জন্য এর চেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি নেই। এটিই একমাত্র পথ ও পদ্ধতি যার মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে। শরিয়ত মেনে চললে অন্তরে এবং শরীরের শিরায় শিরায় বরকত অনুভূত হবে। জীবনের উত্তম ভোগবিলাস সামগ্রীতে বরকত হবে। অল্প জিনিসেও বরকত হয় যখন তার মাধ্যমে উপকার লাভের পন্থা সুন্দর হয়। শরিয়ত মেনে চলার ফল হচ্ছে একটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ, যা তার দ্বীন এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ, যা কিতাবুল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে তার চলার পথের উৎস হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। কেননা, এর মধ্যেই একটি মুসলিম দল, মুসলিম জাতি এবং মুসলিম সাম্রাজ্য নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে।

[৩৫৮] *ফিকহুত তামকিন ইনদা দাওলাতিল মোরাবিতীন,* আলি সাল্লাবি, পৃষ্ঠা : ১৬৭।

এমনিভাবে তার ফল হচ্ছে প্রেরণা লাভ করা এবং নিজেকে জ্ঞান, সভ্যতা এবং উন্নতি এবং অগ্রগতির মাধ্যমগুলো গ্রহণ করার দিকে মনোযোগী করা। কেননা, সেই শরিয়ত এমন জীবনের দিকেই আহ্বান করে। যেমনিভাবে তা অসভ্য সমাজের সভ্যতায় গড়ে ওঠা জীবনের দাম্ভিকতাকে ঝেড়ে ফেলতে আহ্বান করে, তা যাই হোক না কেন এবং যেখানেই পাওয়া যাক না কেন?[৩৫৯]

নিশ্চয় লোকেরা আল্লাহওয়ালা আলেমগণের মুখাপেক্ষী। কেননা, আলেমগণ তাদের দ্বীন শিক্ষা দেবে এবং তাদের নফসকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দীক্ষা দেবে। এ জন্য ইসলামি নেতৃবৃন্দের জন্য আবশ্যক হলো উলামায়ে কেরামের সম্মান করা এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। তারাই লোকদের কাছে আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ বর্ণনা করেন। ইসলামের সামগ্রিক নীতিমালা অনুযায়ী শরিয়তের দলিলসমূহ ব্যাখ্যা করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

{যদি তোমরা না জান তাহলে আহলে জিকির অর্থাৎ আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করো।} [সুরা নাহল, আয়াত : ৪৩]

[১৪] কোনো অহেতুক খেলতামাশায় সাম্রাজ্যের সম্পদ অপচয় করবে না। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খরচ করবে না। কেননা, ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ এটি

নিশ্চয় এই অসিয়তটি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়ের প্রশাসকগণকে খরচের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছে। এই অসিয়তটিই আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ করার সারমর্ম। আল্লাহ তাআলা এমন অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রশংসা করা হয়েছে এবং এ ছাড়া যত কৃপণতা, অপচয় এবং বিনষ্টতা আছে সেগুলোর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ـ

{তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে উদারহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।} [সুরা ইসরা, আয়াত : ২৯]

[৩৫৯] *তাতবিকুশ শরিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ লিতরারিকি,* পৃষ্ঠা : ৬০,৬১।

আর আল্লাহ তাআলা মুমিনগণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

{এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। তাদের এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।} [সুরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার সাম্রাজ্য এবং শাসকগণের জন্য অপচয় থেকে দূরে থাকাকে আবশ্যক করেছেন। কেননা, এতে আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানি করা হয়।

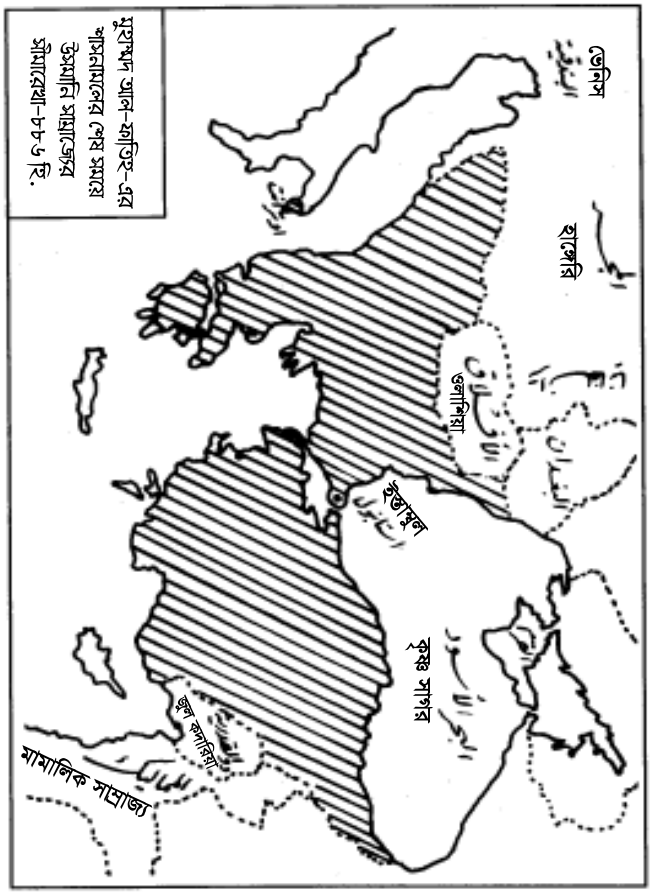

মুহাম্মদ আল-ফাতিহ-এর শাসনামলের শেষ সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের সীমারেখা-৮৮৬ হি.

যুদ্ধের ময়দানে জাতির সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য উসমানি সালতানাতের মতো জিহাদি সালতানাতের একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল, যেন সৈন্যদের প্রয়োজনসমূহ নিরাপদ রাখা যায় এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য এবং সেবা পৌঁছানো যায়। এ জন্যই পূর্ববর্তী উসমানি সুলতানগণ সরকারি এবং বেসরকারি খাতে অপচয় এবং অপব্যয় থেকে নিষেধ করেছেন। সরকারি এবং বেসরকারি খরচের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করত, যেন জাতি যুদ্ধের সময়ে কোনো অর্থনৈতিক সংকটে না পড়ে, যা তাদের পরাজয়ের কারণ হবে। তাই উসমানি সাম্রাজ্য অন্যান্য সরকারি এবং জনপ্রিয় সেক্টরগুলোতে নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করত—

[১] যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য এবং জাতির প্রয়োজনীয় খাবার, ঔষধ এবং রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকীয় সম্পদ ও উপাদানসমূহ সরবরাহ করা।

[২] যুদ্ধ এবং সংকটের সময়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য সরবরাহ করা।

[৩] আবশ্যকীয় পণ্য এবং উপঢৌকনের খাজানা থেকে কোনো কমতি হলে দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে তার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

[৪] যুদ্ধের অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে যে মুদ্রাস্ফীতি হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা।

[৫] প্রয়োজনীয় পণ্য এবং সেবা ইনসাফের সাথে বণ্টন করা, যাতে সমাজের প্রতিটি দলের যথেষ্ট অংশ নিরাপদে থাকে।[৩৬০]

যে সমস্ত সাম্রাজ্য এবং রাজত্ব ভোগবিলাস এবং খেলতামাশায় মত্ত হয় এবং তার সম্পদ অপাত্রে ব্যয় করে তার পতন এবং ধ্বংস অনিবার্য। ভোগবিলাসে মত্ত থাকার কারণে শেষদিকের কতক সুলতান ফাসেকি এবং উদাসীনতায় বিভোর হয়েছিলেন। তারা তাদের হেরেমের মাঝেই বিভিন্ন ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে সময় কাটিয়ে দিতেন, যা তাদের প্রশাসনিক ব্যাপার থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তারা প্রধান উজির এবং হেরেমের কর্মকর্তাদের ওপরে সকল কাজের ভার ন্যস্ত করেছিলেন—যা পরবর্তী সময়ে সুলতানদের দুর্বলতা আর সাম্রাজ্য ও সেনা পরিচালনায় অক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়েছিল; যা সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। তাদেরকে দুর্বল করে পরবর্তী সময়ে একেবারে ধুলোয় মিটিয়ে দিয়েছে।[৩৬১]

---

[৩৬০] *ইকতিসাদিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম,* পৃষ্ঠা : ৩৩৯।
[৩৬১] *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু ফিত তারখিল ইসলামি,* পৃষ্ঠা : ৯৪।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মৃত্যু এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তার প্রভাব

৮৮৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস মোতাবেক ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়া ছেড়ে এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে ইস্কাদার নামক স্থানে আরেকটি বৃহৎ সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইস্তাম্বুল থেকে বের হওয়ার পূর্বে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন; কিন্তু যুদ্ধ ও জিহাদের প্রতি তার অধিক ভালোবাসা এবং আসক্তির কারণে অসুস্থতাকে তিনি পাত্তা না দিয়ে নিজে সৈন্যদল পরিচালনার জন্য বেরিয়ে পড়েন। যুদ্ধের ময়দানে এসে অসুস্থতার আরোগ্য লাভ করা সুলতানের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এবার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ইস্কাদার পৌঁছে সুলতানের ওজন বেড়ে যায়; তাই তিনি তার চিকিৎসকদের ডাকেন। তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছিল তাই চিকিৎসক এবং ঔষধে কোনো কাজ হয়নি। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার সেনাবাহিনীর মাঝে অবস্থানকালেই ৮৮৬ হিজরির ৪ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৩ মে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে বৃহস্পতিবার দিন ইনতেকাল করেন। ত্রিশের অধিক বৎসর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর ৫২ বছর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন।[৩৬২]

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে সুলতানের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে এমন শোরগোল পড়ে যায় যাতে খ্রিষ্টান এবং মুসলিম উভয় জাতিই নড়েচড়ে বসে। খ্রিষ্টানদেরকে আনন্দ, উল্লাস এবং সুসংবাদ আচ্ছন্ন করে নেয়। খ্রিষ্টানরা তাদের এই ত্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ায় রোডসে[৩৬৩] কৃতজ্ঞতার প্রার্থনার আয়োজন করে।[৩৬৪]

এদিকে উসমানি সেনাবাহিনী ইতালির উত্তর প্রান্তে পৌঁছে সমগ্র ইতালিকে তাদের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রায় দ্বারপ্রান্তে ছিল। ইত্যবসরে তাদের কাছে সুলতানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে সেনাদেরকে গভীর দুঃখ এবং প্রবল বেদনা গ্রাস করে নেয়। এতে উসমানি সেনাবাহিনী নাপোলির রাজার সাথে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হন, যেন তারা তাদের জীবন, সম্পদ এবং শক্তি নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের ঐকমত্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু খ্রিষ্টানরা তাদের অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেনি। তারা শেষে বাকি থাকা কয়েকজন উসমানি সৈন্যকে শূলীতে চড়ায়।[৩৬৫]

[৩৬২] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭২

[৩৬৩] ইজিয়ান সাগরে অবস্থিত সর্ববৃহৎ দ্বীপের নাম। তবে এখানে দ্বীপ উদ্দেশ্য নয়, বরং রোডস দ্বীপে নির্মিত বিশেষ মূর্তি উদ্দেশ্য।

[৩৬৪] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৩।

[৩৬৫] প্রাগুক্ত।

রোমে যখন সুলতানের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে তখন সেখানকার পোপ উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং গির্জাগুলোকে খুলে দেওয়ার আদেশ দেন। সেগুলোতে প্রার্থনা এবং সভার আয়োজন করা হয়। শহরের পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। রোমের এই সভা এবং উৎসবগুলো টানা তিন দিন অব্যাহত থাকে। সুলতান ফাতিহের মৃত্যুতে খ্রিস্টানরা তাদের ওপর তপ্ত নিঃশ্বাস নিক্ষেপকারী সবচেয়ে বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।[৩৬৬]

সুলতান ফাতিহ তার সেনাবাহিনী নিয়ে কোন দিকে অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছিলেন এ ব্যাপারে কেউই কিছু জানতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে লোকজন বিভিন্ন ধারণা করতে থাকে। তিনি কি তার সেনাপতি মাসিহ পাশার দ্বারা আগেই অবরোধ করে রাখা রোডস দ্বীপ বিজয়ের অভিমুখী হয়েছিলেন? নাকি তিনি তার বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে ইতালির উত্তরে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন? এরপর রোম, দক্ষিণ ইতালি, ফ্রান্স এবং স্পেন অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করতেন?

এসব রহস্য সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তার বুকে ধারণ করে রেখেছিলেন। তা কাউকে প্রকাশ করার আগেই মৃত্যু তাকে কোলে তুলে নিয়েছে।[৩৬৭]

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের অভ্যাস ছিল তিনি যেদিকে অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করতেন তা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং তা যথাসাধ্য গোপন রাখতেন। এভাবে তিনি তার শত্রুদের উদাসীনতা এবং তাদের নিজেদের পেরেশানিতেই ব্যস্ত রাখতেন। কেউ জানত না কখন তাদের ওপর আসন্ন আক্রমণ অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। এরপর তিনি এই প্রবল গোপনীয় বিষয়কে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতেন। এভাবে তিনি তার প্রতিপক্ষকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগই দিতেন না।[৩৬৮]

একবার এক বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'এবার আপনি সেনাবাহিনী নিয়ে কোন দিকে অভিযানের ইচ্ছা করেছেন? সুলতান ফাতিহ তাকে জবাব দিলেন, 'যদি আমার দাড়ির কোনো একটি পশমও তা জানতে পারে তাহলে আমি তা উপড়ে ফেলব এবং সেটাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।'[৩৬৯]

সুলতান ফাতিহের লক্ষ্য ছিল—ইতালির উত্তরদিক থেকে অভিযান শুরু করে তার শেষভাগে দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া। এভাবেই তিনি পার্শ্ববর্তী ফ্রান্স, স্পেন এবং অন্যান্য রাজ্য এবং রাষ্ট্রে তার বিজয় অব্যাহত রাখবেন।

[৩৬৬] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৪।

[৩৬৭] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ৩৭৭।

[৩৬৮] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২৫৯।

[৩৬৯] *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ২৬০।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মৃত্যুতে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তারা এতে গভীর শোকাগ্রস্ত হয়। তার সাম্রাজ্যের সকল মুসলিম রোনাজারি করেন। তার বিজয়সমূহ তাদেরকে অভিভূত করেছিল। তিনি তাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছিলেন সালাফে সালেহিন মুজাহিদগণের জীবনী।[৩৭০]

আবদুল হাই বিন ইমাদ হাম্বলি ৮৬৬ হিজরির মৃত্যুসমূহের আলোচনায় সুলতান ফাতিহের মৃত্যুর কথা লিখতে গিয়ে বলেন—'তিনি ছিলেন উসমানি সুলতানদের মাঝে অন্যতম। তিনি হলেন একজন সম্মানিত, অভিজ্ঞ, মহৎ এবং পরাক্রমশালী এক শাসক। শাসকদের মধ্যে তিনি জিহাদে সবচেয়ে বেশি অগ্রসর ছিলেন। আক্রমণ এবং চেষ্টায় তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিধর ছিলেন। নেতৃত্বে এবং সেনা পরিচালনায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে দৃঢ়। আল্লাহ তাআলার প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করতেন। তিনি উসমানি বংশধরদের রাজত্ব দৃঢ় করেছিলেন এবং তাদের জন্য এমন কতক নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন যা যুগে যুগে অক্ষত হয়ে থাকবে।

তার অনেক সুন্দর ঘটনাবলি, সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসের পাতায় অক্ষত নিদর্শনাবলি রয়েছে। আরও আছে এমন চিহ্ন যা বছর এবং যুগের পরিক্রমায় মুছে যাবে না। আছে এমন কতক যুদ্ধের ইতিহাস যার মাধ্যমে তিনি ক্রুশ এবং মূর্তিপূজকদের মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বৃহত্তম কুসতানতিনিয়ার বিজয়। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে জল এবং স্থল উভয় পথ দিয়েই কুসতানতিনিয়া অভিমুখে জাহাজ চালিত করেছিলেন। তিনি তার সেনা, অধিনায়ক, ঘোড়া এবং লোকবল নিয়ে সে শহরের ওপর হামলা করে টানা পঞ্চাশ দিন তীব্র অবরোধ করে রাখেন। সেখানকার পাপাচারী এবং কাফেরদের সংকটে নিপতিত করেন। তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার উন্মুক্ত তরবারি চালনা করেন। তিনি আল্লাহ তাআলার মজবুত বর্ম পরিহিত ছিলেন। সাহায্য এবং স্থায়িত্বের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। ধৈর্যের ওপর অটল ছিলেন। এমনি করেই আল্লাহ তাআলা তার কাছে আসন্ন সফলতার পয়গাম পৌঁছে দেন। তাদের ওপর অবতীর্ণ হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিলেন। এভাবেই অবরোধের একান্নতম দিনে এসে ইস্তাম্বুল বিজিত হয়। সেদিন ছিল বুধবার। ৮৫৭ হিজরির বিশে জুমাদাল উখরার দিন। তিনি খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় হাজিয়া সুফিয়া গির্জায় পরবর্তী জুমআর নামাজ আদায় করেন। যে গির্জার গম্বুজ ছিল আকাশচুম্বী। সেই গম্বুজগুলো নির্মিত হয়েছিল আল-হামরা প্রাসাদের অনুকরণে। তিনি ইস্তাম্বুলে ইলমের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেন, যার সূর্যের অস্ত যাওয়ার ভয় নেই। তিনি সেখানে নির্মাণ করেছিলেন প্রাসাদোপম বিদ্যালয়সমূহ। যার

[৩৭০] *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ,* পৃষ্ঠা : ১৬৮।

আটটি দরজা দিয়ে অতি সহজে প্রবেশ করা যায়। সেখানে তিনি কুরআন-হাদিস এবং যুক্তি মোতাবেক কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ফলে তালেবে ইলমদের পক্ষ হতে আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দেন। তাকে প্রদান করেন বৃহত্তম সওয়াব। কেননা, তিনিই শিক্ষা অর্জনের সময়ে তাদের যাবতীয় চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তাদেরকে দারিদ্র্যের আঁচলের ছায়ামুক্ত করেছেন। এরপর তাদের জন্য বানিয়েছেন এমন কিছু স্তর যাতে তারা ধাপে ধাপে উন্নীত হতো এবং ক্ষমতার যোগ্য হতো। এভাবেই তারা পার্থিব সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছেছেন এমনকি এর দ্বারা তারা পরকালীন সৌভাগ্যের দুয়ারও উন্মোচিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সুলতানের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। তিনি রাষ্ট্রের দূরদূরান্ত থেকে ডেকে এনে আলেমগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের পুরস্কৃত করেছেন এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন। মাওলানা আলি আলকুশাজি, শায়খ আততুসি, শায়খ কাওরানির মতো শ্রদ্ধাভাজন আলেমগণ ছিলেন তাদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমেই ইস্তাম্বুল পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র এবং উন্নতি ও অগ্রগতির উৎসে পরিণত হয়েছিল। সেখানে প্রতিটি শাস্ত্রের দিকপালগণ সমবেত হয়েছিলেন। তৎকালীন উলামায়ে কেরামগণ আজ পর্যন্ত ইসলামের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম হয়ে আছেন। সেখানকার পেশাজীবিগণ ছিলেন সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। সেই সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ ছিলেন বিশাল সৌভাগ্যের অধিকারী। মোটকথা, সম্মানিত মরহুম সুলতান মুসলিমদের বিশেষত সম্মানিত উলামায়ে কেরামের গলায় অনেক অনুগ্রহের মালা পরিয়েছিলেন।[৩৭১]

আল্লাহ তাআলার রহমত, ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি মহামান্য সুলতানের ওপর বর্ষিত হোক। সৎ লোকদের সভায় তার আলোচনা সমুন্নত করুন।

[৩৭১] *শাযরাতুয যাহাব* (৩৪৫/৭)

পরিশিষ্ট

১. উসমানি ইতিহাস ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সন্দেহ এবং জালিয়াতিমূলক অপপ্রচার-প্রচারণার গোমর ফাঁস করে দিয়েছে।

২. আরব এবং তুর্কি ইতিহাসবিদগণ উসমানি খিলাফতের সময়ের বিপরীত স্রোতমুখী হয়েছেন।

৩. ইউরোপীয় শক্তি ইসলামি খিলাফতের বিরোধিতার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে তারা মিসর এবং সিরিয়ার কিছু ইতিহাসবিদদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আমাদের জাতিগত ঐক্যের গভীরতায় ফাটল ধরাতে চেয়েছে। বাসতানি, ইয়াজিজি, জুরজি জায়দান, আদিব ইসহাক, সেলিম নাক্কাশ, শিবলি শামিল, সালামত মুসা প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ তাদের অন্যতম।

৪. মিশনারী সংস্থাগুলো ইসলামি সম্প্রদায়গুলোর অভ্যন্তরীণ নেতৃস্থানীয় লোকদের মগজে নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সে সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরা মিশনারীদের সামনে অবনত হয়েছে। যতটা না তাদের জাতির দায়িত্বশীলদের সামনে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের মতামতের সামনে অবনত হয় তার চেয়ে বেশি।

৫. উসমানি সাম্রাজ্যের অপপ্রচারকারী ইতিহাসবিদরা সত্যকে বিকৃত করার, মিথ্যা কথা, অপবাদ এবং অমূলক সন্দেহের আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সে সমস্ত বইয়ের পাতা এবং অধ্যায়গুলোতে অন্ধবিদ্বেষ এবং বিকৃতির প্রবণতার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, যা নৈতিকতা থেকে বহু ক্রোশ দূরে।

৬. জাতির কতক সন্তান এবং উলামায়ে কেরাম সমষ্টিবদ্ধভাবে সে সমস্ত অপবাদের জবাব দিয়েছেন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রতিরোধে দাঁড়িয়েছেন। তন্মধ্য হতে সবচেয়ে কার্যকর এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডক্টর আবদুল আজিজ শানাওয়ি কর্তৃক তিন খণ্ডের বিশাল কলেবরে 'আদ্দাওলাতুল উসমানিয়্যাতু দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন ফিত তারিখি ওয়াল হাজারাহ' এবং *আসসুলতান মুহাম্মদ আল-*

ফাতিহ ফাতিহুল কুসতানতানিয়্যাহ ওয়া কাহিরুর রোম শিরোনামের গ্রন্থদ্বয়। আর ডক্টর মুওয়াফফিক ইবনি আল-মারজাহ লিখিত *সাহওয়াতুর রজুলিল মারিজ* গ্রন্থটি।

৭. উসমানিগণ হলেন তুর্কমেনিস্তানের একটি গোত্রের বংশধারা। যারা কুর্দিস্তানে বসবাস করতেন এবং রাখালের কাজ করতেন।

৮. প্রথম উসমানের দাদা সুলাইমান ৬১৭ হিজরিতে তার স্বীয় গোত্রের সাথে কুর্দিস্তান থেকে হিজরত করে আনাজুলে (বর্তমান আনাতোলিয়া) আসেন। সেখানেই আখলাত নামক এক শহরে স্থায়ী হন, যা বর্তমান তুরস্কের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত।

৯. সুলাইমানের মৃত্যুর পর তার ছেলে আরতুগ্রুল গোত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আনাতোলিয়া থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিক অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সালজুকি মুসলিম এবং রোমের খ্রিষ্টানদের মাঝে সশস্ত্র লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়ে যান। তিনি তার বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের সাথে যোগ দেন। যথা সময়ে তার অনুপ্রবেশ করা সালজুকদের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

১০. ইসলামি সালজুক সালতানাতের অধিপতি আরতুগ্রুলকে রোমের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আনাতোলিয়ার পশ্চিম সীমায় একটি ভূখণ্ড দান করেন এবং রোমের অনুপাতে তাদের ভূখণ্ড সম্প্রসারণের সুযোগ দেন।

১১. পিতার মৃতুর পর প্রথম উসমান তার গোত্রের দায়িত্ব নেন। তিনি রোমের জমিনে নিজেদের বিস্তৃতির লক্ষ্যে তার পিতার অনুসৃত নীতি মেনে চলেন।

১২. প্রথম উসমান কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন, বীরত্ব, প্রজ্ঞা, একনিষ্ঠতা, ধৈর্য, ইমানি জজবা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, বিজয় অভিযানগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত করা এবং ইলম ও উলামায়ে কেরামকে মুহাব্বত করা।

১৩. উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমানের জীবন ছিল জিহাদি জীবন এবং আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দাওয়াতি জীবন। উলামায়ে কেরাম তার চারপাশে বেষ্টন করে থাকতেন এবং তারা প্রশাসনিক পরিকল্পনা এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান প্রয়োগে অবদান রাখতেন। মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে ছেলে উরখানের উদ্দেশ্যে প্রথম উসমানের দেওয়া অসিয়তগুলো ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছে। সেই অসিয়তের মধ্যেই ছিল শরিয়ত মোতাবেক এবং সভ্যতামূলক নীতিমালার নির্দেশনা। পরবর্তী উসমানি সাম্রাজ্য যা মেনে চলেছে।

১৪. পিতার মৃত্যুর পর ৭২৬ হিজরিতে উরখান ইবনে উসমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন বিজয় অভিযানে তিনি তার পিতার অনুসৃত নীতি মেনে

চলেছেন। তিনি এমন একটি সুদূরপ্রসারী রূপরেখা গঠন করেন, যার মাধ্যমে একই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী অবরোধ করা সম্ভব হবে।

১৫. সুলতান উরখানের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তার হাতে একটি ইসলামি সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা এবং সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন। তিনি তার সৈন্যদের বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করেন। প্রতিটি ইউনিট দশজন সৈন্য অথবা একশত সৈন্য অথবা একহাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তিনি সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য যুদ্ধলব্দ গনিমতের সম্পদের একপঞ্চমাংশ নির্ধারিত করে দেন। এ সেনাবাহিনীকে তিনি স্থায়ী সেনাবাহিনীতে পরিণত করেন। ইতোপূর্বে তারা যুদ্ধের সময় ছাড়া কখনো সমবেত হতো না। তিনি সেনাবাহিনীর পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন।

১৬. সুলতান উরখান তার সাম্রাজ্য মজবুত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সংস্কার এবং আবাদমূলক কাজের উদ্যোগ নেন। প্রশাসনিক কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করেন, সেনাবাহিনী শক্তিশালী করেন, অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এবং উস্তাদগণকে নিযুক্ত করেন। সাম্রাজ্যে তাদের অনেক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল।

১৭. সুলতান উরখানের মৃত্যুর পর ৭৬১ হিজরিতে সুলতান প্রথম মুরাদ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করেন। সুলতান প্রথম মুরাদ ছিলেন একজন বীর, মুজাহিদ, সম্মানিত এবং ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি নিয়মশৃঙ্খলা পছন্দ করতেন এবং তা পালন করতেন। জনগণ এবং সৈন্যদের প্রতি তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। যুদ্ধের প্রতি এবং মসজিদ, মাদরাসা, সরাইখানা নির্মাণের প্রতি তিনি ছিলেন অনুরক্ত। তার পাশে ছিল একদল অভিজ্ঞ নেতৃত্ব, ইতিহাসবিদ এবং সমরবিদগণ। তাদের মাধ্যমে তিনি একটি মজলিসে শুরা গঠন করেছিলেন। একই সময়ে তিনি এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপ অভিমুখে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছেন।

১৮. ৭৬২ হিজরিতে সুলতান প্রথম মুরাদ আদ্রিয়ানোপল বিজয়ে সক্ষম হন। এ বছর থেকেই তিনি এই শহরকে উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানীতে রূপান্তর করেন। এর ফলে রাজধানী ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়ে যায় আর আদ্রিয়ানোপল হয়ে যায় ইসলামি রাজধানী।

১৯. সুলতান প্রথম মুরাদ ভাল করেই জানতেন তিনি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করছেন এবং সাহায্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসবে। এ জন্য অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া ও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করতেন এবং

আল্লাহ তাআলার ওপর অত্যধিক ভরসা করতেন। তার এই একনিষ্ঠ দোয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে সুলতান প্রথম মুরাদ তার প্রভুকে চিনেছিলেন এবং উবুদিয়্যাতের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়ন করেছিলেন। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে কসোভোর যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

২০. সুলতান প্রথম মুরাদ উসমানি সম্প্রদায়কে প্রজ্ঞা এবং দক্ষতার সাথে ত্রিশ বছর নেতৃত্ব দেন। এ ক্ষেত্রে তার সমসাময়িক কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

২১. পিতা প্রথম মুরাদের মৃত্যুর পর ৭৯১ হিজরিতে উসমানি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করেন বায়েজিদ। তিনিও ছিলেন একজন বীর, সম্মানিত এবং ইসলামি বিজয়ের প্রতি আগ্রহী ও আসক্ত। এ জন্য তিনি সামরিক কার্যক্রমগুলোর প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং আনাতোলিয়ার খ্রিষ্টান স্থাপনাগুলোকে তার লক্ষ্যস্থল বানান। এক বৎসরের মধ্যেই আনাতোলিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে যায়। আনাতোলিয়া এবং বলকানের দুইপ্রান্তে বায়েজিদ বিজলির মতো দ্রুতগামীভাবে তার অভিযানসমূহ পরিচালনা করেছিলেন। এ জন্য তাকে সায়িকাহ অর্থাৎ ঝড়োবাতাস উপাধি দেওয়া হয়।

২২. তাড়াহুড়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের জন্য উত্তম স্থান নির্বাচন করতে না পারায় বায়েজিদ তৈমুর লং এর সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হন।

২৩. উসমানি সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ বিপদের সম্মুখীন হয়। সিংহাসন নিয়ে সুলতান বায়েজীদের সন্তানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ যুদ্ধ টানা দশ বছর স্থায়ী থাকে। কুসতানতিনিয়ায় আক্ষরিক অর্থে বিজয়লাভের পূর্বে এ সময়কালকে উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য পরীক্ষা এবং বিপদের সময়কাল বলে অভিহিত করা হয়।

২৪. সুলতান মুহাম্মদ জালবি তার সহনশীলতা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি এক এক করে তার ভাইদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তার জন্য সাম্রাজ্যের ক্ষমতালাভের পথ নিষ্কণ্টক করেন। তিনি তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের পুনঃনির্মাণ এবং সাম্রাজ্যের ভিত মজবুতকরণের পেছনে ব্যয় করেন। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ তাকে উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন।

২৫. সুলতান মুহাম্মদ জালবি শায়খ বদরুদ্দিন কর্তৃক সৃষ্ট ফেতনা দমাতে সক্ষম হন। যে সম্পদ, আসবাবপত্র এবং ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যের দিকে আহ্বান করত। মুসলিম এবং অমুসলিমদের বিশ্বাসের মাঝে কোনো পার্থক্য করত না।

২৬. সুলতান মুহাম্মদ জালবি কবিতা, সাহিত্য এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনিই প্রথম উসমানি সুলতান যিনি মক্কার আমিরের কাছে বাৎসরিক হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন।

২৭. পিতা মুহাম্মদ জালবির মৃত্যুর পর ৮২৪ হিজরিতে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। তিনি ছিলেন জিহাদ এবং ইসলামের দাওয়াতের প্রতি অনুরাগী। তিনি ছিলেন কবি। ভালোবাসতেন আলেমগণকে এবং কবিগণকে।

২৮. ৮৫৫ হিজরিতে স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সাম্রাজ্যের ক্ষমতাভার গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। তিনি ছিলেন দুর্লভ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। যেমন শক্তিশালী ছিলেন তেমন ন্যায়পরায়ণও ছিলেন। তিনি তার কৈশোরকাল থেকেই উমারাদের মাদরাসায় অধ্যয়নকালে বিভিন্ন বিষয়ে তার সমবয়সীদের ছাড়িয়ে গেছেন। বিশেষ করে তিনি তার সময়ের অনেক ভাষা জানতেন এবং ইতিহাসের গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের প্রতি তিনি প্রবল মনোযোগী ছিলেন।

২৯. সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুসতানতিনিয়া বিজয় করা। সেই মহান বিজয়ের ফলে ইসলামি এবং ইউরোপ বিশ্বে বিরাট প্রভাব পড়েছিল। কুসতানতিনিয়া বিজয়ের কিছু মৌলিক এবং নৈতিক কারণ ছিল এবং কিছু শর্ত ছিল, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

৩০. উসমানি সুলতানগণ আল্লাহ তাআলার শরিয়ত বাস্তবায়নে আগ্রহী ছিলেন। উসমানি সমাজে এর পার্থিব এবং পরকালীন ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, খিলাফত এবং ক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং স্থিরতা, বিজয় এবং সাহায্য, সম্মান ও মর্যাদা, বিভিন্ন উত্তম কাজের প্রসার এবং মন্দ কাজের নিঃসৃতি ইত্যাদি ফলাফলসমূহ।

৩১. সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মাঝে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বসূচক গুণাবলি সহনশীলতা, বীরত্ব, মেধা, দৃঢ় সংকল্প এবং অটল থাকা, ন্যায়পরায়ণতা, শারীরিক শক্তি, সৈন্য সংখ্যার আধিক্য এবং সাম্রাজ্যের প্রশস্ততা সত্ত্বেও প্রবঞ্চিত না হওয়া, একনিষ্ঠতা এবং ইলম তথা জ্ঞান।

৩২. সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সভ্যতামূলক কার্যক্রমগুলো হচ্ছে—মাদরাসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, আলেম, কবি, সাহিত্যিকগণের প্রতি তার পৃষ্ঠপোষকতা। এমনিভাবে অনুবাদ, বিভিন্ন শহর ও নগরায়ণ আবাদ এবং হাসপাতাল নির্মাণে ভূমিকা রাখা। ব্যবসা এবং শিল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ। প্রশাসনিক নীতিমালা, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৩৩. সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যান, যা পরিপূর্ণ সততার সাথে তার জীবন চলার পথের নীতির কথা ব্যক্ত করেছে। আরও ব্যক্ত করেছে তার দৃঢ়তা এবং তার নিরাপত্তার উপাদানসমূহের কথা।

৩৪. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হামজাহ (আক শামসুদ্দিন নামে যিনি প্রসিদ্ধ) এবং শায়খ আহমদ আল-কাওরানিকে তিনি মূল্যায়ন করতেন। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ওপর তাদের বিরাট প্রভাব ছিল।

৩৫. কবি বলেছেন—

যাত্রীদের পেছনে আমি এক নিস্তেজ বন্দি
যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তার ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশী
ফেলে যাওয়ার পরও যদি আমি তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারি
তাহলে মানুষের প্রতি আকাশের অধিপতির কতইনা দয়া!
আর যদি জমিনের দরিদ্রতায় আমি বিচ্ছিন্ন রয়ে যাই
তাহলে একজন পঙ্গু ব্যক্তির এতে কোনো দোষ নেই।

শেষ কথা হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

আমার ভাবনা